



চেরাণে জ্ঞান শরীফ
ডা. বাবা জাহাঙ্গীর বা-ইমান আল-সুরেশ্বরী

গ্রাম: চুনকুটিয়া, পো: শুভাঢ্যা, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা

ডা. বাবা জাহাঙ্গীর বা-ইমান আল-সুবেদ্বী রচিত গ্রন্থাবলি



১. মারেফতের গোপন কথা

২. মারেফতের বাণী

৩. সুফিবাদ আত্মপরিচয়ের একমাত্র পথ- ১ম খণ্ড

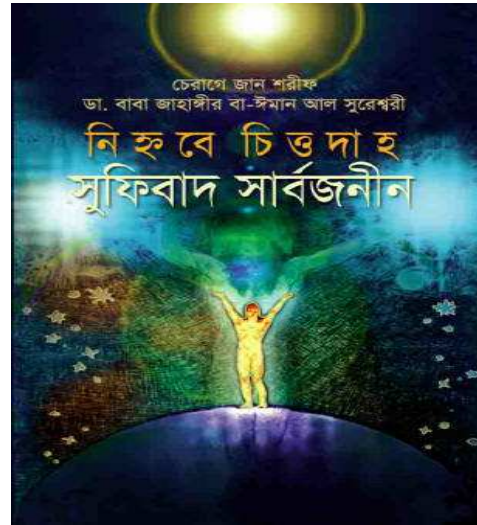
৪. সুফিবাদ আত্মপরিচয়ের একমাত্র পথ- ২য় খণ্ড

৫. সুফিবাদ আত্মপরিচয়ের একমাত্র পথ- ৩য় খণ্ড

৬. সুফিবাদ আত্মপরিচয়ের একমাত্র পথ- ৪র্থ খণ্ড

৭. সুফিবাদ আত্মপরিচয়ের একমাত্র পথ- ৫ম খণ্ড

৮. কোরআনুল মাজিদে বাঙলা উচ্চারণ ও অনুবাদ- ১ম খণ্ড



নিরুবে চিত্তদাহ : সুফিবাদ সার্বজনীন

সুফিবাদ প্রকাশনালয়
 প্রযত্নে : বে-ইম্মান হোমিও হল
 ১০৮ নিউ এলিফ্যান্ট রোড (২য় তলা) ঢাকা-১২০৫
 ফোন : ০১৭১১১২৮১৬৯

উৎসর্গ

মা গো! একটিমাত্র পুত্রসন্তান আমি, অধম লিখক। আর
সাতটি বোন। কেরানিগঞ্জ উপজেলার মুসলমান
মুয়েদের মধ্যে ১৯২৭ সালের প্রথম মেট্রিক তুমি। নানু
ভাই আবদুর রাজ্জাক শৈশবে পাখি শিকার করার
সময়ে মাত্র ১৫ মিনিটের জন্য মাটিতে নামিয়েছিলেন :
তুমি, মা, নানু ভাইয়ের সঙ্গে তিনদিন কথা বলো নি।
রুমা চাইবার পর নানু ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলেছিলে।
সেই পুত্র সন্তানটি এই অধম লিখক। হয়তো এমন
একদিন আসবে যেদিন তোমার ছবিটুকু দেখে পাঠকেরা
ধন্য ধন্য করবে।

একটি ঘোষণা

যে কেহ এই বইটি ছাপাইয়া যে কোনো দামে বিক্রি
অথবা প্রচার করিতে পারিবেন। ইহাতে লেখক ও
প্রকাশকের পক্ষ হইতে কোনো প্রকার আপত্তি রহিল
না এবং থাকিবেও না। কারণ, এই বইটির
মালিকানা লেখক নিজ হইতে সজ্জানে সমগ্র পৃথিবীর
যে কোনো দেশের মুসলমান, হিন্দু, খ্রিস্টান এবং
অন্য যে কোনো ধর্মের অনুসারীদেরকে সমানভাবে
অধিকার দিবার প্রকাশ্য ঘোষণা করিয়া গেলেন। তা

ছাড়া দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক, ত্রৈমাসিক এবং যে কোনো সাময়িকীতে এই বইয়ের সম্পূর্ণ অথবা আংশিক লেখকের নামে অথবা যে কোনো কারো নামে ধারাবাহিকভাবে ছাপাইতে পারিবেন। এতে লেখকের বা প্রকাশকের কোনো প্রকার আপত্তি থাকিবে না। যদি কেহ কোনোদিন বইটির মালিকানার মিথ্যা দাবি তোলেন, তাহা হইলে সেই মিথ্যা দাবি সর্বস্থানে, সর্ব আদালতে বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে। আরও উল্লেখ থাকে যে, এই বইটি পৃথিবীর যে কোনো দেশের যে কোনো ভাষায় অনুবাদ করিয়া ছাপিতে পারিবেন।

কোরান অনুবাদ প্রসঙ্গে

সর্বপ্রথম আমরা বিশাল ৯০ খণ্ডের কোরান তফসিরটির আগে হুবহু অনুবাদটি এই জন্য প্রকাশ করতে চাই যে, আপনারা কোরান-এর আর দশটি অন্যান্য অনুবাদগুলোর সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন, দেখতে পাবেন অনুবাদের মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য। আমরা এতটুকু সতর্কতা অবলম্বন করতে চেষ্টা করছি যে, কিছুতেই মনগড়া অনুবাদ করবো না। যা কোরান-

এ আছে তা হবহ তুলে ধরে পাঠক সমাজকে দেখিয়ে দিতে চাই যে, কোরান-এর অনুবাদেই কতো গরমিল! এই জন্য যতোটুকু আমাদের পক্ষে সম্ভব সেইটুকু প্রচেষ্টা। অনেক অর্থব্যয়ে পৃথিবী বিখ্যাত আরবি ডিকশনারি এবং কোরান-এর লোগাতসমূহ সংগ্রহ করতে চেষ্টা করেছি। যেমন-জে বি হাবা, হেস ওয়েরি, মিলটন, স্টিফিংগাস এবং রহিবাল বাকী প্রণীত আরবি ডিকশনারিগুলি পর্যন্ত কাছে রেখে খুব সাবধানে অনুবাদ করেছি। তারই নমুনা হিসাবে সুফিবাদ আত্মপরিচয়ের একমাত্র পথ-এর দ্বিতীয় খণ্ডে একটি মাত্র কোরান-এর সুরা নজমের অনুবাদ তুলে ধরার পর অনেকেই ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছেন। যদি আপনারা মনে করেন যে, এ রকম একটি কোরান-এর অনুবাদ-গ্রন্থের খুবই প্রয়োজন তা হলে আমাদেরকে সাধ্যমত আর্থিক সাহায্য করতে পারেন অথবা কোরবানির পণ্ডর চামড়ার মূল্যটি সদকারুপে দান করতে পারেন।

লেখকের কিংবদন্তীতুল্য অপর রচনাটি হলো কোরানুল কারিম-এর শব্দভিত্তিক অনুবাদ ও তফসির **তাকসীরে কুরআনুল কারীম আত্‌তাকহীম আন্ আসরী আন**

মুনাব্বার আল আসাদীন উলুম আল জাদীদ ওয়া আল
ফালসাফা আল ইসলামীয়া মিন মুফাস্সেরে জামান-

ডা. বাবা জাহাঙ্গীর বা-ঈমান আল-সুরেশ্বরী

৯০ (নব্বই) খণ্ডে সমাপ্ত

(পৃথিবীর সর্ববৃহৎ কোরান -এর তফসির)

[বি. দ্র.- আর্থিক সাহায্য ছাড়া একার পক্ষে ছাপানো
অসম্ভব।]

সুফিবাদ প্রকাশনালয়

প্রযত্নে : বে-ঈমান হোমিঙ হল

১০৮ নিউ এলিফ্যান্ট রোড (২য় তলা) ঢাকা-১২০৫।

মোবাইল-০১৭১১১১২৮১৬৯

যাঁকে আমি পরম শ্রদ্ধার সাথে সব সময় মনে করি

প্রথমেই আমি পরম শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি পরম পূজনীয় শাহ সুফি সৈয়দ সদর উদ্দিন আহমদ চিশতীকে, যিনি আমার আপন মেঝে চাচা। আমি বাল্যকালে আমার জন্মদাতা, কেরানীগঞ্জ উপজেলার প্রথম এম এ, বি টি হেলাল উদ্দিন আহমদকে আজ হতে প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে হারিয়েছি। সুফিবাদের উপর ধ্যান-ধারণার উৎসাহটি পেয়েছি এবং হাঁটি হাঁটি পায়ে সুফিবাদের দিকে অগ্রসর হয়েছি যার কারণে, তিনি আমার জগতগুরু আপন চাচা শাহ সুফি সদর উদ্দিন আহমদ চিশতী।

আমার একটি খারাপ অভ্যাস ছিল, আর সেই খারাপ অভ্যাসটি হলো, প্রতিদিন দশ-পনের ঘণ্টা লেখাপড়া করতাম। এই জন্য আমাকে আমার বন্ধুরা বইয়ের পোকাও বলত। আমি প্রচণ্ডভাবে নিরপেক্ষ একজন মানুষ। সত্যসন্ধানের পথে কোনো মতবাদের সাইনবোর্ড আমার কাঁধে তুলতে দেই নাই। তবে যুক্তির পেছনেও যে অনেক বোবা যুক্তি দাঁড়িয়ে হাসতে থাকে, সেটা বিশেষ রহমত ছাড়া জানা যায় না। ইহুদি ধর্মের মোল্লা-মুফতিরা যিগুকে শুলীতে চড়িয়ে বলেছিল যে, আমরা নিজেরাই সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি মৃতকে জীবিত করতে পার; কিন্তু এবার আমরা তোমাকে শুলীতে চড়িয়েছি এবং আমাদের

এই শুলী হতে যদি বেরিয়ে আসতে পার তবেই ধরে নিব, তুমি সত্য নবি। কিন্তু যিশু সেই শুলী হতে বেরিয়ে আসেন নি। এই যুক্তিটিতে যুক্তি আছে বটে, কিন্তু সত্যটি নাই। কেন নাই? যদি সত্যিই যিশু সেই শুলী হতে বেরিয়ে আসতেন তা হলে সবাই মুসলমান হয়ে যেত এবং সবাই মুসলমান হয়ে গেলে আল্লাহ পাকের ‘তোমাদের পরীক্ষা করার জন্য এই দুনিয়াতে পাঠিয়েছি’-কথাটির সৌন্দর্য আর থাকে না। অথচ যুক্তির কথাগুলোর বাঁধন বড় শক্ত। এবং এই যুক্তির শক্ত বাঁধনের ফাঁদে পড়ে অনেকেই ইমান হারিয়ে ফেলবে। কিন্তু এই শক্ত যুক্তির ভেতরে যে বিন্দুমাত্র সত্য নাই, বরং যুক্তির ডুগডুগি বাজিয়ে, যুক্তির ভেলকি বাজি দেখিয়ে, যুক্তির জাদু দেখিয়ে হিপনোটাইজ করে ফেলে। পূর্বজন্মের কর্মফলের উপর ভিত্তি করেই তকদিরটি দাঁড়িয়ে আছে। এই তকদির যে স্থানের উপযুক্ত সেখানেই নিয়ে যাবে। এটাই তকদিরে মোবরাম তথা যে তকদিরের আর বদল হয় না।

শাহ সুফি সৈয়দ সদর উদ্দিন আহমদ চিশতীর মত একজন ইসলাম গবেষক এবং গুরু এই পৃথিবীতে কমই পাওয়া যায়। তাঁর রচিত কোরান-এর তফসির তিন খণ্ডে বাজারে পাওয়া যায়। তফসিরটির নাম দিয়েছেন কোরান দর্শন। কত গভীর চিন্তার

প্রতিফলন ঘটতে পারে তারই এক বিস্ময়কর নিদর্শন হলো এই রচনা। আমি অধম তাঁর মুরিদ হই নাই সত্য, কিন্তু উনিই আমার প্রথম শিক্ষাগুরু। শাহ সুফি সদর উদ্দিন আহমদ চিশতী ১৯১৪ সালের ২২ সেপ্টেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম সৈয়দ কাজিম উদ্দিন চিশতী এবং মাতা বেগম ইয়ারননেছা। উনি পর্দা গ্রহণ করেন তথা ইত্তেকাল করেন ২০০৬ সালের ২২ সেপ্টেম্বর। আমরা অনেকেই জানি, মহানবির আবির্ভাব ও পর্দাগ্রহণ ১২ রবিউল আউয়াল। মাওলাউল আলা বাবা সৈয়দ জ্ঞান শরীফ শাহ সুরেশ্বরীর জন্ম ও ওফাত দিবসটি ২ অগ্রহায়ণ। আমরা জানি, বেগম রোকেয়ার জন্ম এবং মৃত্যুদিবসটি ৯ ডিসেম্বর। কিন্তু চোখের সামনে বাস্তবে দেখতে পেলাম, একই দিনে জন্ম এবং মৃত্যুর ঘটনাটি ঘটে গেল শাহ সুফি সদর উদ্দিন আহমদ চিশতীর জীবনে।

একটি আবেদন

আমরা মোরাকাবা-মোশাহেদার তথা ধ্যানসাধনার একটি স্কুল খুলেছি নরসিংদী জেলার শিবপুর

উপজেলার জয়নগর ইউনিয়নের নৌকাঘাটা গ্রামে।
সম্ভবত বাংলাদেশের কোনো পীর-ফকির এ রকম
একটি স্কুল খোলেন নি। আপনাদের, বিশেষ করে
সুফিবাদে বিশ্বাসীদের নিকট আর্থিক সাহায্য
কামনা করি।

হজরত বাবা শরফুদ্দিন বু আলী শাহ কলন্ডর
পানিপথির ফারসি ভাষায় রচিত দিওয়ান হতে সামান্য
কিছু অংশ তুলে ধরলাম

তুলে ধরলাম এ জন্যই যে এই বিশাল দিওয়ান-টির মূল
ফারসি ভাষা, বাংলায় উচ্চারণ এবং অনুবাদ ও ব্যাখ্যা
করতে গেলে বিরাট তথা চারপুণ বইটির আকার ধারণ
করে এবং ইহা ছাপাতে গেলে অর্থের প্রয়োজন হয় এবং
এই দিওয়ান-টি বাংলা ভাষায় অনুবাদ ও ব্যাখ্যা করে
বই আকারে প্রকাশ করলে ওহাবিদের চিন্তাধারার ওপর
একটি প্রচণ্ড আঘাত আসবে। তাই যারা সুফিবাদে
বিশ্বাসী তথা ফকিরি লাইনের অনুসারী তাদের
কাছে অনুরোধ করে গেলাম, তারা যদি আর্থিক সাহায্য
এবং কোরবানির পশুর চামড়াটি বিক্রির টাকা দান
করেন তা হলে আমরা একে
একে দিওয়ান-এ আমির খসরু, দিওয়ান-এ
শামসেস্তাবিজ, দিওয়ান-এ কুতুবউদ্দিন বখতিয়ার কাকি
ইত্যাদি মহামূল্যবান গ্রন্থগুলো বাংলায়
অনুবাদ করে প্রচার করার আশা রাখি।

হাস্তে দার সিনায়ে মা জলু জানানায়ে মা
বুত পরশুম দিল মাসাত সীনাম খানায়ে মা।

আমার বুক আমার মাস্তকের নুরে ভরপুর। বৃত্ত পরম্পন্ন
তথা আমি কেবলই পীরপূজা করি। কেননা আমার
হৃদয়টি হলো, তথা অন্তরটি হলো, পীরপূজার
সনমখানা।

শুফতে উখানদা জানানে গারিয়া টু কারদাম বদরশ
বু আলী হাশ্বে মাগার আশিকে দিওয়ানায়ে মা।
যখন আমি মাস্তকের দরজায় লুটিয়ে পড়লাম তখনই
আমার মাস্তক
বললেন : 'বু আলী আমারই প্রেমিক, আমারই
দিওয়ানা।

আযানে সারি কে বাহ মাহবুব দারম
খাবার না'বুদে কেরামান কাতিবিন রা।
মি নাগানজাদ বু আলী হারগিজ খোদা আন্দার খুদি
তু হামি খোদাই বারি দার কাবায়ে বাজ
অসিনামোরা।

আমি ও আমার মাস্তকের মাঝে যে গোপন রহস্য
লুকিয়ে আছে উহা কেরামান কাতেবিনও জানে না।
হে বু আলী, খোদাকে খুদির মাঝে কখনও সম্পূর্ণ ধরে
রাখা যায় না, তাই তে খুদিকে পুনরায় কাবার দিকে
নিরে যেতে চায়।

কলন্দর বু আলী আজাদে গাশ্তাম
নাদানাম রুসমেও রাহ কুফুর দীনেরা।
ধর্ম ও কুফুরির মত ও পথের আমার আর কোনো
দরকার নাই, যখন বু আলী কলন্দর মুক্তি পেল।

বইটি শুরু আগের কিছু কথা বলে রাখলাম

পদার্থবিদ্যা গবেষণার হিসাবের উপর দাঁড়িয়ে অগ্রসর
হতে থাকে। লোহের দেহের মরিচার আবেষ্টনী অগ্নির
স্পর্শে, ধাক্কার আঘাতে আপনিই বারে পড়ে। তেমনি

পদার্থবিদেরা গবেষণার অগ্নি ও আঘাতের ধাক্কা দিয়ে দিয়ে নূতনের দিকে এগিয়ে যান। এটাই পদার্থবিদ্যার ধর্ম। অনেক ধর্মের অনেক আবেষ্টনী সার্বজনীন সুফিবাদকে ঢেকে দিতে যুগে যুগে চেষ্টা চালিয়েছে, কিন্তু সুফিদের সত্য অগ্নি ও ধাক্কার আঘাত সংকীর্ণতার অবগুণ্ঠন হতে সুফিবাদকে মুক্ত করে এনেছে। কখনও কখনও আপন ধর্মে জন্মগ্রহণ করে আপন ধর্মের আনুষ্ঠানিক প্রভাবগুলো হতে মুক্ত করতে গিয়ে সুফিদের কাকের নামক বিশেষণে ভূষিত হতে হয়েছে। এই একটি স্থানেই কি বলা যায় না যে, যে-ধর্মে সুফি জন্মগ্রহণ করেছে সেই ধর্মটাই সুফির আজন্ম পাপ?

আজ হতে পাঁচ হাজার বছর আগে জন্মদগ্নি মূনি সুফিবাদের যে অমৃত বাণীটি ঘোষণা করে গেছেন সেই একই বাণী ইহুদি ধর্মের সুফি, খ্রিস্টান ধর্মের সুফি এবং সবশেষে ইসলাম ধর্মের সুফিদের কণ্ঠে : এক, অখণ্ড, অদ্বিতীয়, অদ্বৈত দর্শনটি প্রতিফলিত হয়েছে। সুফিবাদের একমাত্র মূল বিষয়টি হলো : আপন নফসের সঙ্গে, আপন প্রাণের সঙ্গে, আপন জীবাত্মার সঙ্গে যে-খান্নাসরূপী শয়তানটিকে পরীক্ষা করার জন্য দেওয়া হয়েছে উহা হতে মুক্তিলাভ করা। এই মুক্তির প্রশ্নে প্রয়োগপদ্ধতির বিভিন্নতা থাকতে পারে, বাক্যের শৈলীর অবগুণ্ঠনে চাকচিক্য থাকতে পারে, বিভিন্ন রকম কথা-বর্ণনা-ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ থাকতে পারে, কিন্তু মূল দর্শনে আপন নফসটিকে খান্নাসমুক্ত করা; কারণ আপন নফসের অভ্যন্তরে খান্নাসটির অবস্থানই বিতর্কিত বহু মতবাদ, দর্শন, সাহিত্য, কবিতা যুগে যুগে রচনা করে গেছে। সুতরাং ফেনোমেনাল সিভিলাইজেশন তথা আপাত দর্শনীয় সভ্যতার জনকটি হলো খান্নাসরূপী শয়তান। খান্নাসের বিরুদ্ধে যত রকম কথা, যুক্তি প্রদর্শনই থাক না কেন, অধিকাংশ মানুষের সঙ্গে খান্নাস

থাকবেই। যেদিন খান্নাসের অস্তিত্বটি হারিয়ে যাবে সেদিন ফেনোমেনাল সিভিলাইজেশন তথা বিত্ত-বৈভবের তথাকথিত সভ্যতাটিও হারিয়ে যাবে। বিবর্তনবাদের ধাপে ধাপে খান্নাসও রঙ-রূপ বদলিয়ে বদলিয়ে অগ্নসর হয়।

খান্নাসের অস্তিত্ব আদৌ আছে কি? আদৌ কি এর অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়, যাবে? ধরে নিলাম খান্নাসের অস্তিত্ব নাই, কিন্তু শক্তির উপর শক্তি— এভাবে মহাশক্তি পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণের মতো বিশ্বের মানুষগুলোকে খান্নাসের হাতের মুঠোয় রাখতে পারে। এই খান্নাসি শক্তিকে বেঁটিয়ে বিদায় করাটি সহজ কাজ নয়। তাই যারা খান্নাসের আসল পরিচয়টির মোটামুটি ধারণা নেবার পর তাকে তাড়িয়ে দেবার প্রতিজ্ঞা নিয়ে ধ্যানসাধনায় মগ্ন হয়, তারাই জেহাদ করার একেকজন ঝানু সৈনিক। এই জেহাদকেই জেহাদে আকবর বলা হয়। এই জেহাদের প্রথম ও প্রধান অঙ্গটির নাম হলো ‘দায়েমি সালাত’ তথা অবিরাম যোগাযোগের প্রচেষ্টা। এই অবিরাম যোগাযোগের প্রচেষ্টা যারা চালিয়ে যায়, তাদেরকেই বাংলা ভাষায় ‘যোগী’ বলা হয়, আর আরবি ভাষায় বলা হয় ‘মুসল্লি’। ভাষার ভিন্নতায় সাধারণ মানুষ হিন্দুদের গুরু পায়, আবার মুসলমানদের গুরুও পায়। এই ভাগ বিভাজনে কাঠ প্রকৃতির মানুষগুলোই আনুষ্ঠানিক ধর্ম পালন করতে গিয়ে সংকীর্ণতার বলয়ে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। গণ্ডির চিন্তায় কুপমণ্ডুকতা প্রকাশ পায় এবং এখান থেকেই মতভেদের

বিন্দু মারামারির বৃত্তে পরিণত হয়। ক্রুসেডের যুদ্ধটি বোধ হয় এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ। উভয় দলই জেহাদ নামের সাইনবোর্ড গলায় বুলিয়ে জেহাদি জোশের ডামাডোল বাজিয়ে ‘জেহাদ করা হচ্ছে’ বলে প্রচার করেছিল। আসলে উহা ছিলো নিছক যুদ্ধ, মোটেও উহা জেহাদ নয়। কারণ উহার মধ্যে ‘ফি সাবিলিল্লাহ’ শব্দটি ছিলো না— থাকলেও মৌখিক, আন্তরিক নয়। খান্নাস-মুক্তির জেহাদই জেহাদে আকবর তথা সর্বশ্রেষ্ঠ জেহাদ। এই জেহাদে মরণ নাই। ফানার দেহটি দেহ বলেই মনে হয় : আসলে উহা নির্বাণপ্রাপ্ত তথা ফানাফিল্লাহর দেহ। দুধ হতে যেইমাত্র মাখন বের করে নেওয়া হয়, তখন দুধ আর দুধ থাকে না, স্থূল চোখে উহা দুধই মনে হবে, কিন্তু পান করতে গেলেই ধরা পড়ে যায়। ধরা পড়ে যায়— এটা ঘোল, কিন্তু দেখতে দুধের মতো। ‘আনা বাশারুম মিসলেকুম’-এর রহস্যটি দুধ আর ঘোলের মতো, আসলে বিরাট পার্থক্য। একটি মাখন-মিশ্রিত দুধ, আরেকটি মাখন-উঠানো ঘোল। খান্নাস-মুক্তির ধ্যানসাধনাটি ব্যক্তিকেন্দ্রিক। সমাজ ইহাকে গ্রহণ করুক আর না-ই করুক, কিন্তু ইহা নিছক ব্যক্তিকেন্দ্রিক। সমাজের সব মানুষই যদি খান্নাসমুক্ত হয়ে পড়ে তা হলে আর আল্লাহর পরীক্ষাটি থাকে না, তাই সুফিরা সামাজিক ও ধর্মীয় অনুশাসনগুলোকে মেজাজি বলেন

আর অপরদিকে খান্নাসমুষ্টির ধ্যানসাধনাটিকে হাকিকি বলেন।

মেকাজ্জি শয়তান তিনটি। এই তিনটি শয়তান পৃথিবীর মাত্র একটি দেশের মাত্র একটি নগরী— মক্কার মিনা-তে অবস্থান করে : একটি বড় শয়তান, অপরটি মেঝা শয়তান ও তার পরেরটি ছোট শয়তান। মেকাজ্জি হজরত পালন যারা করে তারা এই তিনটি শয়তানকে কব্বর ছুঁড়ে মারে। দৃশ্যমান শয়তানকে দৃশ্যমান কব্বর ছুঁড়ে মারা। কিন্তু হাকিকি শয়তান চারটি : প্রথম নামটি ইবলিস, দ্বিতীয় নামটি শয়তান, তৃতীয়টি মরদুদ এবং চতুর্থ ও শেষটির নাম খান্নাস। এই চারটি শয়তানকেও পৃথিবীর কোনো স্থানেই অবস্থান করার অনুমোদন আল্লাহ দেন নি। এই চারটি শয়তানকে অবস্থান করার অনুমতি মাত্র দুইটি স্থানে দেওয়া হয়েছে। সেই দুইটি স্থানের নাম কী? একটি জিনের অন্তর এবং অপরটি মানুষের অন্তর। জিন এবং মানুষের অন্তর দুইটি বিহনে শয়তানের থাকার আর কোনো অনুমতি নাই। এই জিনের অন্তর এবং মানুষের অন্তরের বাহিরে যারা শয়তানকে খুঁজে বেড়ায় তাদের শয়তান বিষয়টিতে মুর্থ বলাই চলে। জিন এবং মানুষের অন্তরে শয়তানের অবস্থানটি— এবং আর কেখাও শয়তানের অবস্থানের অনুমতি আল্লাহ কর্তৃক দেওয়া হয় নি। এটাই ইসলাম বিষয়ে ধারণা দেবার একটি বিশেষ ফর্মুলা। এই ফর্মুলাটি না জেনে কিছু একটা লিখতে গেলেই ভুল হবার সম্ভাবনাটি থেকে যায় এবং যারা এই শয়তানের থাকার ফর্মুলাটি জানে না তাদেরই বা দোষ দেব কিসে?

আকাশ হতে শয়তানেরা সাধকদেরকে আগুনের গোলা নিক্ষেপ করে। এই আকাশটি মনের আকাশ, চিত্তের আকাশ— সৌরমণ্ডলের আকাশ নয়। কারণ সৌরমণ্ডলের আকাশ তোহিদে বাস করে। অনেকটা যেমন রুহুল কুদ্দুস অথবা রুহুল আমিন বলতে জাদবেল ইসলাম গবেষকেরা পর্যন্ত বিরাট ভুল করে ফেরেশতা জিবরিলের নামটি উল্লেখ করেন। আরেকটি ফর্মুলার

আরেকটি সূত্র ভালো করে জেনে রাখা উচিত যে, কোনো ফেরেশতাকেই আল্লাহ নফস এবং রুহ দুইটির একটিও দেন নি অথবা আল্লাহ কর্তৃক দেওয়া হয় নি। অনেকটা দুই চোখই অন্ধ, কিছুই দেখতে পায় না, বাপ-মা শীখ করে কানা ছেলের নাম রেখেছে পদ্মলোচন— বলার মতো।

সৃষ্টিরাজ্য তৌহিদে বাস করে। তৌহিদের রাজ্যে শয়তানের প্রবেশ নিষিদ্ধ। জিন এবং মানুষের অন্তর দু'টিকে সীমিত স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি আল্লাহ কর্তৃক দেওয়া হয়েছে। শয়তানের অবস্থান না থাকলে স্বাধীনতা থাকে না। তৌহিদে স্বাধীনতা নাই। এই স্বাধীনতা ভোগ করার দরুনই মানুষ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব। নফসের সঙ্গে খান্নাস যোগ হলেই নফস দূষিত হয়। পানির সঙ্গে জীবাণু মিশ্রিত হলেই পানি দূষিত হয়। খান্নাসযুক্ত নফস যে বাহ্যিক মানব সভ্যতাটি ধাপে ধাপে গড়ে তুলছে সেই বাহ্যিক সভ্যতাটি মানব সমাজের বুকে কখনও আশীর্বাদ, কখনও অভিশাপ। খান্নাসযুক্ত নফসের তৈরি অত্যাধুনিক বাহ্যিক সভ্যতা কিছুক্ষণের মধ্যেই পৃথিবীর এক প্রান্ত হতে অন্য প্রান্তে নিয়ে যেতে পারে। এটাকেই বলা হয় বাহ্যিক মুক্তি তথা ফেনোমেনাল

এমানসিপেশন। এটাকেই বলা হয় মেজাজি মুক্তি। এই মেজাজি মুক্তিতে যে জাতি বেশি উন্নত, সেই জাতি বেশি মেজাজি ক্ষমতাধর। এই মেজাজি মুক্তি মানব জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে মেজাজি কুসংস্কারগুলো বাঁটিয়ে তাড়িয়ে দিয়ে মেজাজি শান্তি ও সভ্যতার দিকে এগিয়ে নিয়ে

যাচ্ছে। অন্যথায় জঙ্গলে বাস করা জ্ঞানোয়ারের চেয়েও খারাপ হয়ে যাবার সম্ভব ভয় ও বিপদ ছিলো। গণতন্ত্র অসুরদেরকে বেকায়দায় ফেলে দেয়, অসুরদের ভৈরবী নৃত্যের পা দু'টোকে ভেঙে দেয়। তাই গণতন্ত্র অনেক শক্তিশালী অসুরদেরকে অ্যারেস্ট করে জেলখানায় পাঠিয়ে দেয়। গণতন্ত্র শক্তিশালী অসুরদেরকে জেলখানায় পাঠিয়ে দিয়ে কিছুটা সম্মানও প্রদর্শন করে; সেই সম্মানপ্রদর্শনের নামটি হলো জেলখানায় ডিভিশন পাওয়া। তাই অসুরেরা গণতন্ত্রকে ভয় করে। অসুরেরা গণতন্ত্রকে ধর্মবহির্ভূত একটি নববিধান বলে ঘোষণা করতে চায়।

এবার আমরা হাকিকি শয়তান তথা আসল শয়তানের পরিচয়টি দিতে চাই। শয়তান মূলত এক, কিন্তু এই শয়তানের ছের ও ছার তথা রঙ-চঙ, কলা-কৌশল চার রকম তথা চারটি ভিন্নরূপ। শয়তানের আদি রূপটির নাম ইবলিস। ইবলিস শব্দটি 'বালাসা' হতে আগত। 'বালাসা' অর্থ অহঙ্কার, আর ইবলিস অর্থ অহঙ্কারী। তবে মজার ব্যাপার হলো, এই বালাসা শব্দটি আরবি নয়, ইহা একটি হিব্রু ভাষা। 'ফাসাজাদু ইল্লা ইবলিস' অর্থাৎ 'সবাই সেজদা করলো একমাত্র অহঙ্কারী (তথা ইবলিস) ছাড়া।' কোরান-এর এই বাক্যটিতে তথা আয়াতটিতে 'ফাসাজাদু ইল্লা শয়তান' বা 'ইল্লা মরদুদ' বা 'ইল্লা খান্নাস' নাই। এই তিনটি সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ কোরান-এর এই আয়াতের সঙ্গে মানায় নী। তাই কোরান-এর ভাষার এবং শব্দের নিখুঁত গাথনিগুলো বিজ্ঞানের বাবা বিজ্ঞানকেও চমকিয়ে দেয়। আর যারা ছাগল-পাগল-মার্কা উল্টাপাল্টা চিত্তাধারার সমাবেশ ঘটায়, তাদেরকেও বলার কিছু

থাকে না। দ্বিতীয় নামটি হলো শয়তান। ‘আউজুবিল্লাহি মিনাশ শায়তোয়ানুর রাজ্জিম’ অর্থাৎ ‘আল্লাহর আশ্রয় চাই সেই শয়তান হতে যে শয়তান প্রতিনিয়ত পাথরের আঘাত খেয়ে চলছে।’ ইহাই হবহ অনুবাদ। অনেকেই বিষয়টি অবগত না হয়ে ‘বিভাঙিত’ শব্দটি ব্যবহার করে। দৈনন্দিন জীবনে বেঁচে থাকার উদ্দেশে প্রতিনিয়ত যে কত প্রকার ঘাত-প্রতিঘাতের সম্মুখীন হতে হয় এবং এই ঘাত-প্রতিঘাতকেই ‘পাথরের আঘাত খাওয়া শয়তান’ হতে আশ্রয় চাইতে বলা হয়েছে। তাই আমরা দেখতে পাই, কোরান-এর কোথাও ‘আউজুবিল্লাহি মিনাল ইবলিসুর রাজ্জিম’ বা ‘মরদুদুর রাজ্জিম’ বা ‘খান্নাসুর রাজ্জিম’ বলা হয় নি। তাই কোরান-এর ভাষার এবং শব্দের নিখুঁত গাঁথুনিগুলো বিজ্ঞানের বাবা বিজ্ঞানকেও চমকিয়ে দেয়। আবার ‘আততালেবুদ দুনিয়া মরদুদ’ অর্থাৎ ‘যারা কেবলই দুনিয়া চায় তারা মরদুদ’— এই বাক্যটিতে তথা কোরান-এর এই আয়াতটিতে আমরা ‘আততালেবুদ দুনিয়া ইবলিস’ বা ‘শয়তান’ বা ‘খান্নাস’— শব্দ তিনটির একটিও পাই না। তাই কোরান-এর ভাষার এবং শব্দের নিখুঁত গাঁথুনিগুলো বিজ্ঞানের বাবা বিজ্ঞানকেও চমকিয়ে দেয়। তারপরে বলা হয়েছে : ‘মিন শাররিল ওয়াসওয়াসিল খান্নাস’ অর্থাৎ ‘খান্নাস হইতে তথা কুমল্লুগাদাতা হইতে, সংশয় (দ্বিধা) সৃষ্টিকারীর অপকারিতা হইতে।’ আমরা এই বাক্যটিতেও তথা কোরান-এর এই আয়াতটিতেও ‘মিন শাররিল ওয়াস ওয়াসিল ইবলিস’, ‘শয়তান’, ‘মরদুদ’— এই শব্দ তিনটির একটিও পাই না। তাই কোরান-এর ভাষার এবং শব্দের নিখুঁত গাঁথুনিগুলো বিজ্ঞানের বাবা বিজ্ঞানকেও চমকিয়ে দেয়।

তারপরের বিষয়টি হলো নফস এবং রুহ বলতে কোরান-এ কী বুঝানো হয়েছে। নফস হলো প্রাণ, জীবন, জীবাত্মা। এই প্রাণ পশুপাখি, কীটপতঙ্গ হতে সব জীবেরই আছে। কিন্তু এইসব কীটপতঙ্গ, পশুপাখিদের নফসের সঙ্গে তথা প্রাণের সঙ্গে রুহ ফৎকার করে দেওয়া হয় নি, তথা রুহকে বসিয়ে দেওয়া হয় নি, তথা আল্লাহ স্বয়ং রুহরূপে অধিষ্ঠিত হন নি। তাই এইসব কীটপতঙ্গ,

জীবজন্তু জানোয়ারদের বিচারের সম্মুখীন হতে হবে না, তবে মৃত্যুর স্বাদ অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে।

একমাত্র জিন এবং মানুষের মধ্যেই রুহ ফুৎকার করে দেওয়া হয়েছে। তথা আল্লাহ স্বয়ং রুহরূপে প্রতিটি মানুষের সঙ্গে বর্তমান। এই রুহ আল্লাহর সমগ্র সৃষ্টিরাজ্যে আর কাহাকেও দেওয়া হয় নি বলেই মানুষ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব। কোরান এই বিষয়টিকে আরও পরিষ্কার করার জন্য বলেছে যে ‘নাহনু (‘আনা’ নয় তথা ‘আমি’ নই) আকরাবু ইলাইহে মিন হাবলিল ওয়ারিদ’ তথা ‘আমরা তোমাদের শাহারগের নিকটেই আছি।’ কথাটি সৃষ্টিরাজ্যের আর কোনো জীবকে লক্ষ করে বলা হয় নি, একমাত্র জিন এবং মানুষ ছাড়া। আমরা অনেক সময় ফেরেশতাদের প্রশংসায় না-জেনে না-শুনে ভাবে গদগদ হয়ে হিয়া হয়া বলতে থাকি। আসলে ফেরেশতাদেরকে তৈরিই করা হয়েছে আমাদের সেবা করার জন্য। ফেরেশতাদের নফসও নাই এবং রুহ থাকার তো প্রশ্নই উঠে না। যদি ফেরেশতাদেরকে রুহ দেওয়া হতো তা হলে আদমকে সেজদা করার আদেশটির প্রশ্নই উঠতে পারে না। তবে জেনে রাখা ভালো যে এই সেজদাটি হাকিকি সেজদা, মোটেও ম্লেজাজি সেজদা নয়। কিন্তু যখন ইউসুফ নবি (আ.)-কে তাঁর পিতা ইয়াকুব নবি (আ.) এবং ইউসুফ নবির মাতা এবং ইউসুফ নবি (আ.)-র এগারজন বড় ভাই ইউসুফ নবি (আ.)-র পায়ে তথা ‘লাহ’ লুটিয়ে

পড়লেন, সেই সেজদাটি মোটেও এবাদতের সেজদা নয়, বরং তাজ্জিমি সেজদা। সুতরাং সেজদাকে মোটামুটি দুই ভাগে ভাগ করে দেখালাম। যদিও সেজদাটিকে দুই ভাগে ভাগ করে দেখালাম, কিন্তু যে সেজদাটি খাসসুল খাস তথা রহস্যেরও রহস্য, উহা জানা থাকা সত্ত্বেও বলতে পারলাম না এবং আমভাবে বলাটা সঠিক বলে মনে করলাম না। সুতরাং মানুষের সঙ্গেই আল্লাহ রুহরূপে অবস্থান করছেন, অথচ মানুষ জেনেও না জানার ভান করে চলছে। যারা জিন এবং মানুষের অন্তরে রুহরূপী আল্লাহর অবস্থানটিকে অস্বীকার ক'রে আসমানে অবস্থান করা আল্লাহতে বিশ্বাস স্থাপন করে তাদেরকে জর্জ বার্নার্ড শ-এর ভাষায় ভয়ঙ্কর এবং বিপদজনক মানুষ বলে সাবধান করে দেওয়া হয়েছে এবং আরও বলা হয়েছে যে এইসব ভয়ঙ্কর এবং বিপদজনক মানুষ হতে যত দূরে থাকা যায় ততই মঙ্গল।

আমরা এখন নফস এবং রুহ বিষয়টিতে কোরান কী বলছে তারই সামান্য একটু ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে পার্থক্যটি ধরিয়ে দিতে চাই। নফস বিষয়টিতে কোরান বলছে : ‘কুল্লু নাফসুন জায়েকাতুল মঈত’ অর্থাৎ ‘প্রত্যেক নফস মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে বা করে।’ কিন্তু কোরান-এর একটি আয়াতেও এই কথাটি বলা হয় নি যে, ‘কুল্লু রুহিন জায়েকাতুল মঈত’ অর্থাৎ ‘প্রত্যেক রুহ মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে বা করে।’ রুহ এ জন্যই

মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করে না, কারণ রুহ জন্মগ্রহণ করে না।
যাহাই জন্মগ্রহণ করে তথা জীবজন্তু, কীটপতঙ্গ হতে
গাছপালা, তথা যাদেরই জীবন আছে তথা নফস আছে,
তাদেরকে মৃত্যুর স্বাদ অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে বা
করে।

যাদের জীবন আছে তাদের অবশ্যই মরণের মুখোমুখি
হতে হবে। কিন্তু রুহ জীবনধারী নফস নয়, তাই মরণের
মুখোমুখি হবার প্রশ্নই ওঠে না। রুহ স্বয়ং আল্লাহ।
সুতরাং রুহ নিত্য, সার্বজনীন। কিন্তু এই 'নিত্য ও
সার্বজনীন' দিয়ে এই কথাটি কখনই বোঝানো হয় নি
যে, রুহ সবাইকেই দেওয়া হয়েছে। রুহ মানুষ এবং জিন
ছাড়া আর কাহাকেও দেওয়া হয় নি এবং দেবার প্রশ্নই
ওঠে না। যে নফসের সঙ্গে রুহকে জড়িয়ে দেওয়া
হয়েছে, সেই নফস নির্বাচনী ক্ষমতার অধিকারী। তাই
নফসের সঙ্গে রুহ জড়িয়ে দেওয়া হয়েছে যাদের, তারাই
সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব তথা আশরাফুল মাখলুকাত। আবার
রুহ-জড়ানো নফসের সঙ্গে খান্নাসিটিকেও জড়িয়ে দেওয়া
হয়েছে। জিন এবং মানুষের রুহ জড়ানো নফসের সঙ্গেই
আমরা খান্নাসটির অবস্থান দেখতে পাই। অন্য কোনো
সৃষ্ট জীবের মাঝে রুহের অবস্থানটি নাই। সুতরাং
খান্নাসের অবস্থানটিও নাই।

জিন এবং মানুষের নফসের সঙ্গে রুহ জড়িয়ে দেওয়া
হয়েছে এবং
সঙ্গে খান্নাসটির অবস্থানও দেখতে পাই। তাই বৈষয়িক
উন্নয়ন ও
পাশাপাশি অধঃপতন এবং আধ্যাত্মিক উন্নয়ন ও
অধঃপতন দু'টোই
পরিষ্কার দেখতে পাই। তাই মানব অন্তরের অভ্যন্তরে
খান্নাস এবং রুহের অবস্থানের দরুন আধ্যাত্মিক দ্বন্দ্বিক
দর্শনের পরিচয়টি দেখতে পারি,
জানতে পারি এবং বুঝতে পারি।

চমৎকার একটি বিষয় আমরা কোরান হতে জানতে পারলাম যে, জিন এবং মানুষের রুহ জড়ানো নফসের সঙ্গে খান্নাসরূপী শয়তানটিকেও দেওয়া হয়েছে। এই খান্নাসকে অন্যত্র মুনি-ঋষিরা ‘মায়ী’ বলতেন। এই খান্নাস, এই মায়ার অস্তিত্ব নাই, কিন্তু শক্তি আছে। হোমিওপ্যাথি ঔষধের নবম শক্তির অভ্যন্তরে ঔষধের কোনো অস্তিত্ব নাই, কিন্তু শক্তি আছে। তাই বলা হয়ে থাকে : ‘লা মণ্ডজুদা ইল্লাল্লাহ’ অর্থাৎ ‘নাই কোনো অস্তিত্ব, একমাত্র আল্লাহর অস্তিত্ব ছাড়া।’ অস্তিত্ব নাই, অথচ শক্তি আছে এই কথাটি বিজ্ঞান-বিরোধী কি না জানি না, তবে হোমিওপ্যাথি ঔষধের ভিত্তিটি এই দর্শনের উপরেই দাঁড়িয়ে আছে। এই বিষয়টি একান্ত অনুভবের বিষয়। তাই এর ব্যাখ্যা না দিয়ে ইচ্ছা করেই এড়িয়ে গেলাম।

মহানবি বলেছেন, ‘মান আরাফা নাকসাহ ফাকাদ আরাফা রাব্বাহ’ অর্থাৎ ‘যে তার নফসের পরিচয় জানতে পেরেছে, কোনো সন্দেহ নাই, সে তার আল্লাহর পরিচয় জানতে পেরেছে।’ এই কথাটি মহানবি বলেন নি যে, ‘মান আরাফা রুহহ ফাকাদ আরাফা রাব্বাহ’, অর্থাৎ ‘যে তার রুহের পরিচয়টি জানতে পেরেছে, সে তার আল্লাহর পরিচয়টি জানতে পেরেছে।’ রুহ স্বয়ং নিজেই পরিচয়, তাই নফসের পরিপূর্ণতার মাধ্যমে আল্লাহর পরিচয় লাভ করার কথাটি বলা হয়েছে। আবার, কোরান-এ এই কথাটি বলা হয় নি যে, ‘ওয়া না ফাকত, মিন নাকসি’, বরং বলা হয়েছে ‘ওয়া না ফাকত মিন রুহি।’ কারণ রুহ জাত, নফস সেফাত। আল্লাহি স্বয়ং জাত, সুতরাং তাঁর ফুৎকারটিও জাত। নফস স্বয়ং সেফাত, সুতরাং নফসের ফুৎকার দেবার প্রশ্নটি

আসে না। আবার, কোরান-এর অন্যত্র দেখতে পাই, 'তানাঙ্কালু মালাইকা ওয়া রুহ,' কিন্তু কোরান বলে নি, 'তানাঙ্কালু মালাইকা ওয়া নফস' ফেরেশতা এবং রুহকে নাঙ্কিল করার কথাটি আমরা কোরান-এ পাই, কিন্তু ফেরেশতা এবং নফস নাঙ্কিল করার কথাটি পাবার তো প্রশ্নই আসে না এবং তা কোরান-এর একটি আয়াতেও নাই। এইসব সূক্ষ্ম বিষয়গুলোতে অধিকাংশ গবেষক প্রবেশ করতে গিয়ে খেঁই হারিয়ে ফেলেন এবং অনেক বকম আত্মবিরোধী কথার বাড়া আবিষ্কার করেন। বিভ্রান্তির ব্যাকটেরিয়া এভাবেই ছড়ানো হয়ে থাকে। এবং এই ব্যাকটেরিয়ায় আক্রান্ত হয়েই মানুষেরা ভুল পথে পা বাড়িয়ে দিতে অনেকটা বাধ্য হয়। অবশ্য ইহাও একটি তকদির, সুতরাং কাকে গালি দেব? ভুল আছে বলেই তো শুদ্ধকে জানবার এত সংগ্রাম, এত সাধনা, এত প্রচেষ্টা। সবই তো একেরই লীলাখেলা। তাই হয় তো বলা হয়েছে : আমার (আল্লাহর) সৃষ্টিতে কোনো বিদ্ধ-পরিমাণ ভুলও তুমি পাবে না। যদি ভুলটি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে চাও তা হলে ভুল তো পাবেই না, বরং তোমার চোখ দু'টো বিস্ফারিত হয়ে তোমার কাছেই ফেরত আসবে। (সূরা মূলক হতে ভাবার্থটি নেওয়া)।

নফসের মাগফেরাত চাওয়া যায়, কারণ নফস জন্ম-মৃত্যুর অধীন। নফস রোগ-শোক-দুঃখভোগ করে, তাই নফসের জন্য দোয়া চাওয়া যায় এবং মাগফেরাত চাওয়া যায়। রোগীর জন্য ডাক্তার, নফসের জন্য মাগফেরাত। অথচ অনেক ক্ষেত্রেই আমরা দেখতে পাই, রুহেরও মাগফেরাত চাওয়া হয়। জেনে শুনে 'রুহের মাগফেরাত' চাওয়াটি একটি মারাত্মক ভুল, তারপরেও অনেককেই রুহের মাগফেরাত চাইতে দেখি। সুতরাং কাকেই বা দোষারোপ করতে যাবো? সবই তো তকদিরের খেলা।

কেউ জেনে শুনে ভুল করে, কেউ না জেনে ভুল করে।
আমি কেবল নফস আর রুহের পার্থক্যটি ধরিয়ে দিতে
চেষ্টা করলাম। কেউ ধরতে পারবে, কেউ ধরতে পারবে
না। ধরতে পারাটাও তকদির এবং না ধরতে পারাটাও
তকদির।

আমি, অধম লিখক, কোরান-এর যে অতি সামান্য
ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণগুলো করে গেলাম, হয়তো একদিন না
একদিন এর মূল্যায়ন হবে, একদিন না একদিন ধর্ম-
গবেষকদের চোখ ও বিবেক ধাঁধিয়ে দেবে, বুঝতে
পারবে কত সুক্ষ্মতে, কত গভীরে প্রবেশ করলে এই
রকম কথাগুলো বলা যায়। হয়তো কেউ আমার এই
কথাগুলোকে অহঙ্কারের ছকে ফেলতে চাইবেন। কিন্তু
না, এটি মোটেই অহঙ্কার নয়, এটা গবেষণার পর
গবেষণা করে যে সিদ্ধান্তগুলোতে উপনীত হয়েছি তারই
সামান্য ব্যাখ্যা ও
বিশ্লেষণ মাত্র।

নিয়তির লিখনে এমন এক অসভ্য, বর্বর গ্রামে
জন্মগ্রহণ করেছিলেন যে সেই গ্রাম চুনকুটির মাটির
উপর দিয়ে হেঁটে যেতেও কেন জানি মনের অজান্তে
ঘৃণাবোধ করি। অনেকেই বলে থাকেন, ‘আমার গ্রাম :
ভালো হোক আর মন্দ হোক’, কিন্তু আমি এই কথাটুকু
লিখে যেতে পারলাম না। যদি কোনোদিন আমার

গ্রামের বাড়িতে আমারই মাজারটুকু দেখতে আসেন, তারা যেন আমার মতো এই চুনকুটিয়া গ্রামটিকে ঘৃণা করেন। এটাই ভক্ত ও মুরিদদের কাছে আমার প্রথম ও শেষ চাওয়া।

আওয়ামী লীগ এবং বিএনপি'র তথাকথিত দুই পাণ্ডা ক্রমে নেতা আমার বাড়িটির একমাত্র রাস্তাটি বন্ধ করে দিলো। আড়াই শত বছর যে পথ দিয়ে হেঁটেছি সেই পথটুকু বন্ধ করে রাখা হয়েছে। কোনো প্রতিবাদ, কোনো প্রতিকার পেলাম না। বুঝতে পারলাম, রাজনীতির প্রশ্নে দুইটি দল, আসলে শ্রেণীচরিত্রে দু'টি এক ও অভিন্ন। একটি ঢাকার শেয়াল, অন্যটি কলকাতার শেয়াল—এই যা পার্থক্য। আমি জানি, আমার এই বিলাপগুলো, এই লিখনির পাশে সম্পূর্ণরূপে বেমানান, তবু লিখার মাঝখানে অধর্মের কয়টি কথা কলঙ্কের তিলক হয়ে থাক। জর্জ বার্নার্ড শ খুব দুঃখ-ভারাক্কাণ্ড হৃদয়ে মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যুতে বলে গিয়েছিলেন : ‘অতিরিক্ত সততার পুরস্কার পেয়ে গেলেন মহাত্মা গান্ধী মানুষরূপী এক অসুরের গুলিতে।’

‘বিস্মিল্লাহির রাহমানির রাহিম।’ বে-ইসম-আল্লাহ। বে= সহিত, ইসম = গুণাবলি। অর্থাৎ ‘আল্লাহর গুণাবলির সহিত, যিনি দয়ালু এবং দয়ালু।’ ‘রহমান’-ও দয়ালু এবং ‘রহিম’-ও দয়ালু। কিন্তু কেউ এর কোরানিক পার্থক্যটুকু করলো না, বরং ভাষার ছক্কাপাজ্ঞা নামক স্টাইলের রঙ-চঙ চড়িয়ে ‘পরম দয়ালু এবং পরম দাতা’ লিখে শেষ করে দেন। আসলে ‘রহমান’ শব্দটি সর্বসাধারণের জন্য দয়ালু অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে : এমনকি যারা আল্লাহর অস্তিত্ব অস্বীকার করে, তাদেরকেও আল্লাহ রেজেক দিয়ে থাকেন। ইহাই

সাধারণ দান। ইহাই মেজাজি দান। কিন্তু ‘রহিম’ শব্দটির অর্থ যদিও দয়ালু, কিন্তু সর্বসাধারণের জন্য ব্যবহৃত হয় নি। ‘রহিম’-এর দানটি একটি বিশেষ দান। আপন নফসের সঙ্গে মিশে থাকা খান্নাসকে তাড়ানোর সাধনায় যারা ধ্যানসাধনার জেহাদে লিপ্ত তাদেরকে উদ্ধার করে মুক্ত করে দেওয়া, তথা দুনিয়ার দাসত্বের শৃঙ্খলগুলো হতে মুক্ত করে দেওয়া— এটাকেই বলা হয় ‘রহিম’-রূপী দান তথা বিশেষ দান। তাই আমরা দেখতে পাই, ক্রমার পরেই মুক্তি তথা ‘গফুরর রহিম’, ক্রমার পরে ‘রহমান’-রূপটি আর থাকে না তথা ‘গফুরর রহমান’ শব্দটি কোরান-এর একটি আয়াতেও পাওয়া যায় না। আল্লাহ দুইটি স্থানেই দয়ালু। একটি সাধারণ দয়ালু, অপরটি বিশেষ দয়ালু। তাই প্রথমে সাধারণ দয়া তথা ‘রহমান’-রূপে এবং পরে বিশেষ দান তথা ‘রহিম’-রূপে।

এবার আমরা নবি-রসুলের পার্থক্যটুকুর বিষয়ে সামান্য কয়টি কথা বলছি, কারণ আমার রচিত সুফিবাদ আত্মপরিচয়ের একমাত্র পথ নামক বইটিতে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। ‘রসূল’ শব্দটির প্রশ্নে কোরান-এ ফেরেশতাদেরকেও রসূল বানানোর কথাটি পাই। কিন্তু নবি বলার প্রশ্নে কোরান-এর একটি স্থানেও ফেরেশতাদেরকে নবি বলা হয় নি। এই একটিমাত্র

কথাতেই সব কিছু পরিষ্কার বোঝা যায়। ফেরেশতারা সেবক তথা সেবা করে থাকে। আর মানুষ সেই সেবা গ্রহণ করে থাকে। তাই মানুষ আশরাফুল মাখলুকাত তথা সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব। কিন্তু সেবক ফেরেশতাদেরকে কোরান-এর একটি স্থানেও আশরাফুল মাখলুকাত বলা হয় নি— তা সেই ফেরেশতাদের যতই ক্ষমতা দেওয়া হোক না কেন। ক্ষমতা এবং সম্মান এই দুটো বিষয় যে মোটেও এক নয় তারই জ্বলন্ত উদাহরণ হলো ফেরেশতা এবং মানুষ। ফেরেশতারা মানুষের রূপ ধারণ করতে পারে, কিন্তু রূপটা এখানে মুখ্য নয়, বরং গোণ; কারণ, ফেরেশতাদেরকে নফসও দেওয়া হয় নি, রুহও দেওয়া হয় নি। আর খান্নাসের অবিরাম কুমন্ত্রণা হতে ফেরেশতারা সম্পূর্ণ মুক্ত।

একটি মানুষ যখন ধ্যানসাধনার জেহাদের মাধ্যমে খান্নাস হতে মুক্ত হয়ে সম্পূর্ণ একা হয়ে যেতে পারে, তখন নফসে মোতমায়েন্নার অধিকারী হয়ে যেতে পারে, তখনই আল্লাহকে ডাক দিলে আল্লাহ সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেন। তাই কোরান-এ সুরা মোমিনের ষাট নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে, “উদউনি আস্তা জেবলাকুম” তথা ‘সুতরাং, তোমাদের রব বললেন : একা ডাকো, ডাকের জবাব সঙ্গে সঙ্গে পাবে। কিন্তু দুইজন ডাকলে ডাকের জবাবটি জীবনেও পাবে না, শুধু ডেকেই যাবে।’ (হুবহু উদ্ধৃত নয়)।

সুরা মোমিনের এই ষাট নম্বর আয়াতে স্পষ্ট বলে দেওয়া হয়েছে যে, একা ডাকো, সঙ্গে সঙ্গে জবাব পাবে। এই কথাটিতে আল্লাহ কী বোঝাতে চেয়েছেন? যা কিছু পাওয়া যায় তা নগদই পাওয়া যায়, বাকিতে নয়। কারণ বাকির নাম অনেক সময় ফাঁকিতে পরিণত হয়। উম্মতদের শিক্ষা দেবার জন্য মহানবি যে হেরাণ্ডহায়

পনেরটি বছর ধ্যান করেছেন সেই ধ্যানের বিনিময়ে আল্লাহ কোরান নগদই দিয়েছেন, বাকিতে নয়; নবুয়ত নগদই পেয়েছেন, বাকিতে নয়; রুহুল আমিনের দর্শন নগদই পেয়েছেন, বাকিতে নয়।

মোহরম মাসে বহু ঘটনা ঘটে যাওয়ার বিদঘুটে ব্যাপারটি কী অপূর্ব সাজে সাজিয়ে দিয়েছে উমাইয়া এবং আব্বাসীয় রাজবংশ! মহানবির প্রাণপ্রিয় নাতি শহিদে আজম ইমাম হোসাইনের (আ.) শাহাদাত দিবসটি এই ১০ই মোহরম। এই দিবসটির মূল্যায়ন যাতে কোনোদিন অনাগত কালের মুসলমানেরা করতে না পারে তারই জন্য অনেক বিদঘুটে শুভ জন্মের অবতারণা করেছে উমাইয়া এবং আব্বাসীয় রাজবংশ। এই বিদঘুটে, শুভ কয়টি ঘটনার কথা তুলে ধরতে চাই। এই ১০ই মোহরমের দিনে আদি পিতা আদম (আ.) এবং আদি মাতা হাওয়ার তওবা আল্লাহর দরবারে কবুল হয়। এই ১০ই মোহরমের দিনেই নুহ নবি (আ.)-র কিসতি জুদি পর্বতে ডুবে। এই ১০ই মোহরমের দিনে দুই মাসের পেটে তিন মাস অবস্থান করার পর মাহ বালুচরে বন্দি করে ইউনুস নবি (আ.)-কে ফেলে দেয় এবং ইউনুস নবি (আ.) গা বাড়ান দিয়ে বাড়িতে চলে যান। এই ১০ই মোহরমের দিনে আইউব নবি (আ.)-কে যে ১৮ বছর কীটে খেয়েছিলো সেই অসহ্য যাতনা হতে তিনি মুক্তিলাভ করেন। এই ১০ই মোহরমের দিনে কম করে ইলেও আড়াই হাজার নবির জন্মদিন। সংক্ষেপে এটুকুই বললাম।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, আদম (আ.) আর হাওয়ার তওবা যে ১০ই মোহরম কবুল হয়েছিল, এই তারিখটি কে বা কারা নির্ধারণ করেছিলো? কারণ মানুষই তো ছিলো না! এমনকি হাবিল-কাবিলেরই জন্ম হয় নি। তা হলে কেমন করে, কী উপায়ে নির্ধারণ করা হলো যে এই ১০ই মোহরমেই আদম (আ.)-হাওয়ার তওবা কবুল করা হয়েছে? নুহ নবি (আ.)-র ঘটনা, আইউব নবি (আ.)-র ঘটনা, ইউনুস নবি (আ.)-র ঘটনাগুলো এই একই দিনে তথা ১০ই মোহরম ঘটেছিলো, তাহা কারা

লিখে রেখেছিলো? সন-তারিখ গণনা করার ক্যালেন্ডার কি তখন আবিষ্কার হয়েছিল? কিন্তু যেটি সবচেয়ে মজার ঘটনা সেটি হলো, আট-দশটি নবি নন, বরং দুই হাজার পাঁচশত নবি জন্মগ্রহণ করেছিলেন এই শুভ ১০ই মোহরম্মের দিনে। এতগুলো নবির শুভ জন্মদিন ইমাম হোসাইনের (আ.) শাহাদাত বরণ করাটিকে লান করে দেবার একটি ম্যাকিয়াভেলীয় রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র। এই দুই রাজবংশ অনাগত কালের মুসলমানদের বোঝাতে চেয়েছে যে, আড়াই হাজার নবির শুভ জন্মদিনের সামনে একজন আওলাদে রসুল এবং সাহাবার কতটুকু মর্যাদা থাকতে পারে তারই চিত্রটি তুলে ধরা হয়েছে। অধম লিখক, ১০ই মোহরম্মের বিষয়ে টেলিভিশনে আলোচনা করতে গিয়ে এক জাদুবেল সিএসপি অফিসার এবং বেশ কয়টি ইসলামি গ্রন্থের প্রণেতা এবং ইসলামিক ফাউন্ডেশনের একজন জাদুবেল মহাপরিচালক যখন এই ১০ই মোহরম্মের বিস্তারিত ফজিলত বর্ণনা করছিলেন, আমি অবাক বিস্ময়ে এতিমের মতো ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইলাম, আর ভাবলাম : অনুসরণ আর অনুকরণের প্রতিভা এবং সৃষ্টি করার প্রতিভার মাঝে আকাশ-পাতাল ব্যবধান।

একদম পুরনো প্রাচীন ঘটনাগুলো ঘটে যাবার তারিখটি কী সুন্দর নির্ধারণ করে ফেলা হলো, অথচ যিনি একদম লেটেষ্ট নবি তথা শেষ নবি সেই মহানবি হজরত মুহম্মদ (আ.)-এর জন্মদিনটি এখনও দেড় হাজার বছর হয় নি; সব নবির সেরা নবি এবং সর্বশ্রেষ্ঠ নবি এবং একদম লেটেষ্ট নবির জন্মদিনটি এক ফেরকার অনুসারীরা ৯ই রবিউল আউয়াল বলে ঘোষণা দেয় এবং পালন করে; এভাবে কোনো ফেরকা পহেলা, কোনো ফেরকা দোসরা, কোনো ফেরকা তেসরা, এভাবে বেশ কয়টি ভিন্ন ভিন্ন দিনে নবির

জন্মদিবসটি পালন করে। তবে আহলে সুন্নাতুল জাম্মাতের অনুসারীরা তথা অধম লিখক যে ফেরকার অনুসারী তারা পালন করেন ১২ই রবিউল আউয়াল। সবচেয়ে লেটেষ্ট নবির লেটেষ্ট জন্মদিনটি নিয়ে এত মতবিরোধ, কিন্তু প্রাচীন কালের এতগুলো ঘটনা ঘটে যাওয়ার দিবসটি যে ১০ই মোহরম ইহাতে প্রায় ইসলামি গবেষকরাই একমত পোষণ করেন। কেমন যেন একটা নফ্‌আমির চাপা দুর্গন্ধ বেরোচ্ছে, যা খেয়াল না করলে ধরা কষ্টকরই বটে। ১৭টি মিথ্যাকে বার বার সত্য বলে প্রচার চালিয়ে গেলে মিথ্যাগুলো সত্যের মতো শব্দ করতে চায়। এই অপ্রিয় দর্শনটির যিনি জন্মদাতা তাঁর নামটি হলো হিটলারের চামচা ড. গোয়েবল্‌স।

এই ১০ই মোহরমের এতগুলো মিথ্যার অবতারণাটি এতকাল সত্য সত্য বলে প্রচার করার দরুন মুসলমানদের কানে সত্যের মতো বেজে উঠছে বলে মনে হয়। কত রকম যে টিটকারি করা হয় ড. গোয়েবল্‌সকে, কিন্তু তার এই দর্শনটি যে জনমনে কতটুকু তাসির পয়দা করে তা আমরা কমবেশি সবাই হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি। এই খান্নাসি জ্ঞান, এই খান্নাসি আদর্শ, খান্নাসি সভ্যতার কোন প্রান্তে গিয়ে যে একদিন ধপাস করে ফেলে দেবে এবং খান্নাসি সভ্যতার মৃত্যু ঘটান পর যে কয়জন মানুষ বেঁচে থাকবে তারা যদি আবার যুদ্ধ করে তা হলে তাদের সর্বাধুনিক অস্ত্রটি হবে পাথরের টুকরা, বাঁশের লাঠি আর হাতাহাতি-কোস্তাকুস্তি।

আন্তরিক মোবারকবাদ জানাই শিয়া ফেরকার মুসলমান ভাইদের। কারণ, তারা যদি এই ১০ই মোহরম্মের বিষাদময় কারবালার রণপ্রান্তরে আওলাদে রসুলদের শাহাদাত বরণের দিবসটি মেজাজিরূপে পালন করার ব্যবস্থাটি না করে যেতেন তা হলে হয়তো হাকিকি ঘটনাগুলোর বেদনা ততটুকু অনাগত কালের মুসলমানদের মনে করিয়ে দিতো না। যদি তিনটি মেজাজি শয়তান এবং মেজাজি আল্লাহর কাবা ঘর এবং মেজাজি হজ্জব্রতটি পালন করার মেজাজি ব্যবস্থাটি না থাকতো তা হলে হয়তো হাকিকি ঘটনাগুলো অনাগতকালের মুসলমানদের মনে করিয়ে দিতো না। সুতরাং, যে কোনো ঘটনা, তা বড়ই হোক আর ছোটই হোক, তার মেজাজি রূপটি অবশ্যই থাকতে হবে, নতুবা হয়তো হাকিকি ঘটনাগুলো অনাগতকালের মুসলমানদের মনে করিয়ে দিত না।

‘রাব্বুল মাশরেকে ওয়াল মাগরেবে লাইলাহা ইল্লাহ’, ‘কুল্হ আল্লাহ আহাদ’, ‘লা মওজুদা ইল্লাল্লাহ’ অর্থাৎ ‘পূর্ব এবং পশ্চিমের যে দিকেই তাকাও না কেন, আল্লাহ ছাড়া কিছুই নাই’, ‘বলো, আল্লাহ অখণ্ড, অদ্বৈত স্বয়ম্ভু সত্তা’, ‘নাই, কোনো অস্তিত্ব একমাত্র আল্লাহ ছাড়া।’ মূল দৃষ্টিতে মনে হবে, সব কিছুই আল্লাহ এবং আল্লাহ ছাড়া আর কিছুই নাই। কিন্তু সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখতে গেলে দেখতে পাই যে, এমন কোনো ক্ষুদ্র অস্তিত্ব নাই, যে অস্তিত্বের মালিক একমাত্র আল্লাহ নন। অস্তিত্বের আগমন আল্লাহ হতে। বিবর্তনের বহু ধাপ পেরিয়ে একেকটি অস্তিত্ব একেক রূপধারণ করে। চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-নক্ষত্র এবং প্রাণিকুল সব কিছুরই আগমন একমাত্র আল্লাহ হতে। সুতরাং এই আগমনের মাধ্যমটিই হলো

অবধারিত বিবর্তনবাদ। সুতরাং, বিবর্তন ছাড়া বিভিন্ন রূপধারণ করার বিধানটি রাখা হয় নি। যদিও গ্রহ-নক্ষত্র হতে শুরু করে সব কিছুই একই অস্তিত্বের বহুরূপী প্রকাশ ও বিকাশ, যদিও সব কিছুর একই মূল হতে আগমন, কিন্তু এই আগমনগুলো আর মূল নয়। তাই মূলের প্রকাশ ও বিকাশের ধারাগুলোকে বলতে হয় আল্লাহর গ্রহ-নক্ষত্র, আল্লাহর সূর্য, আল্লাহর চন্দ্র, আল্লাহর জীবজন্তু, আল্লাহর নদী-নালা-সাগর ইত্যাদি। কারণ একটি ধূলিকণাও যদি আল্লাহ হতে সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে তথা সম্পূর্ণ পৃথক হয়ে আপন অস্তিত্ব নিয়ে অবস্থান করে তা হলে সেই ধূলিকণা যতই ক্ষুদ্র হোক না কেন, উহা আল্লাহর সঙ্গে শেরেক করেছে তথা শরিক হবার কথাটি ঘোষণা করেছে। ‘ওয়াহাদাহ লা শরিকা লাহ’— ‘তিনিই এক এবং কোনো অস্তিত্বই নাই যাহা আল্লাহর সঙ্গে শরিক হবার কথাটি ঘোষণা করতে পারে।’ (হুবহ উদ্ধৃত নয়)। সুতরাং অস্তিত্ব যেখানে, আল্লাহর অবস্থানটি সেখানেই। সুতরাং এখানে আল্লাহ না বলে একটি ‘র’ শব্দ যোগ করে ‘আল্লাহর’ বলতে হয়।

ছোট্ট একটি উদাহরণ দিয়ে ধারণাটি পরিষ্কার করতে চাই। কাপড়ের আগমন সুতা হতে, সুতার আগমন তুলা হতে (সিনথেটিকও হতে পারে), তুলার আগমন গাছ হতে, গাছের আগমন আগুন-পানি-মাটি-বাতাস হতে, আগুন-পানি-মাটি-বাতাসের আগমন আল্লাহ হতে। সুতরাং, আগুন আল্লাহর, বাতাস আল্লাহর, পানি

আল্লাহর, মাটি আল্লাহর, গাছ আল্লাহর, তুলা আল্লাহর, সুতা আল্লাহর এবং কাপড়ও আল্লাহর। এগুলোকে আর আল্লাহ বলা যাবে না, যদিও এগুলো সবই আল্লাহ হতে আগমন করেছে। আল্লাহ স্বয়ং জ্ঞাত এবং এই বিবর্তনের বহু ধাপগুলো একে একটি সেফাত তথা গুণাবলির গুণাবলি। সেফাত কখনও জ্ঞাত হয় না, এবং জ্ঞাত কখনও সেফাত হয় না। সেফাতের আগমন জ্ঞাত হতে, কিন্তু জ্ঞাতের আগমন কখনও সেফাত হতে নয়। সুতরাং একেরই বহুরূপ, অগণিত বিকাশ ও প্রকাশ : কিন্তু কোনো গুণই, কোনো বিকাশই, কোনো প্রকাশই সম্পূর্ণ পৃথক এক নয়, সবারই এক হতে আগমন। তাই নফস কখনও রুহ নয়, এবং রুহ কখনও নফস নয়। জীবাত্মা কখনও পরমাত্মা নয় এবং পরমাত্মা কখনও জীবাত্মা নয়। যদি পরমাত্মা তথা রুহ তথা স্বয়ং আল্লাহর জ্ঞাত কোনো নফসের সঙ্গে অদৃশ্যমান অস্তিত্বে বিরাজ করে, তা হলেও সেই নফসটি আল্লাহ নয়। আল্লাহ আল্লাহই এবং নফস নফসই। মানুষের নফসের নিকটেই আল্লাহর অবস্থানটির কথা ঘোষণা করা হয়েছে। একবটনে ঘোষণা করা হয় নি, বরং বহুবচনে আল্লাহ ঘোষণা করেছেন : ‘আমি’ নয়, বরং ‘আমরা’ তোমাদের শাহারগের নিকটেই আছি। যেহেতু মানুষের নফসের কাছেই আল্লাহ আছেন তাই মানুষের নফসটির সঙ্গে খান্নাসরূপী শর্যতানটিকেও একমাত্র পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে দেওয়া হয়েছে। খান্নাসমুক্ত নফসটি এক, কিন্তু খান্নাস থাকলেই দুই হয়ে যায়। দুই থাকলেই ‘আমরা’-রূপী আল্লাহর সেই নফসের মধ্যে উদ্ভাসিত হবার তথা বিকশিত ও প্রকাশিত হবার বিধানটি রাখা হয় নি। মানুষের নফসটি যেইমাত্র খান্নাসমুক্ত হতে পারে, তখনই আল্লাহর নূর সেই নফসটিকে সম্পূর্ণরূপে গ্রাস করে ফেলে, তখনই সেই নফসটি বলে ফেলে : ‘আনাল হক’, ‘লাইসা ফি জুব্বাতি সেওয়া আল্লাহ তায়ালা’, ‘আনা সুবহানি মা

আজ্জামুশ্শানি’, ‘ইমানাম ইয়ারাম কে আন্দার নুরে হক ফানি সুদাম, খাহে কে আনাল্লাহে বশ্ত খাহে কে হ আল্লাহ’, ‘সোহহম সোহমি’, ‘তুই মুই, মুই তুই’ ইত্যাদি এবং ইত্যাদি। এই ঘোষণাগুলো, এই বাণীগুলো একেকটা একেক রকম, একেকটা একেক রকম ভাষার শৈলীতে গাঁথা, কিন্তু সবই পবিত্র নফসটিকে গ্রাস করে ফেলা জ্বাত আল্লাহরই ঘোষণা। তাই মাওলানা জালাল উদ্দিন রুমি বলেছেন, ‘গুফতায়ে উ গুফতায়ে আল্লাহ বুয়াদ, গারচে আজ্জ হালকুমে আবদুল্লাহ বুয়াদ।’ যার কথা সে-ই ঘোষণা করে যাচ্ছে, কিন্তু বাহ্যিক দৃষ্টিতে দেখতে পাচ্ছি মানুষ কথা বলছে। এ বড় সাম্প্রতিক বিজ্ঞানময় আল্লাহর খেলা। আল্লাহর বহু নৈপুণ্যের, বহু ঝঙ্কারের মাঝে একেরই ঘোষণা, একেরই বিকাশ, একেরই প্রকাশ। সুতরাং আল্লাহ আল্লাহই এবং মানুষ মানুষই। তবে মানুষের নফসটি তখন আল্লাহর বন্ধু হয়ে যায়। বন্ধু বন্ধুই আর আল্লাহ আল্লাহই। তাই খান্নাসমুক্ত নফসটিকে আল্লাহ না বলে ওলি বলা হয়, তথা বন্ধু বলা হয়। আল্লাহ এবং বন্ধুর মাঝেও একটি ‘র’-এর অবস্থান, তথা ‘আল্লাহর বন্ধু’। বন্ধুটি আল্লাহ নয়, বরং আল্লাহর। তাই বলা হয়ে থাকে ওলি-আল্লাহ তথা আল্লাহর ওলি। এরও উপরে এবং আরও উপরে এবং অসীম উপরে খান্নাসমুক্ত নফস এবং আল্লাহর রহস্যগুলো ধাপে ধাপে উঁচুতে উঁঠতে থাকে তথা আল্লাহতে চিরস্থায়ী হয়ে যায়।

ইহাকেই বলা হয় বাকাবিল্লাহ। এই বিষয়গুলো ভাষায় প্রকাশের বহির্ভূত। এই বিষয়গুলোকে বেঁধে রাখার মানবীয় কোনো ভাষা নেই, শব্দ নেই। রূপক ভাষা ব্যবহার করা হলেও কিছুই বোঝা যায় না, কিন্তু বাকাবিল্লাহতে অবস্থানকারীরা পরিষ্কার বুঝতে পারেন, ইহাই ‘আলিফ-লাম-মিম জালিকাল কিতাব।’—কোরান-এর এই আয়াতের ব্যাখ্যাটি মানুষ দিতে না পেরে বলে ফেলে ‘আল্লাহই ভালো জানেন।’ কিন্তু বাকাবিল্লাহতে অবস্থান করা অতি উচুস্তরের ওলিরা পরিষ্কার বুঝতে পারেন ‘আলিফ-লাম-মিম’-এর রহস্যটি।

শব্দ আর ভাষায় বাকাবিল্লাহর ওলিরা ভাবকে বেঁধে রাখতে পারেন না। শব্দ আর ভাষায় বেঁধে রাখা যায় না বলেই বাকাবিল্লাহর ওলিরা নির্বাক হয়ে যান। সুরা আরাকের ১৯৮ নম্বর আয়াতে বলা হচ্ছে, ‘দেখিতেছেন, তাহারা আপনাকে দেখিতেছে, অথচ তাহারা দেখিতেছে না।’

অস্তিত্ব নাই, কিন্তু শক্তি আছে। শক্তি কি অস্তিত্বের বাহিরে, না ভেতরে অবস্থান করে? হ্যানিম্যান জার্মানির একজন বিখ্যাত অ্যালোপ্যাথ ডাক্তার ছিলেন। অস্তিত্ব না থাকলেও অস্তিত্বের অভ্যন্তরে ধাপে ধাপে যে শক্তির মাত্রা বেড়ে যায় সেই শক্তির আবিষ্কারক ডা. হ্যানিম্যান। রঞ্জন যেমন অন্য কিছু আবিষ্কার করতে গিয়ে সহস্রা মনের অজান্তে একত্রে মেশিন আবিষ্কার করে ফেললেন, ডা. হ্যানিম্যানও মনের অজান্তে আবিষ্কার করে ফেললেন একটি সূত্র, একটি ফর্মুলা; আর সেই ফর্মুলাটি

হলো : অস্তিত্ব নাই, কিন্তু শক্তি আছে। কিন্তু এখানেও লক্ষ্য করার বিষয়টি হলো, একেক অস্তিত্বের একেক রকম শক্তি। মূলে শক্তি একই, কিন্তু একেক অস্তিত্বের একেক রকম সম্পূর্ণ ভিন্ন শক্তির প্রকাশগুলো আমরা দেখতে পাই। নাক্সডোম নামক অস্তিত্বসম্পন্ন ঔষধটিকে যখন নবম শক্তিতে রূপান্তর করা হয় তখন আর নাক্সডোম নামক ঔষধটির অস্তিত্ব থাকে না। ল্যাকেসিস নামক সাপের বিষটির অস্তিত্ব যখন নবম শক্তিতে রূপান্তর করা হয় তখন আর সর্পবিষের অস্তিত্ব থাকে না, থাকে কেবল শক্তি আর শক্তি। কিন্তু নাক্সডোমের শক্তি আর ল্যাকেসিসের শক্তির প্রকাশটি সম্পূর্ণ ভিন্ন। যদিও দু'টিই শক্তি, কিন্তু দু'টির অবস্থান সম্পূর্ণ ভিন্ন মেরুতে অবস্থান করে। কেন সম্পূর্ণ দু'টো ভিন্ন মেরুতে অবস্থান করে? এর উত্তরটি খুবই সহজ। 'জানি না' হলো এর সহজ উত্তর। তা হলে আমরা অন্তত এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, শূন্য কেবলই শূন্য নহে, বরং শূন্যের অভ্যন্তরে অনেক রকম ভিন্ন ভিন্ন শক্তির প্রকাশ ঘটে।

এই সূক্ষ্ম বিষয়টিতে এসেই দার্শনিকেরা আর খেঁচ রাখতে পারেন না। দার্শনিকেরা মনে করেন, সব কিছু যেন গতির গুপ্তশক্তির পথ দিয়ে অবিরাম অসীমের দিকে ছুটে চলছে। এই অনন্ত অসীমের ব্যাখ্যা কী? সহজ-সরল উত্তরটি হলো : জানি না।

নফস তথা প্রাণ তথা জীবাত্মা অসংখ্য অগণিত, কিন্তু মূলে একই নফস। কিন্তু যে নফসের সঙ্গে অস্তিত্বহীন মায়ার খান্নাস রূপটি অবস্থান করে সেই নফসের সঙ্গেই রূহ তথা পরমাত্মার তথা স্বয়ং আল্লাহর জ্ঞাত-রূপে অবস্থান করার ঘোষণাটি কোরান-এ পাই।

মায়া নামক খান্নাসের শক্তিটি অনুভব করা যায়, ব্যাখ্যাও দেয়া যায়, কিন্তু এ রকমটি কেন হলো ইহার

মূল উত্তরটি হলো : পরীক্ষা করার জন্য দেওয়া হয়েছে। কীসের পরীক্ষা? খান্নাসযুক্ত নফসটি একটি বিশেষ সেফাত, কারণ ইহার সঙ্গে স্বয়ং আল্লাহ জ্ঞাতরূপে অবস্থান করার কথাটি ঘোষণা করেছেন। এই জ্ঞাতরূপী আল্লাহকে তখনই পরিপূর্ণরূপে ফুটিয়ে তোলা যায়, যখন সাধক ধ্যানসাধনার জেহাদে লিপ্ত থেকে মাযারূপী খান্নাসটিকে তাড়িয়ে দিতে পারে। এই বিষয়টিতেও অনেক রকম বাঁকা-চোখা চিকন প্রশ্ন থাকতে পারে এবং এই প্রশ্নগুলোর কোনো প্রকার জাগতিক উত্তর না দিয়ে ধ্যানসাধনার জেহাদে লিপ্ত থাকলেই ধরা যায়। সুতরাং যুক্তিগুলোর যেখানে অনেকগুলো কবর দেখতে পাই, সেখানেই দেখতে পাই অনেকগুলো প্রেমের ফুল ফুটে আছে। সুতরাং এই সুক্ষ্ম বিষয়গুলো যুক্তির মাধ্যমে ধরা পড়ে না এবং ধরা পড়ার বিধান নাই, বরং আল্লাহর প্রেমে প্রেমিক হয়ে ধ্যানসাধনার জেহাদের মাধ্যমে বুঝতে হয়, জানতে হয়। এই জানবার মধ্যেও আল্লাহর ওলিদের একেক রকম ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ দেখতে পাই।

বিষয় মূলত একটিই, কিন্তু এর ব্যাখ্যা ও বর্ণনা অনেক রকম। আল্লাহকে পাবার জন্য ধ্যানসাধনার জেহাদ নামক মাধ্যমটিকে বর্জন করে, বই পড়ে, অনেক ওলিদের কথা শুনে অর্জন করা যায় না এবং অর্জন করার বিধানটি রাখা হয় নি। (মাদারজাত ওলিদের কথা সম্পূর্ণ ভিন্ন)।

মহানবি তাঁর উম্মতদেরকে চোখে আঙুল দিয়ে এই শিক্ষাটি দিয়ে গেলেন যে, নির্জন হেরাশহায় একাকী পনেরটি বছর ধ্যানসাধনার জেহাদটি করে যাও। খান্নাস-মিশ্রিত নফসটিকে মুক্ত করার জন্য সাধনায় ‘রহিম’-রূপ ধারণকারী আল্লাহর দর্শন পাবে এবং

খান্নাস-মুক্তির ক্ষমা প্রদর্শনটি তখনই হয়ে যাবে। তাই সাধকদের ধ্যানসাধনার জেহাদের সময় আল্লাহ ‘গফুরুর রহিম’-রূপে ধরা দেন, ‘গফুরুর রহমান’-রূপে না। কারণ ‘রহমান’-রূপে সাধারণ দান আর ‘রহিম’-রূপে বিশেষ দান।

পৃথিবী বিখ্যাত ফরাশি দার্শনিক জঁ পল সার্ত্রে অনুভূতির এই বিশাল প্রান্তরে এসে খেই হারিয়ে ফেললেন। কারণ ধ্যানসাধনার জেহাদের কথাটি তাঁর জ্ঞানা ছিলো না। তা না হলে এমন চমৎকার চিরকুমার মানুষটি ৬৪ সালের নোবেল প্রাইজটিও গ্রহণ করেন নি, বরং হাসিমুখে নোবেল প্রাইজটি প্রত্যাখ্যান করেছেন। ‘বিয়িং অ্যান্ড নাথিংনেস’ দর্শনটি দার্শনিক জঁ পল সার্ত্রেকে অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলো। চিরকুমার জঁ পল সার্ত্রে, নোবেল পুরস্কার প্রত্যাখ্যানকারী জঁ পল সার্ত্রে জ্ঞানসাগরের অনেক অনেক কাছে এসেও কেন জানি আসতে পারলেন না। গুরু এবং ধ্যানসাধনার জেহাদে লিপ্ত না থাকলে এখানে আসা যায় না। আর যারা আসতে পেরেছেন তাঁদের অধিকাংশই নির্বাক অথবা কিছু বলতে গেলে বোঝাটা অনেক কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়।

উপসংহারে তথা পরিশেষে পাঠকদের নিকট ভিক্ষার ভাণ্ডটি তুলে ধরে ভিক্ষা চাইলাম। কোরান তফসির, রুমির মসনবি-র হুবহু অনুবাদ, কালান্দারের দিওয়ান-এর অনুবাদ, আমির খসরুর দিওয়ান-এর অনুবাদ এবং

আরও কিছু মূল্যবান ফারসি ভাষায় রচিত বইগুলোর অনুবাদ করে বুঝিয়ে দিতে চাই যে, সুফিবাদ আত্মপরিচয়ের একমাত্র পথ এবং সার্বজনীন। নিজ হতে কিছু দান অথবা জাকাতের একটি ক্ষুদ্র অংশ অথবা কেঁরিবানির চামড়ার একটি ভাগ তাদের কাছেই ভিক্ষা চাইলাম যারা মনেপ্রাণে চান সুফিবাদের প্রচার ও প্রসার হোক। ভিক্ষা শব্দটি এ জন্মই ব্যবহার করলাম যে, দিতেও পারেন আবার না দিলেও বলার কিছু থাকে না।

আরেকটি বিষয়ের জন্য ভিক্ষা চাই না, বরং সাহায্য চাই; আর সেই বিষয়টি হলো, সম্ভবত বাংলাদেশে এই প্রথম কোনো পীর-ফকির ধ্যান-সাধনার, মোরাকাবা-মোশাহেদার, আপন নফস হতে খান্নাসকে মুক্ত করার জেহাদে আকবরের জন্য একটি স্কুল খুলেছেন। এই ধ্যানসাধনার স্কুলে লেখাপড়া করার কোনো বালাই নাই, সঙ্গীত-ওয়াজের ক্যাসেট এ-গুলো গুনবার ব্যবস্থা নাই, কেবল একাগ্র মনে সেলাই ছাড়া দুই টুকরা কাপড় পরে, মাছ-মাংস-ডিম বর্জন করে, চুল-নখ কর্তন না করে, জীবহত্যা না করে এবং কোনো প্রকার কথা না বলে ৪০ দিনের মোরাকাবা, ৪ মাসের মোরাকাবা, ১ বছরের মোরাকাবা করার জন্য ২৫ বিঘা জমির উপরে ৫৫ বান ডেউটিন দিয়ে ঘেরাও করে ১৬টি ধ্যানসাধনার ঘর ইতিমধ্যেই তৈরি করেছে। বাংলাদেশের বিভিন্ন তারিকার বিভিন্ন মুরিদানেরা আমাদের শিক্ষাপ্রকরণে গ্রহণ করে ধ্যানসাধনা করে যাচ্ছেন। এই ১৬টি ঘরকে টিনশেড বিল্ডিং তৈরি করার

মানসে এবং চারিদিকে হুঁটের প্রাচীর দেবার মানসে এবং গরিব সাধকদের দু'টো ভাল-ভাত খাবার ব্যবস্থা করার জন্য আপনাদের কাছে সাহায্য চাইছি। এই ধ্যানসাধনার স্কুলটি আমরা প্রতিষ্ঠিত করেছি নরসিংদী জেলার শিবপুর উপজেলার জয়নগর ইউনিয়নের নৌকাঘাটা গ্রামে। বিশেষ করে বলে রাখা ভালো যে, এই ১৬টি ঘর তৈরি করার যাবতীয় খরচ এবং টিন দিয়ে বেড়া দেবার খরচ যে কয়জন দাতা সাহায্য করেছেন তাদের প্রত্যেকের নাম-ঠিকানা স্কুলে সাইনবোর্ড আকারে লিখে দিয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছি। তবে যারা নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক তাদের নাম দেওয়া হয় নি। দাতাদের দান গ্রহণ করলেও তাদের নাম-ঠিকানা লেখাটাকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ছাড়া অন্য কিছু মনে করতে চাই না।

এই পৃথিবী বড়ই কৃতজ্ঞ। কৃতজ্ঞতার সামান্য উপযুক্ততা যারই মাঝে থাক না কেন, এমনকি অতি নিম্ন শ্রেণীর (?) মানুষের প্রতিও এই পৃথিবী কৃতজ্ঞতা জানাতে মোটেই কার্পণ্য করে না। শুনেছি মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করেছে এমন এক জেলে যার নাম রামদয়াল (নামটি সঠিক নাও হতে পারে)। রামদয়ালের ছেলে আজ হতে প্রায় শতবর্ষ আগে পাঠশালায় লেখাপড়া করতে যেত। জেলে রামদয়াল ছেলেকে পাঠশালায় না গিয়ে তারই সঙ্গে মাছ ধরার কেশিল শিখতে নিয়ে গেল। ছেলের লেখাপড়া করার প্রতি প্রচণ্ড আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও বাবার আচরণে প্রতিবাদ না করে বাবার সঙ্গেই মাছ ধরায় রত ছিলো। এভাবে বেশ কিছু বছর কেটে যাবার

পর জেলে রামদয়াল একদিন মারা গেল। ছেলে মাছ বিক্রির টাকা জমিয়ে জমিয়ে বেশ

কিছু জায়গাজমি খরিদ করল। তারপর ৯ ইঞ্চি ইন্টের গাঁথুনি দিয়ে বিরাট এক কলেজ প্রতিষ্ঠা করলো। সেই কলেজ আজও আছে, আজও সেই কলেজের প্রতিষ্ঠাতার নামটি পৃথিবী কৃতজ্ঞতার সহিত বার বার উচ্চারণ করে জানিয়ে দেয়। সেই কলেজটির নাম গুরুদয়াল গভর্নমেন্ট কলেজ। কিশোরগঞ্জ জেলাতে এই কলেজের অবস্থান। সামান্য একজন জেলের এই বিশাল অবদানটি আজও পৃথিবী কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করে। এই পৃথিবীতে কেউ কিছু দান করলে সেই দানের উপযুক্ততা অনুসারে পৃথিবী কল্পবেশি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে যায়। আর যারা ধনৈশ্বর্যের বিরাট মালিক হবার পরও পৃথিবীকে কিছুই দিয়ে যায় না, তাদের নাম কুণ্ডাও মনে করে না। কৃতজ্ঞতার অপূর্ব প্রতিফলন দেখি পৃথিবীর অবয়বে। নিষ্ঠুরতার কঠিন প্রতিফলনটিও দেখতে পাই পৃথিবীর ওই একই অবয়বে। পৃথিবী যেন বলছে, ‘খেয়েই গেলে! আনন্দ করেই গেলে! সুখভোগের পুকুরে ডুবেই রইলে! একটা কানাকড়িও পৃথিবীকে দান করে গেলে না! এটাই কি মানবের জীবন?’

ঢেৱাগে জ্ঞান শৰীফ

ডা. বাবা জাহাঙ্গীৰ বা-ইম্মান আল-সুৱেশ্বৰী

সূচী পত্ৰ

‘জন্মই আমাৰ আজন্ম পাপ’ / ৬১

সত্যলাভেৰ মাধ্যম / ৬৭

ৰুহেৰ হাকিকত / ৭২

শয়তানেৰে পৰিচয় / ৭৭

ওলি-আল্লাহৰ জেহাদ / ৭৯

‘আল্লাহ মানা সহজ, পীৰ মানা কঠিন’ / ৮২

আল্লাহ ও তাঁৰ আশেক অভিন্ন / ৮৬

কদৱেৰে ৰাত / ৮৮

আল্লাহৰ হক ও বান্দাৰ হক / ৯০

ওহাবি, শিয়া এবং ১০ই মৌহরম / ৯১

ইফতাৰ / ৯৬

সুফিবাদ সাৰ্বজনীন / ৯৯

জেহাদ বনাম যুদ্ধ / ১০৪

ধৰ্মেৰে মূল সত্য / ১০৭

নবি বড়, না ৰসূল বড়? / ১০৯

মৌল্লাদেৰে সংকীৰ্ণতা / ১১৬

সালাত তথা নামাজ / ১২০

কোৱান-এ সালাতেৰে উল্লেখসমূহ / ১২২

‘সবার উপরে মানুষ সত্য’ / ২৫২

শাহ সুফি লকবপ্রাপ্তদের নামের তালিকা / ২৫৫

চিত্রাবলি / ২৫৭

‘জন্মই আমার আজন্ম পাপ’

মাত্র একটি কবিতার লাইন আমাকে শুধু অবাকই করে নি, বরং ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করতে গিয়ে খেই হারিয়ে ফেলতে হয়। সেই কবিতার বাক্যটির নাম হলো, ‘জন্মই আমার আজন্ম পাপ’। জানি না কোন কবির লিখা, কিন্তু এত মারাত্মক, এত ভয়াবহ কবিতা আমার এই সত্তর বছরের জীবনে পাই নি এবং পাব কি না সন্দেহ। এত বড় কঠিন বাস্তব এবং অধ্যাত্ম সত্যকথাটি মাত্র একটি কবিতার লাইনে কবি কেমন করে তুলতে পারলেন— ভাবতেও অবাক লাগে।

মোট (স্থূল) পাপ চোখে ধরা পড়ে, কিন্তু সূক্ষ্ম হতে আরও সূক্ষ্ম পাপগুলো চোখে ধরা পড়তে চায় না। কবি কায়েস, খৈয়াম, সানাই, সিরাজি, জিবরান, জিগার, পোপ, শেলি, নজরুল আর ঠাকুরও বোধ হয় লিখে যেতে পারেন নি যে, ‘জন্মই আমার আজন্ম পাপ’।

আমি অধম লিখক এখানে স্থূল পাপের দর্শনগুলো বলতে চাই না। কারণ কমবেশি মোটামুটি সবাই তা বুঝতে পারে। কিন্তু সূক্ষ্ম পাপগুলো এক একটি অদৃশ্য দেয়াল, যা ভাঙা যায় না এবং কেউ কেউ ভাঙতে পারলেও শেষ দিকে কিছুটা পাপ থেকে যায়। অবশ্য পাপ শব্দটি এখানে এই বিষয়ে ধরা যায় না, কিন্তু বুঝিয়ে দিলেই বুঝতে পারে যে, জন্মটাই একজনের জন্য আজন্ম পাপ। এই বিষয়টা এত লম্বা, এত বিশাল এবং এত বিস্তৃত যে, সাগরের কিনারা কয়েকদিন একটানা জাহাজ চালাবার পর দেখা যায়, কিন্তু এই পাপের কিনারাটি মৃত্যু নামক ঘটনা আসার আগ মুহূর্ত পর্যন্ত বুঝবার জ্ঞানবার কোনো উপায় থাকে না। বরং ঘুমের কাছে যেমন মানুষ অসহায় পরাজয় বরণ করে নেয়, সে রকম এই সূক্ষ্ম পাপের কাছে অসহায়ের মত পরাজয় বরণ করে নিতে বাধ্য হয়।

এখন আমরা একটু ব্যাখ্যা করি। ধরুন, আমার জন্ম মুসলমানের ঘরে। প্রশ্ন আসবে, কোন ফেরকার মুসলমানের ঘরে জন্ম হয়েছে? ফেরকার নাম বলার পর আবার প্রশ্ন আসবে যে, এই ফেরকার কয়েকটি শাখা-প্রশাখা আছে, তাই আপনি ফেরকার কোন শাখা-প্রশাখায় জন্মগ্রহণ করেছেন? ধরুন, আমি শিয়া ফেরকার ইসমাইলিয়ার ঘরে জন্ম নিয়েছি। তা হলে ইসমাইলিয়া ফেরকার মুসলমানেরা হজব্রত পালন

করেন না, এমনকি মেকাজ্জি হজ্জ এবং হাকিকি হজ্জ দুইটির একটিও পালন করেন না। যদি বলেন, কেন হজ্জরত পালন করেন না? তা হলে এই ফেরকার তৈরি যুক্তিগুলো, যা জন্ম থেকেই অর্জন করেছেন, সেই যুক্তিগুলো তুলে ধরবেন। আপনাকে শত কোরান-হাদিসের দলিল দিয়ে বুঝালেও আপনি বুঝতে চাইবেন না। কেন? কারণ কী? কারণটি হলো, আপনার জন্মটাই আজন্ম পাপ। এই আজন্ম পাপের মজবুত দেয়ালটি ভেঙে বেরিয়ে আসাটা কন্ম কথা নয়। হাতে গোনা কয়েকজন যে বেরিয়ে আসে, তা-ও দেখা যায়? কেন বেরিয়ে আসতে পেরেছে? উত্তর : তকদির। এর চেয়ে উন্নত মানের জবাবটি আমার জানা নাই। আবার যদি পিণ্ডর শিয়া ফেরকায় জন্ম হলো, তা হলে হজ্জরত আবু বকর (রা.), হজ্জরত ওমর (রা.), হজ্জরত উসমান (রা.) এবং হজ্জরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রা.) নামক সাহাবাদেরকে সাহাবা বলে মেনে নেওয়া তো দূরে থাক, বরং যা-তা মন্তব্য করতেও কসুর করবেন না। তার উপর সুফিবাদটিকে তো মেনে নেবার প্রশ্নই ওঠে না। একজন সুন্নি মুসলমান এবং বিরাট ইসলাম গবেষক তো গবেষণার মাধ্যমে প্রমাণ করে ছেড়েছেন(?) যে হজ্জরত আবু বকর, ওমর আর উসমানের (রা.) কাজগুলো মোটেই ইসলামি কাজ বলে ধরে নেওয়া যায় না এবং এই বিষয়টি প্রমাণ করার জন্য

একটি গবেষণামূলক বই লিখেছেন। সেই বইটি এতই চালু যে, প্রায় চল্লিশটি ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছে। এমনকি বাংলা ভাষায় অনুবাদ করে নাম দেওয়া হয়েছে অবশেষে আমি সত্য পেলাম। চমৎকার নাম। নামটি পড়লে বইটি পড়ার আগ্রহ কমবেশি জাগবে। অধম লিখক বইটি আদ্যোপান্ত পড়ে চমকে গেলাম। কারণ এত দলিল দেওয়া হয়েছে যে অবাক হতে হয়। কিন্তু লিখক সব কিছু লিখেছেন সত্য, কিন্তু সুফিবাদ বলে যে কিছু একটা আছে তা মানা তো দূরে থাক, বরং একটি লাইনও লিখবার দরকার মনে করেন নি। তবে ধন্যবাদ যে, সুফিবাদের পক্ষ এবং বিপক্ষ কোনোটারই ধার ধারতে যান নি। অবশেষে লিখক সুন্নি ফেরকা পরিত্যাগ করে শিয়া ফেরকাটিকে গ্রহণ করে নিয়েছেন। এই শিয়া ফেরকাটিকে গ্রহণ করেছেন বলেই বইটির নাম দিয়েছেন অবশেষে আমি সত্য পেলাম অর্থাৎ শিয়া ফেরকাটি সঠিক আর বাকি ফেরকাগুলো সঠিক নয়। অবশ্য ইহা লিখকের অনেক দিনের অনেক পরিশ্রমের গবেষণার ফসল। লিখকের গবেষণার স্বাধীনতার উপর কেউ হস্তক্ষেপ করেন নি এবং করাটা সঠিক নয়। কারণ ভালো-মন্দ বুঝবার ব্যক্তি স্বাধীনতা আছে এবং এভাবে পাঠক বিভিন্ন গবেষকদের গবেষণার ফসল পড়ে দেখে-শুনে যাচাই-বাছাই করে নেবে। তবে এটা বলা যায় যে, এই গবেষক সুন্নি ফেরকায় জন্মগ্রহণ করার পর ইসলামের উপর প্রচুর পড়াশুনা করে শিয়া ফেরকায় চলে এলেন এবং বইটির নাম দিলেন অবশেষে আমি সত্য পেলাম। গবেষকের নাম জানি কিন্তু লিখলাম না, তবে ইসলাম গবেষণায় তিনি বিখ্যাত ডক্টরেট ডিগ্রি

লাভ করেছেন এবং ইসলামের ওপর এত বড় বিশাল বুক কালেকশন পৃথিবীতে হাতে গোনা কয়েকজনের আছে। সুতরাং এ কথাটি অকপটে বলা যায় যে, এই গবেষকের বৈলায় কবিতার ‘জন্মই আমার আজন্ম পাপ’ কথাটি খাটে না। কারণ জন্ম সাইনবোর্ডটি তিনি কাঁধ হতে নামিয়ে ফেলতে পেরেছেন। তা কতটুকু গ্রহণযোগ্য এবং কতটুকু গ্রহণযোগ্য নয় সেই বিচারের ভারটি কে নেবে? কেউ না। তা হলে? তকদির।

এবার আমরা বিখ্যাত বই দ্য স্পিরিট অব ইসলাম এর লিখক সৈয়দ আমীর আলীর কথাটি বলতে চাই। লিখক নিরপেক্ষ সেজে বইটি লিখেছেন, কিন্তু আসলেই কি তিনি নিরপেক্ষ? না, মোটেই না। দৃশ্যমান জগতের চিন্তা-চেতনার উপর দাঁড়িয়ে তিনি বইটি লিখে গেছেন বলেই আধ্যাত্মিক জ্ঞানটির বিষয়ে কিছু একটা লিখা তো দূরে থাক, বরং যা-তা লিখে সাড়ে পাঁচ হাজার বছরের সঞ্চিত সুফিবাদের উপর অনেক রকম ঠাট্টা-তামাশায় ভরা টিটকারি করে গেছেন। যে-সুফিবাদের ধারক বাহক বড় পীর সাহেব, খাজা বাবা, দাতা গজে বকস, জালালউদ্দিন রুমি— এবং বহু মনীষীর আধ্যাত্মিক জ্ঞানটিকে উনি কোনো জ্ঞানই বলতে চান নি। কেন? কী কারণটি এর পেছনে কাজ করেছে? সৈয়দ আমীর আলী জন্মগ্রহণ করেছেন শিয়া মুসলমানের ঘরে। শিয়া মুসলমানেরা সুফিবাদ মানে না এবং আল্লাহর ওলিদেরকে অস্বীকার করে। তা হলে? ‘জন্মই আমার আজন্ম পাপ’ কথাটি কী সুন্দর সৈয়দ আমীর আলীর উপর মানিয়েছে।

এভাবে যদি আমরা প্রতিটি ফেরকার অনুসারীদেরকে তুলে ধরতে চাই তা হলে দেখতে পাবো প্রতিটি ফেরকার অনুসারী নিজেকে সঠিক বলে দাবি করবে এবং করে আসিছে এবং দলিল দস্তাবেজও দাঁড় করানিছে। এক ইসলামের তেহাজুরটি ফেরকার সব ফেরকার অনুসারীই যদি সঠিক বলে দাবি করে তা হলে কী উত্তর দেব? কী বলবো? বলবো, ‘জন্মই আমার আজন্ম পাপ।’ তার মানে যে-ফেরকার জন্মেছে সেই ফেরকার কিছু না কিছু গন্ধ থেকে যাবে। একজন বাঙালি যত ভালো ইংরেজি ভাষাই জানুক না কেন, মুমূর্ষ অবস্থায় বিছানায় শুয়ে কখনোই বলবে না যে, ‘গিভ মি এ গ্লাস অফ ওয়াটার’, বরং যে ভাষায় জন্মেছে সেই ভাষাতেই বলবে। বলবে, এক গ্লাস পানি দাও, অথবা জল দাও। কেন বলবে? উত্তর : ‘জন্মই আমার আজন্ম পাপ।’

অর্জিত জ্ঞানে দেয়াল থাকবেই। অর্জিত জ্ঞানে হিংসা, প্রতিযোগিতা কিছু হলেও থাকবে। একজন জাঁদরেল অভিনেতা এনখনি কুইনকে যদি বলেন যে, অভিনয়ের জ্ঞান কতটুকু অর্জন করতে পেরেছেন? উত্তরে এনখনি কুইন বলবেন, অভিনয়ের পাঠশালায় কেবল পড়ছি। তা হলে অভিনয়ের বিশ্ববিদ্যালয়ে কারা পড়ছেন? উত্তর নাই। কারণ, এনখনি কুইন, কার্ক ডগলাস, গ্রেগরি পেগরাই যদি অভিনয়ের পাঠশালা ডিঙ্গাতে পারেন নি বলেন তো অভিনয়ের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক পাওয়া তো দূরের কথা ছাত্রই পাওয়া যাবে না। কেন এ রকম কথা বলেন? সবাই এ রকম কথা বলে আসছে, তাই যে কোনো জাঁদরেল অভিনেতাও ঐ একই কথা বলবে। কেন বলবে? অভিনয় নামক ফেরকার ভাষাটি এই রকম? কেন এই রকম হলো? উত্তরটি হলো, ‘জন্মই আমার আজন্ম পাপ।’ অথবা পবিত্র। নেগেটিভ ও পজিটিভ।

ওহাবি ফেরকার অনুসারী আমার এক বন্ধুকে বললাম, ‘খাজা বাবা বলেছেন যে, তিনি ইমাম হোসেনের গোলামের গোলাম। তোমার বলার কিছু

আছে?’ বন্ধু বললো, ‘খাজা বাবা বিরাট ভুল করেছেন।’
 আমি বললাম, ‘কী রকম ভুল?’ বন্ধু বললো, ‘খাজা
 বাবা যদি বলতেন যে, তিনি আল্লাহর গোলাম তা হলে
 ঠিক হতো। কারণ “ইয়া কানাবুদু” তথা একমাত্র
 আল্লাহর ইবাদত করতে হয়।’ আমি বললাম, ‘বন্ধু,
 “ইয়া কানাসতাইন” বলতে কী বুঝ?’ বন্ধু বললো,
 “একমাত্র আল্লাহর সাহায্য চাই” বলতে হবে।’ আমি
 বললাম, এই কিছুদিন আগে কাশ্মিরে ভূমিকম্প হলো
 এবং আশি হাজার মুসলমান মারা গেল। দশ বারো লক্ষ
 মুসলমান, প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় বরফ পড়ছে, তাঁবু নাই, কবুল
 নাই, খাদ্য নাই— কিন্তু তারা আল্লাহর কাছে সাহায্য না
 চেয়ে জাতিসংঘের কাছে সাহায্য কেন চাইলো? এবাদত
 করতে গিয়ে ওলির কাছে যেমন যেতে হয়, সাহায্য
 চাইবার সময় তেমনি জাতিসংঘের সাহায্য চাইতে হয়।
 মাধ্যম ছাড়া এবাদত যেমন কবুল হয় না তেমনি মানুষ
 ছাড়া সাহায্য পাওয়া যায় না। সুতরাং মাধ্যম না মেনে
 নিলে কোনো কাজই করা যায় না। আল্লাহ সবখানেই
 আছেন, কিন্তু সবখানে সেফাতরূপে তথা গুণাবলিরূপে
 আছেন। সেফাত তথা গুণাবলির বর্ণনা করতে গেলে
 একটি ‘র’-শব্দ ব্যবহার করতে হয়, তথা আল্লাহর সৃষ্টি
 বলতে হয়, যদিও সমস্ত সৃষ্টিই আল্লাহর প্রকাশ ও
 বিকাশ। কিন্তু আল্লাহকে জ্ঞাতরূপে তথা মূলরূপে তথা
 ওরিজিন-রূপে পাঠায়া যায় মাত্র তিনটি স্থানে : একটি
 লা-মোকাম, আরেকটি জিনের অন্তর এবং অপরটি
 মানুষের অন্তর। আল্লাহ বলেছেন : আমরা তোমাদের
 শাহীরগ তথা জীবন রংগের নিকটেই আছি। এই বলাটা
 জ্ঞাতরূপে বলা হয়েছে। সুতরাং আল্লাহর আসল পরিচয়
 তথা মূল পরিচয়টি মানুষ ছাড়া জ্ঞানবার কোনো আইন
 রাখা হয় নাই। ঠিক ওই একই রকমভাবে বলা যায়
 যে, আল্লাহর সমস্ত সৃষ্টিরাজ্যের কোথাও শয়তানকে
 থাকার অনুমতি দেওয়া হয় নাই। আল্লাহর সমস্ত
 সৃষ্টিরাজ্য তোহিদে বাস করে। তোহিদে শয়তান প্রবেশ
 করতে পারে না। তোহিদে শয়তানের
 প্রবেশ একদম নিষিদ্ধ।

আল্লাহ পাক শয়তানকে থাকবার মাত্র দুইটি স্থান নির্ধারণ করে দিয়েছেন : একটি জিনের অন্তর, অপরটি মানুষের অন্তর। মানুষের অন্তর ছাড়া শয়তানের পরিচয় পাবার আইন নাই। যদি কেউ শয়তানের অবস্থান জিন ও মানুষ ছাড়া বলতে চায় তা হলে তার এই কথাগুলো, তার এই ব্যাখ্যা বিশেষণগুলো একদম মনগড়া, বানোয়াট ও কোরান-বিরোধী কথা। সুতরাং মানুষ ছাড়া শয়তানের পরিচয় জানা যায় না। শয়তান যেমন জীবন্তরূপে মানুষের মধ্যে ধরা দেয়, তেমনি আল্লাহ পাকও মানুষের মধ্যে জীবন্তরূপে ধরা দেন, সুতরাং মানুষ ছাড়া শয়তানের পরিচয় জানা যায় না যেমন, তেমনি আল্লাহর পরিচয়ও জানা যায় না। সুতরাং মানুষ আল্লাহর রহস্য এবং শয়তানও আল্লাহর রহস্য। এই বিষয়টি ভালো করে জানা না থাকলে ধর্মজ্ঞানের প্রশ্নে লেজে-গোবরে অবস্থা হয়।

প্যানথিইজম ইসলাম নয়, আবার ইসলাম হতে বের করে দেওয়াও যায় না। প্যানথিইজম গুণাবলিকে অস্বীকার করে। প্যানথিইজমে জ্ঞাত ও সেফাতের স্থান নাই। প্যানথিইজম সৃষ্টি ও সৃষ্টিকে এক করে ফেলে। তবে প্যানথিইজমের মধ্যে প্রকারভেদ করা যায়। খাঁটি প্যানথিইজমে সৃষ্টিকে আল্লাহর বলা হয়, ডেজাল প্যানথিইজমে সৃষ্টির সব কিছুকে আল্লাহ বলা হয়। অনেকেই প্যানথিইজমের মধ্যে শেরেকের গন্ধ পায়। আসলে লোভ-মোহ এবং দুনিয়াকেই একমাত্র কাম্য ও প্রাপ্য হিসাবে যারা গ্রহণ করে নিয়েছে, তারাই শেরেকে ডবে আছে। শেরেক সৃষ্টিতে নাই, শেরেক মানুষের অন্তরে বিরাজ করে।

বিষ্ঠ-বৈভবকেই জীবনের একমাত্র বিষয় বলে যারা মনে করে তারাই শেরেকে ডবে আছে। বিষ্ঠ-বৈভব শেরেক নয় ; বিষ্ঠ-বৈভবের মাঝে ডবে থাকাটাই শেরেক। বিষ্ঠ-বৈভবে থাকা দোষের বিষয় নয়। হাঁস সারাদিন পুকুরের জলে বাস করে। সাঝের বেলা পুকুর হতে উঠে আসার সময় হাঁসের শরীরে আর জল থাকে না। হাঁসের মতো যারা বিষ্ঠ-বৈভবের পুকুরে থেকেও

বিভ-বৈভবের জল শরীরে লাগতে দেয় না, তারাই শেবেক হতে মুক্ত।

এই বিষয়টি বোঝা খুবই সহজ, কিন্তু অন্ধ লোভ ও মোহ যখন মানুষকে বেষ্টন করে ফেলে তখন বোঝা খুবই কষ্টকর। নিজের ভেতর হতে এই লোভ-মোহকে তাড়িয়ে দেবার সংগ্রামকেই বলা হয়েছে জেহাদ। ইহাই হাকিকি জেহাদ। ইহাই আসল জেহাদ। এই জেহাদে যারা জয়ী হতে পেরেছেন তাঁরাই আল্লাহর ওলি, তাঁরাই পীর ও মুরশিদ, তাঁরাই সত্যপথের পথপ্রদর্শক।

বুখারি শরিফ-এর হাদিসে আছে যে, বান্দা নফল এবাদত করতে করতে আল্লাহর এত নিকটে এসে পড়েন যে, বান্দার জিস্মা আল্লাহর জিস্মা হয়ে যায় এবং সেই জিস্মায় আল্লাহ কথা বলেন। বাহিরের দৃষ্টিতে মনে হবে বান্দাই কথা বলছে। কিন্তু আসলে বান্দা উপলব্ধি, আল্লাহই লক্ষ্য। তাই মাওলানা জালাল উদ্দিন রুমি মসনবি শরিফ-এ বলেছেন : গুফতায়ে উ গুফতায়ে আল্লাহ বুয়াদ, গারচে আজ হালকুমে আবদুল্লাহ বুয়াদ। অর্থাৎ, আল্লাহর কথা আল্লাহই বলছেন, কিন্তু সেই কথাগুলো আল্লাহর বান্দার কণ্ঠে প্রকাশ পাচ্ছে।

বদরের যুদ্ধে মহানবি যে ককর উড়ে মেরেছিলেন উহা মহানবি উড়ে মারেন নি, বরং আল্লাহই উড়ে মেরেছিলেন; উহা মহানবির হাত নয়, বরং আল্লাহর হাত— বলা হয়েছে। সুতরাং মানুষ আল্লাহর রহস্য। আল্লাহর এই রহস্য জানিতে হলে, বুঝতে হলে মানুষ ছাড়া জানা অসম্ভব। যারা এই রহস্য বুঝতে পারে না, তাদের জন্মটাই আজন্ম পাপ। যারা এই রহস্যটি বুঝতে পারে তাদের জন্মটাই আজন্ম রহমত তথা আশীর্বাদ।

কেবলমাত্র আল্লাহর রাস্তায় (অন্য রাস্তায় নয়) যারা অস্ত্রের যুদ্ধ করে তারাও জেহাদ করে, তবে অস্ত্রের জেহাদটি নিছক একটি মেজাজি জেহাদ। অবশ্যই এই মেজাজি জেহাদেরও প্রয়োজন আছে, কিন্তু ইহা হাকিকি তথা আসল জেহাদ নয়। হাকিকি জেহাদ আপন অন্তরে বাস করা খান্নাসরুপী শয়তানকে তাড়িয়ে দেওয়া। ওহাবি, শিয়া, বাটালভি, চক্ৰালভি, বাহাই, মোতাজিলা

এবং ইসলামের অন্যান্য ফেরকার অনুসারীরা হাকিকি জেহাদটিকে অস্বীকার করে এবং এই ফেরকায় যারা জন্মগ্রহণ করে তারাও এদের অনুসারী হয়ে যায় এবং এই অনুসরণ করাটাই হলো ‘জন্মই আমার আজন্ম পাপ।’ হাকিকি জেহাদ অস্বীকারকারী ইবনে কাসির তাঁর তফসিরে ইবনে কাসির-এ অনেক রকম অতি পুরাতন দিনের কথাগুলো তুলে ধরে অনেক রকম ধীনাইপানাই করে হাকিকি জেহাদটিকে চাপা দিয়ে ফেলেছেন। কারণ ইবনে কাসির ওহাবিদের গুরুত্বাকর ইমাম ইবনে তাইমিয়ার অনুসারী এবং এটাই ইবনে কাসিরের জন্য ‘জন্মই আমার আজন্ম পাপ।’

মেজাজি তথা অনুষ্ঠান না থাকলে হাকিকি তথা আসল বিষয়টি বিমূর্ত হয়ে যায়। অনুষ্ঠানটি মূর্ত এবং অনুষ্ঠানের ভিতরের বিষয়টি বিমূর্ত। কেউ মূর্তকে মেনে নেয়, কিন্তু বিমূর্তকে মানে না— এটাই তার ‘জন্মই আমার আজন্ম পাপ।’ কেউ বিমূর্তকে মনেপ্রাণে মেনে নিয়ে মূর্তকে অস্বীকার

করে, এবং এটাকেও ‘জন্মই আমার আজন্ম পাপ’ বলে ধরে নেওয়া যায়। কিন্তু যারা বিমূর্তের মধ্যে ডুবে থাকেন এবং মূর্তের কোনো ধার ধারেন না, তারা আসলেই গালবাতের হালে মাজ্জুব হয়ে আছেন। মাজ্জুবদের ওপর কোনো ফতোয়া নাই, সুতরাং মাজ্জুবদের বেলায় ‘জন্মই আমার আজন্ম পাপ’ কথাটি মানায় না।

‘জন্মই আমার আজন্ম পাপ’ কথাটি ব্যাপক অর্থে বোঝাতে চেয়েছি, গণ্ডির বৃত্তে অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে নয়। কথাটি নেগেটিভ, কিন্তু সার্বজনীন সত্য। জন্মই আমার আজন্ম আশীর্বাদ কথাটি বলতে হয়েছে তাদেরই জন্য যারা আল্লাহর মারফতের সাগরে অবগাহন করতে পেরেছেন। বিত্ত-বৈভব, ধন-রত্নের

সুখশান্তি মোটেও সুখশান্তি নয়। বিষ্ঠ-বৈভবের সুখের পেছনে একটি অস্থিরতার বোবা কান্না সব সময় জুড়িয়ে থাকে। যারা বিষ্ঠ-বৈভবের মালিক তারা এই কথার সত্যতা সব সময় স্বীকার করে নেবে। কেউ খ্রিস্টান ধর্মে জন্মগ্রহণ করলে জন্মসূত্রে সেই লোকটি খ্রিস্টান হয়ে যায়। খ্রিস্টান ধর্মেও অনেক ফেরকা আছে। তার মধ্যে দুইটি ফেরকার একটি প্রটেষ্ট্যান্ট অপরটি রোমান ক্যাথলিক। রোমান ক্যাথলিকের ঘরে যে মানুষটা জন্মগ্রহণ করেছে সে ব্যক্তি প্রটেষ্ট্যান্টের ধর্ম গ্রহণ করে নিতে পারে না। আবার প্রটেষ্ট্যান্ট ফেরকার ঘরে যে জন্মগ্রহণ করেছে সে কখনও রোমান ক্যাথলিক ধর্ম গ্রহণ করতে পারে না। সুতরাং উভয় ফেরকায় উভয়ের জন্মটি ‘জন্মই আমার আজন্ম পাপ।’ কেউ মানুষ চাই না মানুষ, কিন্তু সত্য অপ্রিয় হলেও সত্য। একইভাবে মুসলমানদের সুন্নি ফেরকায় যে জন্মগ্রহণ করেছে সে শিয়া ফেরকাটিকে মেনে নিতে পারে না এবং শিয়া ফেরকার অনুসারিটি সুন্নি ফেরকাটিকে মেনে নিতে পারে না। উভয় ফেরকার সত্যে অবস্থান করার অঙ্গসুদলিল কোরান-হাদিস হতে দেওয়া হয়। কিন্তু সুন্নির দলিল শিয়া গ্রহণ করে না এবং শিয়ার দলিল সুন্নি গ্রহণ করে না, তা যত বড়ই সহি হোক না কেন। এটাকেই বলা হয় ‘জন্মই আমার আজন্ম পাপ।’

এ রকমভাবে পৃথিবীর প্রায় ধর্মেই ফেরকাবাজি ও গঞ্জির অবস্থানটি দেখতে পাই। চাই সে ধর্মটি জৈন ধর্মই হোক, হিন্দু ধর্মই হোক, জরাথুস্ত্রের পার্সি ধর্মই হোক, গৌতমের বৌদ্ধ ধর্মই হোক, গুরু নানকের শিখ ধর্মই হোক, কনফুসিয়াসের কনফুসিয়াস ধর্মই হোক, তাও ধর্মই হোক, মানি ধর্মই হোক, শেণ্ট ধর্মই হোক, সাবাইয়া ধর্মই হোক, মং ধর্মই হোক, দেলমাদল ধর্মই হোক— প্রায় সব ধর্মেই গঞ্জির বৃত্তে অবস্থান করার দৃশ্যটি দেখতে পাই। সুতরাং কবির কবিতাটি ‘জন্মই আমার আজন্ম পাপ’ একটি নেগেটিভ, একটি বিলাপ, একটি বোবা কান্নাই হোক না কেন— সত্য অপ্রিয় হলেও একদম সত্য। এই ধর্মগুলোর দেয়াল ভেঙে যারা

সার্বজনীনতার আশ্রয় জানাতে পেরেছেন তারাই সুফি এবং তাঁদের আশ্রয়টিই সুফিবাদ।

যারা ধর্ম মানে না, যারা ধর্মকে অস্বীকার করে, যারা ঘোর বহুবাদের পুজারি, যারা পরাবাস্তবের ঢোল পিটিয়ে বহুর পুজা করে, যারা ‘আল্লাহ নাই’ বলে ঘোষণা-দেওয়া নাস্তিক- তাদেরকেও মৃত্যুর পর ধর্মের দেয়াল ভাঙতে দেখি নি। মুসলমান কবরেডকে কবরে যেতে হয়, হিন্দু কবরেডকে শ্মশানের আগুনে পুড়তে হয়, নাস্তিক কাল মার্কসকে খ্রিস্টান সম্মাধিতে সম্মাहित করা হয়। কারণ জন্মই ছিলো এদের আজন্ম পাপ। এই কথাগুলো বড়ই সাম্রাজ্যিক কথা। কেউ বুঝতে পারবে, কেউ বুঝতে পারবে না। বোঝাটাও তকদির, না বোঝাটাও তকদির।

সত্যলাভের মাধ্যম

মহানবি বলেছেন যে, আদম যখন মাটি ও পানিতে অবস্থান করছে তখনও তিনি নবি। যিশুখ্রিস্ট বলেছেন, হজরত ইব্রাহিমের জন্মের আগেও তিনি নবি। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, তিনি এই ধরাধামে আটবার এসেছেন। মহাদেব বলেছেন, তিনি এই ধরাধামে চারবার এসেছেন। কোরান নিজেই ঘোষণা করছে যে কোরান নুর। কাগজ-কালি-কলমের লেখাগুলো নুরি কোরান-কে বুঝবার একটি মাধ্যম মাত্র। একটি মানুষের অতি স্পষ্ট হুঁসি ফ্রেমে বাঁধিয়ে দেয়ালে টাঙানো অছে, সেই ছবিতে একটি ফুলের মালাও শোভা পাচ্ছে : ছবিটি আসল মানুষ নয়, বরং আসল মানুষটির পরিচয়ের একটি মাধ্যম। বনের সিংহ-বাঘের ছবিগুলো আসল সিংহ-বাঘের পরিচয় জানবার একটি মাধ্যম। আসল সিংহ-বাঘ দেখতে হলে যে-অরণ্যে

সিংহ-বাঘ থাকে সেখানে যেতে হবে অথবা চিড়িয়াখানায় যেতে হবে।

যারা মানুষের ছবিটিকেই আসল মানুষ মনে করে, যারা ছবির সিংহ-

বাঘকে আসল সিংহ-বাঘ মনে করে, যারা কাগজ-কালি-কলমে লিখা কোরান-টিকে নুরি কোরান তথা আসল কোরান বলে মনে করে তাদেরকেই বা কী বলার থাকতে পারে?

কাগজ, কালি ও কলমের আরবি ভাষায় রচিত কোরান-টিও নিঃসন্ধেহে কোরান। এই কাগজ-কালি-কলমের আরবি ভাষায় রচিত কোরান-টি হলো মেজাজি কোরান এবং নুরি কোরান-টি হলো হাকিকি কোরান। তাই আমরা দেখতে পাই যে মাওলা আলি (আ.) হজরত ওসমান গণিকে (রা.) বলেছেন যে, 'আমি স্বয়ং নুরি কোরান।' নুরি কোরান যাকে উচ্ছাসিত করেন তিনি আল্লাহর আবদুহ পর্যায়ের ওলি। অবশ্য দুনিয়ার মানুষের জন্য তুলনামূলকভাবে মেজাজি কোরান-এর মূল্য অপরিমিত।

ইসলামের প্রায় বেশির ভাগ বিষয়ের দুইটি দিক থাকে : একটি মেজাজি, অপরটি হাকিকি। এই ভাগ তথা বিভাজনটির স্পষ্ট ধারণা না থাকলে বিভ্রান্তির অঙ্ককারে পড়ে যাবার সম্ভাবনাটি থেকে যায়।

জেহাদ বিষয়টির প্রশ্নে কোরান কোথাও যেমন 'পবিত্র জেহাদ' বলে নি সেই রকমভাবে কোরান-এর কোথাও, আমার জ্ঞান মতে, কোরান-এর বেলায় 'পবিত্র কোরান' শব্দটি ব্যবহার করা হয় নি। 'পবিত্র জেহাদ' এবং 'পবিত্র কোরান' এই শব্দ দু'টো কোরান-এর কোথাও নাই। কোরান বিষয়ে কোরান নিজেই ঘোষণা করছে যে কোরান-টি হলো 'কোরানুল করিম', 'কোরানুল হাকিম', 'কোরানুল মবিন' এবং 'কোরানুল মজিদ'। এই চারটি নামেই আমরা কোরান-কে দেখতে পাই। অবশ্য যারা 'পবিত্র জেহাদ' এবং 'পবিত্র কোরান' বলেন তাদেরকেও বলার কিছু নাই। ভুল বিষয়গুলো অনেক সময় আসলের রূপ মীনব মনে ধারণ করে এবং

এতেই বা বলার
কী থাকতে পারে?

আসল সিংহ-বাঘকে দেখতে হলে যেমন অরণ্যে অথবা চিড়িয়াখানায় যাবার খাটনি দিতে হয়, সে রকম নুরি কোরান-এর পরিচয় জ্ঞানিতে হলে হেরাণ্ডহার মতো নির্জন স্থানে কমপক্ষে ১৫টি বছর ধ্যানসাধনা করতে হয়। এই ১৫ বছরের ধ্যানসাধনার মোরাকাবাটির কথা খুব কম ইসলাম গবেষকের লিখনিতে দেখতে পাই।

মাদারজাত ওলি বড়পীর সাহেব, খাজা গরিব নেওয়াজ, মোজাদ্দের আলফেসানি সেরহিন্দ, বাকি বিল্লাহ, বাহাউদ্দিন নকশেবন্দি, আহমদ রেফায়ি, মহিউদ্দিন ইবনুল আরাবি, শরফুদ্দিন ইয়াহিয়া মুনিরি, ওয়ারেস করম— এ রকম মাদারজাত ওলিরা বছরের পর বছর নির্জনে ধ্যানসাধনার মোরাকাবাটি করেছেন। এই রহস্য জগতের সত্যটিকে জানবার আশ্রান জানানো হয়েছে কোরান-এর সুরা কাহাফের ১৬ নম্বর আয়াতে। সেই আশ্রানটির সামান্য অংশ তুলে ধরলাম : ‘ফাউ ইলাল কাহাফে, ইয়ানগুর লাকুম রাব্বুকুম মিন রাহমাতেহি ওয়া ইউহাইঈ লাকুম মিন আমবেকুম মেরফাকান’ অর্থাৎ— ‘সুতরাং তখন তোমরা কাহাফের দিকে আশ্রয় গ্রহণ করো। তাহা হইলে তোমাদের রব তোমাদের প্রতি তাঁহার রহমতের ভাণ্ডার খুলিয়া দিবেন এবং তোমাদের কার্যসমূহকে জীবন্ত ও সহজ করিয়া দিবেন।’

আমরা বলতে চাই : হে মানবজাতি, যদি তোমাদের আল্লাহর রহস্যলোকের রহস্য জানবার ইচ্ছা ও বাসনা থাকে তো আল কাহাফের দিকে তথা পর্বতগুহার দিকে

এগিয়ে যাও। আল কাহাফ তথা পর্বতগুহায় আপন ইচ্ছায় ঢোকা যায় না। তাই ‘কাহাফে যাও’ না বলে ‘কাহাফের দিকে যাও’ বলা হয়েছে। আল কাহাফে তথা পর্বতগুহায় আশ্রয় নেবার চেষ্টায় রত থাকলে আল্লাহ রবরূপ ধারণ করে রহমতের দরজা খুলে দেন। সুতরাং কাহাফ বলতে শুধু পর্বতগুহা নহে, বরং কাহাফ শব্দটি শুধু একটি নামকরণ মাত্র। কাহাফ আল্লাহর রহমতের গুহা তথা আবরণ। কাহাফের বাহিরে মানব জীবনটি কমবেশি মায়ার বন্ধনে ভরপুর। আবার কাহাফ অর্থ যে পর্বতের গুহা এটাও একেবারে ফেলে দেওয়া যায় না। না উহা কোনো গুহা, না উহা গুহায় আবদ্ধ। অথচ শাস্তিক অর্থে এটাকে পর্বতগুহা বলেই ধরে নিতে হবে। ধরে নিলাম যে কাহাফ অর্থে কেবলমাত্র পর্বতগুহাই বোঝায়, তা হলে মানবজাতির পক্ষে সবার কাহাফে প্রবেশ করাটি একটি অসম্ভব ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। অথচ আল্লাহ পাক সবাইকে কাহাফে প্রবেশ করার আদেশ করছেন।

ধরে নিলাম, সবাই আল্লাহর আদেশ পালন করে কাহাফে প্রবেশ করলো। তা হলে মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ মানুষগুলো আর থাকছে না। মায়ার বন্ধনে মানুষগুলো যদি না থাকে তা হলে ‘তোমাদের পরীক্ষা করার জন্য পাঠানো হয়েছে’— কথাটির সৌন্দর্য লীন হয়ে পড়ে। সুতরাং কাহাফের অধিবাসীও থাকবে, আবার মায়ার বন্ধনে জড়ানো অগণিত মানুষও থাকবে। এটাই আল্লাহর রহস্যময় লীলাখেলা।

কোরান-এ বলা হয়েছে যে কাফেরেরা আল্লাহকে ঢেকে রাখে। এই কথাটির রহস্য বুঝতে না পেরে অনেকেই রাগে-অভিমানে উল্টো করে লিখে ফেলেন যে, আল্লাহ কাফেরদেরকে ঢেকে ফেলেন। যদি সত্যিই আল্লাহ কাফেরদেরকে ঢেকে রাখেন তো কুফুরি কারা করবে? তা হলে তো কুফুরি করার কেউ আর থাকে না।

আমার এই কথাগুলোর ওহাবি ফেরকার মুসলমানদের কাছে এক পয়সাও দাম নাই। কারণ

ওহাবিরা আল্লাহর ওলি আছে বলে স্বীকারই করে না, সুতরাং মানারি প্রশ্নটি অবান্তর। ওহাবিরা কেবলমাত্র আল্লাহকেই মানে এবং এই আল্লাহকে মানার কথাটি প্রতিটি মুসলমানের কাছে বড়ই সুন্দর এবং চমৎকার বলে মনে হবে। ওহাবিরা বড় পীর সাহেব, স্পেনের মহিউদ্দিন ইবনুল আরাবি (ফতুহাতে মক্কী-র লেখক), মিশরের আহমদ রেফাই, মাওলানা জালাল উদ্দিন রুমি এবং হজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গাজ্জালিকে পাঁচ শ্রেষ্ঠ কাফের (?) বলে থাকে এবং বলে থাকে যে বিশ্বময় এইসব সুফি দরবেশরা শেরেক-বেদাত দিয়ে ইসলামকে কলুষিত করে ফেলেছে। বাংলাদেশ সুফি-দরবেশের দেশ, বাংলাদেশ লালন আর হাছন রাজার দেশ। এই দেশেও সুচতুর ওহাবিরা খাসির মাথা সামনে রেখে ভেড়ার মাংস বিক্রি করার মতো ওহাবি মতবাদ প্রচার করে চলছে। ওহাবিদের মূল কথাটি হলো: কীসের আবার পীর-ফকির-ওলি-দরবেশ? ওহাবিরা এক লাফে আল্লাহর কথা বলে। তাই ওহাবিরা আল্লাহর নামটি অনেক রকম সম্মানের ভাষায় বলে থাকে। যেমন, ‘হজুর আল্লাহ’, ‘জালে শানাহ’, ‘আল্লাহ সুবহানুতায়াল্লা’— এই রকম মিষ্টি মিষ্টি নামে আল্লাহকে ডাকে। আমাদেরও শুনতে খুবই ভালো লাগে। হাল্লে ইসলামের নামে ওহাবি মতবাদ প্রচার করার জন্য একটি টিভি চ্যানেল খোলা হয়েছে। সেই চ্যানেলে আপনি জীবনেও মহানবির নামে মিলাদ পাঠ করাটি পাবেন না এবং পৃথিবীর কোনো বড় বড় বিখ্যাত ওলিদের নামগুলো ভুলেও বলা হয় না। কারণ ওহাবিরা ওলিই মানে না, তাই ওলিদের প্রশংসা পাওয়াটির প্রশ্নই আসে না। আমার জানা মতে পাকিস্তান, ভারত এবং বাংলাদেশে মাত্র একটি আহলে সুন্নাতুল জাম্মাতের টেলিভিশন চ্যানেল দেখতে পাই। সেই চ্যানেলটি পাকিস্তানের এবং চ্যানেলটির নাম হলো কিউ টিভি। এই কিউ টিভি চ্যানেলটি ওহাবি চ্যানেলগুলোর উপর একটি প্রচণ্ড আঘাত এবং ওহাবিদের মোচড়ামোচড়ি বা বিরাট অসুবিধা শুরু হয়ে গেছে। তা ছাড়া ওহাবিরা আল্লাহকে নিয়ে এতই ব্যস্ত থাকে যে আল্লাহর ওলিদের কথা ভাববার সময়ই পায় না!

ওহাবিদের ওহাবি চ্যানেলে প্রায় বিষয়ের আলোচনা করতে গিয়ে ওলি-আল্লাহদের নিখুঁত খোঁচাখুঁচি করে। আকার-ইঙ্গিতে আল্লাহর সার্বভৌমত্বের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে ওলিদের কাছে যাওয়া মহাপাপ হবে বলে ইঙ্গিতে ইশারায় বুঝিয়ে থাকে। ওহাবিরা কি জানে যে কোরান-এর বর্ণিত নবিরে যতগুলো মুসলমান বানিয়েছেন এবং আটশত বছর আগে খাজা বাবা অখণ্ড ভারতে একাই বিরানবাই লক্ষ মুসলমান বানিয়েছেন এবং হিসাব কষলে মোটামুটি একটা ধারণা পাই যে সব নবিরে মিলে খাজা বাবার বারো ভাগের এক ভাগ মুসলমান বানিয়েছেন, অথচ এই খাজা বাবার নামটি এই ওহাবিরা ভুলেও মুখে উচ্চারণ করবে না, বরং খাজা বাবার নামটি গুনামাত্র তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠে।

প্রশ্ন করতে পারি যে, ওহাবি আলেম-উলামারাই কি কোরান-এর ব্যাখ্যার সোল এজেন্সি লাভ করেছেন? কোরান কি কেবল ওহাবি আলেম-উলামারাই বুঝে ফেলেছে? খাজা বাবা কি কোরান-হাদিস পড়েন নি? ওহাবি আলেম-উলামাদের কাছে পীর-মুরিদি কথাটি একদম নাজায়েজ। অথচ খাজা বাবা মুরিদ হয়েছেন খাজা উসমান হারুনীর কাছে। ইসলামি জ্ঞানের সমুদ্র বলে যাকে আখ্যায়িত করা হয় সেই হজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গাজ্জালি মুরিদ হয়েছেন হজ্জরত আবু আলি ফরমাদির কাছে। হজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গাজ্জালির বিখ্যাত বই এহিয়ায়ে উলুমউদ্দিন -এর মধ্যে এক স্থানে হজ্জরত জুনুন মিসরির মাজারে কিছু চাইবার উপদেশটি পাই। এই উপদেশটি ওহাবিদের কাছে অসহ্য। ওহাবিরা বলে থাকে যে 'ইয়া কানা বুদু' তথা 'একমাত্র আল্লাহরই এবাদত করি' এবং 'ওয়া ইয়াকা নাম্মাইন' এবং 'একমাত্র আল্লাহরই সাহায্য চাই।' সুতরাং আল্লাহর কাছে না চেয়ে হজ্জরত বাবা জুনুন মিসরির কাছে চাওয়াটি অন্যায় (?) এবং গুরুতর অপরাধ (?)।

এই কিছুদিন আগে আজাদ কাশ্মীরে প্রচণ্ড ভূমিকম্প হয় এবং ইহাতে প্রায় আশি হাজার মুসলমান মারা যান। ১০/১২ লক্ষ মুসলমান, সেই ভূমিকম্পের সময়ে প্রচণ্ড শীতে বরফ পড়ছিলো, দুর্গম স্থান, প্রচণ্ড শীত, বরফ পড়ছে, ১০-১২ লক্ষ মুসলমানের খাদ্যের অভাব, শীত নিবারণের কব্বলের অভাব, তাঁবুর অভাব, চিকিৎসার ঔষধপত্রের অভাব এবং পানীয় জলের অভাব— এইসব মিলিয়ে এই ১০-১২ লক্ষ মুসলমানের অবস্থাটি ছিলো করুণ এবং শোচনীয়। এই ১০-১২ লক্ষ মুসলমান কেন জাতিসংঘের সাহায্য চাইলেন? জাতিসংঘের অনেক দেশই তো ইহুদি-নাসারাদের দেশ। এইভাবে ওহাবিদের অনেক রকম প্রশ্ন করা যায়, কিন্তু কোনো লাভ নাই।

অবশেষে ওহাবি আলেম-উলামাদেরকে একটি প্রশ্ন করতে চাই যে, এই লক্ষ লক্ষ আল্লাহর ওলি-গাউস-কুতুব-আবদাল-আরিফরা বলে গেছেন যে, ওলির মাধ্যমে ছাড়া আল্লাহর নৈকট্য পাওয়া অসম্ভব এবং অপরপক্ষে ওহাবি আলেম-উলামারা বলে থাকে যে, ওলির মাধ্যমের কোনো প্রয়োজন নাই এবং সোজা আল্লাহকে ডাকতে হবে। যদি ওহাবি আলেম-উলামাদের কথাগুলো সত্য বলে ধরে নেই তা হলে এই লক্ষ লক্ষ ওলিদের উপদেশগুলো নিছক প্রতারণা বলেই মনে হবে। আবার ওলিদের কথাগুলো যদি সত্য বলে ধরে নেই তা হলে ওহাবি আলেম-উলামাদের অবস্থানটি কোথায় গিয়ে দাঁড়ায় তা পাঠক বাবা-মায়েদের কাছেই ছেড়ে দিলাম।

রুহের হাকিকত

ইসলামি জ্ঞানের সমুদ্র বলে যাকে সবাই একবাক্যে মেনে নেন সেই বিশ্ববিখ্যাত হজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গাজ্জালির এহিয়ায়ে উলুমউদ্দিন নামক বিশাল কেতাবের একস্থানে তিনি যে জ্ঞানেক মুসলমান ব্যক্তিকে হজ্জরত বাবা জুনুন মিসরির মাজারে গিয়ে চাইবার কথাটি বলেছেন,

উহাকে ওহাবি ফেরকার অনুসারী আলেম-উলামারা বিভিন্ন বিদ্রূপের ভাষায় গালিগালাজ করেছেন। ওহাবি আলেম-উলামাদের জ্ঞানা নেই যে আল্লাহ পাক জিন এবং মানুষের নিকটেই জ্ঞাতরূপে অবস্থান করেন।

আল্লাহর এই জ্ঞাতরূপটি যখন কোনো ওলি নির্জনে বছরের পর বছর ধ্যানসাধনা করে উদ্ভাসিত করেন, তথা আল্লাহর জ্ঞাত নুর নিজের ভিতরে প্রকাশিত হয়ে পড়ে, তখন জুনুন মিসরির কাছে চাওয়া আর আল্লাহর কাছে চাওয়া একই কথা। মাওলানা জালাল উদ্দিন রুমি তাই বলে গেছেন যে, আল্লাহর কার্যকলাপ আল্লাহ নিজেই করে যাচ্ছেন, কিন্তু মনে হয় মানুষই করছে।

যারা রূহকে নুরানি মাখলুক বলে তথা নুরময় সৃষ্টি বলে জ্ঞানতে চায়, বুঝতে চায় তারা এই ওলিদের রহস্যের বিন্দুবিসর্গও জ্ঞানতে পারে না এবং বুঝতে পারে না। কারণ রূহ সৃষ্টি নয় তথা মাখলুক নয়। এদেরকে হাজার দলিল-প্রমাণ দিয়ে বুঝিয়ে দিলেও বুঝতে পারে না। যেমন- হাজার দলিল দিয়েও একটি শিয়া ফেরকার মুসলমানকে সুন্নি ফেরকায় নিয়ে আসা যায় না। ইহাই হলো জন্মই আমার আজন্ম তকদির। সুতরাং এই তকদির নিয়ে যারা জন্মগ্রহণ করেছেন তাদেরই বা কী দোষ দেব?

বিখ্যাত নোবেল বিজয়ী লেখক জর্জ বার্নার্ড শ একটি কথা বার বার বুঝিয়ে দিয়ে গেছেন এই বলে যে, ‘যাদের আল্লাহ আকাশে থাকে তাদের থেকে দূরে থাকতে চেষ্টা ক’রো, কারণ এরা নিষ্ঠুর এবং ভয়ঙ্কর। এরা যে কোনো নিষ্ঠুর কাজ করতে দ্বিধা বোধ করবে না।’

রুহকে সৃষ্টির মধ্যে এনে পাঁচ ভাগ করে ফেলে। যেমন : (১) রুহে জাম্বাদি, (২) রুহে নাবাতি, (৩) রুহে হায়ওয়ানি, (৪) রুহে ইনসানি, (৫) রুহে বাতেনি। রুহ কী করে এবং কেমন করে পশুর মাঝে অবস্থান করে ইহা আমার জ্ঞানা নাই এবং কোরান-এর একটি আয়াতেও রুহে হায়ওয়ানি তথা জানোয়ারের রুহ বলে উল্লেখ করা হয় নাই। আসলে রুহ এক, অনাদি, নিত্য, অসীম। রুহের কোনো ভাগ হয় না এবং ভাগ করা যায় না। যেমন রক্তের শ্বেত কণিকাকে তথা হোয়াইট ব্লাড সেলকে ভাগ করা যায় না। অথচ রক্তের লৌহকণিকা তথা রেড ব্লাড সেলকে অনেক রকম ভাগ করা যায় এবং এই ভাগের মধ্য দিয়েই রোগটি ধরা পড়ে। নফস তথা প্রাণকে নফস বলাই ভালো। নফসের কয়েকটি ভাগ করা যায়, যেমন নফসে আঙ্গারা, নফসে লাউয়াম্মা, নফসে মোতমায়েল্লা, নফসে মুলহেম্মার এবং নফসে ওয়াহেদাতান। অথচ কোনো অবস্থাতেই রুহ তথা পরমাত্মাকে ভাগ করা যায় না। রুহের এই রকম

পাঁচ প্রকার ভাগগুলো দেখলে অবাক হতে হয়। ফেরেশতা জিবরিলের আরেকটি নাম হলো রুহুল আমিন। ফেরেশতাদেরকে নফস ও রুহ তথা জীবাত্মা ও পরমাত্মার একটিও দেওয়া হয় নি। ফেরেশতারা—অনেকটা বোঝাতে গিয়ে রূপক ভাষায় বলতে হচ্ছে যে—ফেরেশতারা হলো নফস এবং রুহ ছাড়া এক ধরনের রোবট। রোবট এই জন্য বললাম যে, এরা মানুষের রূপ ধরতে পারে। কিন্তু যতই মানুষের আকৃতি ধারণ করুক না কেন, রুহের রহস্য সবার পক্ষে বোঝালেও বোঝা সম্ভবপর নয়। রুহের রহস্য ধ্যানসাধনার মাধ্যমে পরিচয় হয়। এই রুহের পরিচয়টি আকাশেও পাওয়া যায় না, মাটিতেও পাওয়া যায় না। এই যদি ইসলাম গবেষণার মারভেলাস ফসল হয় তা হলে এদের জ্ঞানের বহরও মারভেলাস। এবং মারভেলাসভাবে সাধারণ মুসলমানদেরকে ঠকানো হচ্ছে। এমনকি কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিশেষ মুসলমানেরাও আসল মনে করে ইমিটেশন খরিদ করছে।

ইমাম গাজ্জালির এহিয়ায়ে উলুমউদ্দিন বইটি বাংলায় অনুবাদ করা হয়েছে। অনুবাদক গোলাবি ওহাবি হওয়ার দরুন অনেক কথার অনুবাদ করে নি। সরল পাঠকের পক্ষে এই বিকৃত, মনগড়া এবং বানোয়াট অনুবাদটি ধরবার সম্ভাবনা থাকে না। এই অনুবাদগুলোকে বলা যেতে পারে এহিয়ায়ে কলুমউদ্দিন, এহিয়ায়ে ছলিমউদ্দিন ইত্যাদি।

বিজ্ঞানী নিউটনের একটি সূত্র হলো : প্রতিটি কাজের সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া আছে। আজাজিল ফেরেশতাদের ইমাম তথা সরদার ছিলেন। এই জন্য আজাজিলকে ইমামে মালাইকা বলা হতো। আল্লাহর একটিমাত্র আদেশ, আদমকে সেজদা করার হুকুমটি, অমান্য করে বলে ফেললো যে আজাজিল আদম হইতে উত্তম। আল্লাহর আদেশ অমান্য করার শাস্তি আল্লাহ নিজেই দিলেন এবং চারটি নাম দেওয়া হলো। আজাজিলের প্রথম নামটি হলো ইবলিস তথা অহঙ্কারী, তারপর শয়তান তথা যতো আকাম-কুকামের নেতা, তারপর মরদুদ, তারপর খান্নাস। শয়তানের কাজটি হলো আদম সন্তানদেরকে বিপথে নিয়ে যাওয়া এবং জাহান্নামের পথ দেখিয়ে দেওয়া।

শয়তানের ঘোঁকায পড়ে আদম সন্তানেরা হরহামেশা প্রভাবিত হচ্ছে, বিভ্রান্ত হচ্ছে। কিন্তু একটি বিরাট প্রশ্ন থেকে যায়, আর সেই প্রশ্নটি হলো যে, শয়তানের আগে তো কোনো শয়তানই ছিলো না, তাহা হইলে আজাজিলকে কে শিখিয়ে দিলো যে সে আদম হইতে উত্তম? এই প্রশ্নের উত্তরটি ইচ্ছা করেই এড়িয়ে গেলাম। কেননা যা কিছুই আল্লাহ করেছেন তার মূল উদ্দেশ্যটি হলো আদম সন্তানদেরকে পরীক্ষা করা। তাই আমরা দেখতে পাই যে আল্লাহ এক নিম্নেষেই পৃথিবীর সব মানুষকে এক উন্নতে পরিণত করতে পারতেন, কিন্তু এটাই যদি করা হতো তা হলে পরীক্ষা নামক শব্দটির আর এক পয়সাও মূল্য থাকে না।

হজরত আবু হুরায়রা (রা.) যতোগুলো হাদিস প্রকাশিত করেছেন তার চেয়ে গোপন রাখার রহস্যময় হাদিসগুলো মোটেই কম ছিলো না। হজরত ইবনে আব্বাস (রা.), হজরত আবু জর গিফারি (রা.) এবং হজরত হজ্জায়ফা (রা.)-এর বেলায়ও একই কথা কমবেশি খাটে। তাই দেখা যায়, পৃথিবীর বিখ্যাত ওলি-আল্লাহদের লিখনির রহস্য বুঝতে না পেরে যা-তা গালাগালি করে। ওহাবি আলেম-উলামারা নিজেদের মন মতো মাপতে চায় এবং মাপতে গেলেই বিরাট বিরাট ভুল করে বসে, অথচ দোষটি চাপিয়ে দেয় আল্লাহর ওলিদের উপর। তাই গাউসুল আজম, ইবনুল আরাবি, আহমদ রেফাই, জালাল উদ্দিন রুমি এবং ইমাম গাজ্জালিকে ‘খামসায়ে কাফেরে আকবর’ তথা পাঁচ শ্রেষ্ঠ কাফের বলে ফতোয়া দিয়েছে।

বোড়া সাপ বেদের বীণের সুরে নাচতে পারে না, তাই জ্ঞাতি সাপদের নাচানাচিটা দেখে বোড়া সাপেরা হি হি করে হাসে আর ‘ভণ্ডামি করছে’ বলে অপবাদ দেয়। আমরা বোড়া সাপেরও দোষ দেখতে পাচ্ছি না, কারণ বোড়া সাপের তকদিরে নৃত্য করার কথাটি লিখা নাই। সুতরাং জ্ঞাতি সাপের নৃত্য দেখে অবাক হবারই তো কথা। তা হলে চরম পর্যায়ে গিয়ে দেখতে পাওয়া যায় যে, আল্লাহ পাকের সৃষ্টিতে কোথাও বিদ্রুমান ভুল নাই। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সৃষ্টিরাজ্যের রহস্য দেখতে গিয়ে ভুল পাওয়া তো দূরের কথা, বরং চোখ বিস্ফারিত হয়ে নিজের কাছেই ফেরত আসে।

মানুষ যখন বুঝতে পারে যে, ছয় হাজার আলোকবর্ষ দূরে অবস্থান করা নিউট্রন তারকাটির এক চায়ের টামচ বস্তু পৃথিবীতে এনে মাপতে গেলে ওজনটি দাঁড়ায়

একশত কোটি টন। বিজ্ঞানীরা খতমত খেয়ে যায়। বিজ্ঞানীরা চিৎকার দিয়ে বলতে চায় : আল্লাহ পাক, তোমার সৃষ্টিতে বিহুমান্ন ভুল পাওয়া তো দুর্ব্বের কথা, বরং চোখ, জ্ঞান বিস্ফারিত হয়ে নিজেদের কাছেই ফেরত আসে। কোরান-এর সূরা মুলক-টি পড়ে দেখুন তো, অধম লিখকের এই কথাগুলো কতোটা সত্যতা বহন করে!

অথচ এই নিউট্রন তারার ভেতরে যা কিছু আছে এবং যত শক্তিশালী হোক না কেন এবং যত অদ্ভুত এবং বিস্ময়করই হোক না কেন, সবই কিন্তু আল্লাহর সেফাত মাত্র অথবা সেফাতের সেফাত এভাবে অনেক বিবর্তনের কর্মফল মাত্র। এই বিজ্ঞানের আবিষ্কারগুলো আমাদের চমকায়, আমাদেরকে অবাক করে, আমাদেরকে বিস্ময়ে অভিভূত করে। কিন্তু এই বিজ্ঞানের সম্ভবত কোনোই ক্ষমতা নেই আল্লাহকে দর্শন দেবার জন্য। কারণ যদিও সেফাতগুলো আল্লাহ পাক হতেই আগত, কিন্তু সেফাত জাত নয়। আল্লাহর জ্ঞাতরূপটি মানুষের ভেতরেই রুহরূপে অতি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মরূপে বিরাজ করছে।

এই বীজরূপ রুহকে যিনি বা যাঁরা যতটুকু জাগিয়ে তুলতে পেরেছেন প্রকারভেদে তাঁরা সে রকমই গুলি। যদিও একই আলো অনেক মোমবাতিতে শোভা পাচ্ছে, কিন্তু মোমবাতির আয়তন যত বড় হবে আলোও তত বেশি দেখা যাবে। আলো বেশি দেখা যাওয়া এবং কম দেখা যাওয়ার মধ্যে বাহিরের পার্থক্য থাকতে পারে, কিন্তু একটু লক্ষ করলেই বুঝতে পারা যায় যে, একই আলো বড় এবং ছোট মোমবাতিতে অবস্থান করছে। সুতরাং আল্লাহর সমগ্র সৃষ্টিরাজ্যের মধ্যে কেবলমাত্র জিন এবং মানুষের সঙ্গেই আল্লাহর জ্ঞাতরূপে অবস্থান

করার কথাটি কোরান-এ অন্যভাবেও বলা হয়েছে, যেমন : ‘আমরা তোমাদের শাহারগের (তথা জীবনরগের) নিকটেই আছি।’ একটু লক্ষ করে দেখুন তো, কোনো জীবজন্তু, কোনো নদী-নালা-সাগর, কোনো পাহাড়-পর্বত, কোনো গ্রহ-নক্ষত্র- কোথাও ‘তোমাদের শাহারগের নিকটেই আছি’ বলে একটি বারও কোরান-এ বলা হয় নি।

ছয় হাজার আলোকবর্ষ দূরে অবস্থান করা নিউট্রন তারাটির এক চায়ের চামচ উপাদান পৃথিবী গ্রহে মাপতে গেলে ওজন হয় একশত কোটি টন। এক চামচ উপাদানের ওজন একশত কোটি টন! কে না অবাক হবে? কে না বিস্ময় প্রকাশ করবে? কিন্তু এই অবাক বিস্ময় আল্লাহর অবস্থানটির কথা জানিয়ে দিতে পারবে, কিন্তু নিজের ভেতরেই যে আল্লাহ রূহরূপে বিরাজ করছে এবং পনেরটি বছর নির্জনে ধ্যানসাধনার মাধ্যমে যে আল্লাহর পরিচয় জানা যাবে, ইহা মহানবি আমাদেরকে চোখে আঙুল দিয়ে বুঝিয়ে দিয়ে গেলেন এবং বুঝিয়ে দিয়ে গেলেন যে, তোমরাও আমার মতো পনের বছর যদি ধ্যানসাধনায় মগ্ন হতে পারো তো আল্লাহর জ্ঞাতরূপ তোমারই মাঝে প্রকাশিত হয়ে পড়বে। সত্যি বলতে কি এই জ্ঞাতরূপটি যখন সাধকের মধ্যে প্রকাশিত এবং বিকশিত হয়ে ওঠে সেই বিকশিত রূপটির নাম রূহল আমিন। যদিও জিবরাইল নামক

ফেরেশতার নামও রুহুল আমিন। আমরা সবাই একটু লক্ষ করলেই জানতে পারি যে কোনো ফেরেশতাকেই, এমনকি সে যত বড় ফেরেশতাই হোক না কেন, সেই ফেরেশতাকে নফসও দেওয়া হয় নি, রুহও দেওয়া হয় নি। এক কথায় সমস্ত ফেরেশতারা হলো নফস-ও রুহ-বর্জিত ফেরেশতা।

নফস ও রুহের অবস্থান যেহেতু জিন ও মানুষের মধ্যে, তাই জিন ও মানুষের মাঝেই ভালো এবং মন্দ উভয়টাই দেখতে পাই। ফেরেশতাদের মাঝে নফসও নাই রুহও নাই, সুতরাং ভালো-মন্দ বিচার করার ক্ষমতাও নাই—যদিও আল্লাহর শেখানো কিছু কথা, কিছু প্রশ্ন, কিছু জিজ্ঞাসা আমরা দেখতে পাই। আসলে আল্লাহর সমস্ত ফেরেশতারা হলো আল্লাহর রহমতের চাবি দেওয়া রহমতের রোবট (?)।

এই প্রভেদটুকু যদি কোনো ধর্ম-গবেষক, যদি কোনো পীর-ফকির, যদি কোনো আলেম-উলামা বুঝতে না পারে তা হলে তাদেরই বা কী দোষ দেব? কারণ সব খেলাই যে তকদিরের খেলা।

অনেক সময় কিছুটা গালাগালি মনের অজান্তে যে করি না তা নয়। কিন্তু চরম পর্যায়ে আর কোনো গালি থাকে না। তাই বড় বড় আল্লাহর ওলিদের কথায় আমরা দেখতে পাই যে, মহাপাপীকেও গালি না দিয়ে আল্লাহর হাতে ছেড়ে দেবার কথাটি বলেছেন।

আল্লাহর পূর্ণ পরিচয় যখন কোনো সাধক আপনার ভেতর দেখতে পান তখন আপন নফসটি এমনভাবে

হারিয়ে যায় যে খুঁজতেও কষ্ট হয়। আগ্নের তাপে কালো লোহা গরম হতে হতে যখন জলের মতো তরল হয় তখন কালো লোহাকে আর খুঁজে পাওয়া যায় না, কেবল তরল আগ্নই দেখতে পাওয়া যায়। তখনই মনসুর হাল্লাজ বলে ফেলেন : ‘আনাল হক’, তখনই জুনায়েদ বোগদাদি বলে ফেলেন : ‘লাইসা ফি জুব্বাতি সৈওয়া আল্লাহ তায়ালা’, তখনই সুলতানুল হিন্দ হাজা হাবিবুল্লাহ মাতা ফি হব্বুল্লাহ শাহীনশাহে ওলি আফতাবে ওলি হিন্দাল ওলি আতায়ে রসুল সৈয়দ মাওলানা মঈনুদ্দীন হাসান সানজারি বলে ফেলেন : ‘ইম্মানাম ইয়ারাম কি আনদার নুরে হক ফানি সুদাম, মাতলায়ে আনোয়ারে জাতে সুবহানি সুদাম’, তখনই খাজা উসমান হারুনি, যিনি খাজা বাবার পর, তিনি বলে ফেলেন : ‘তু জুমলা ফানা গাসতে বতু হে চনা মুনদাহ খাহে কে অনিলাহে বণ্ড খাহে কে ইয়াল্লাই।’ ইমামুল আউলিয়া বায়েজিদ বোস্তামি ধ্যানসাধনার মাধ্যমে মোকামে জাবরুতের শেষ সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে আল্লাহকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন : ‘আল্লাহ আমি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট।’ উত্তরে আল্লাহ বললেন : ‘প্রকৃত সন্তুষ্টির বাক্যটি অন্যরকম। সুতরাং আরও কিছু দিন ধ্যানসাধনা করো, তা হলেই আসল সন্তুষ্টির বাক্যটি তোমার মুখে শোভা পাবে।’ ইমামুল আউলিয়া বায়েজিদ বোস্তামি আবার কঠোর ধ্যানসাধনায় নিমগ্ন হলেন। সাধনার একটি চরম পর্যায়ে এসে ইমামুল আউলিয়া বায়েজিদ বোস্তামি বলে ফেললেন : ‘অনি সুবহানি’ তথা আমিই সুবহানি, ‘মা আজিমুশ শানি’ তথা সব শান আমারই। আজ হতে প্রায় আনিমানিক সাড়ে পাঁচ হাজার বছর আগে জন্মদগ্নি মূনি বলে ফেললেন : ‘সোহহম সোহমি’— তিনিই আমি। ভগবান শ্রী শ্রী চৈতন্যদেব সাধনার এক পর্যায়ে বলে ফেললেন : ‘তুই মূই, মূই তুই।’

যেহেতু এই অতি উচ্চ স্তরের কথাগুলো সাধারণের পক্ষে বোঝাটা কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায় তাই না বুঝে কিছু একটা বলে ফেললে তাকেই বা কী দোষ দেব?

শয়তানের পরিচয়

বিজ্ঞানীরা, ধরে নিলাম, সৌরজগতের অন্য কোনো গ্রহ অথবা উপগ্রহকে মানুষের বসবাসের উপযোগী করে তুলতে পারলো এবং একদল মানুষকে সেখানে বসবাসের জিন্য নিয়ে যাওয়া হলো। বিজ্ঞানীদেরকে যার-পর-নাই অশেষ ধন্যবাদ আর ধন্যবাদ। কিন্তু বিজ্ঞানীদেরকে মাত্র একটি কথাই বলতে চাই আর সেই কথাটি হলো : সেই গ্রহে অবস্থানকারী মানুষেরা যখন মারামারি, ঝগড়াঝাটি, ঘৃণা, অবজ্ঞাপ্রদর্শন করবে; এমনকি হিটলার, চেঙ্গিস খাঁ, হালাকু খাঁ, কুবলাই খাঁ, তৈমুর লঙ, ইসলামের হিটলার হাজ্জাজ্জ এদের এই হিংস্র আচরণগুলোকে কেমন করে, কী ঔষধ প্রয়োগ করে থামাতে পারবেন? একটি রাগান্বিত ভাষায় বলছি, সকল বিজ্ঞানীর বাপের পক্ষেও ইঁহা মোটেই সম্ভবপর নয়। বিজ্ঞানীরা যদি গবেষণায় লেগে যায় তার ফলটি হবে একটি বিরাট অশ্বভিষ্ম অথবা কাঁচকলা অথবা মানকচু। যদি বিজ্ঞানীদের বিবেক থাকে— এবং আছে বলেই বিশ্বাস করি— তা হলে বিজ্ঞানীরা বলে ফেলবে, বিশেষ করে এই বিষয়ের গবেষণা করে যে, ‘আমরা বালেশ্বর বাল হরিদাস পাল।’ ভাষা এবং শব্দগুলো রুঢ়, কিন্তু বলতে বাধ্য হলাম। কারণ মানুষ যেখানেই যাক নী কেন সেখানেই মানুষের সঙ্গে খান্নাসরূপী শয়তানটি মানুষের ভেতরেই অবস্থান করছে। সুতরাং খান্নাসরূপী শয়তানের আকাম-কুকামগুলো আশী করি আর বলে দিতে হবে না। তা হলে এই মানুষের ভেতর অবস্থান করা খান্নাসরূপী শয়তানটিকে কেমন করে তাড়িয়ে দেওয়া যায়? উত্তরটি হলো : আল্লাহর ওলির ভক্ত হও এবং ধ্যান সাধনার মোরাকাবাটি বছরের পর বছর করে যাও।

এক মিনিটে গাড়িবোমা ফাটিয়ে আত্মাহুতি দেওয়া যায়, কিন্তু যে আত্মাহুতি দিচ্ছে তাকে যদি বলা হয় যে, এই নির্জন গুহায় অথবা এই নির্জন স্থানে একটি ঘরে বসে দিনরাত ধ্যানসাধনা চালিয়ে যাও তা হলে ওই

আত্মাহুতি দেওয়া মানুষটি এই ধ্যানসাধনাটি করে কিনা সন্দেহ আছে। যারা বুঝবার তারা এই বাক্য কয়টিতেই পরিষ্কার বুঝতে পারবেন।

আমাদের অবশ্যই ভালো করে জেনে রাখতে হবে যে, আল্লাহর দুইটি সেফাতের মধ্যে শয়তান খান্নাসরূপে বিরাজ করে। আল্লাহর সৃষ্টিরাজ্যের আর কোনো সেফাতের মধ্যেই খান্নাসরূপী শয়তানকে থাকার অনুমতি আল্লাহ দেন নাই।

সমগ্র সৃষ্টিরাজ্য তৌহিদে বাস করে। তৌহিদে শয়তানের থাকার অধিকারটি দেওয়া হয় নাই। তাই তৌহিদে বাস যারা করে তারাই মুসলমান। সুতরাং মানুষের অন্তরে এবং জিনের অন্তরে যে খান্নাসরূপী শয়তানটি অবস্থান করছে এই বিষয়টি আমরা হাদিসে অন্য ভাষায় দেখতে পাই। আমরা দেখতে পাই হাদিসে মহানবি বলছেন যে, মানুষের অন্তরে একটি গোশ্বতের টুকরা আছে। সেই গোশ্বতের টুকরাটি যখন পাকপবিত্র হয়ে যায় তখন পা থেকে মাথা পর্যন্ত সমস্ত দেহটাই পবিত্র হয়ে যায় এবং অপরপক্ষে ঐ গোশ্বতের টুকরাটি যদি অপবিত্র হয় তবে পা থেকে মাথা পর্যন্ত সমস্ত দেহটিও অপবিত্র হয়ে যায়। (হবহ উদ্ধৃত নয়)। মানুষকে অপবিত্রতার পচা ডোবায় গোসল করায় এই খান্নাসরূপী শয়তান। ইহা চর্মচর্কে সাধারণ মানুষ দেখতে পায় না এবং দেখার বিধানটি রাখা হয় নাই। যদি চর্মচর্কে দেখার বিধানটি রাখা হতো তা হলে ‘আমি

তোমাদেরকে পরীক্ষার জন্য দুনিয়াতে পাঠিয়েছি’- এই বাক্যটির আর মূল্য থাকে না।

আল্লাহ পাক শয়তানের সাতটি রূপ দিয়েছেন : তিনটি জাহেরি তথা শরিয়তি তথা মেজাজি রূপ এবং চারটি হাকিকি তথা আসল রূপ। শরিয়তি তথা মেজাজি শয়তানের তিনটি রূপ মাত্র একটি নগরীর একটি নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থান করে। শয়তান তিনটির নাম হলো : বড় শয়তান, মেঝা শয়তান এবং ছোট শয়তান। মেজাজি হাজিরা মেজাজি হজের এক পর্যায়ে মেজাজি শয়তানদেরকে মেজাজি পাথরের কঙ্কর ঝুড়ে মারেন। এই মেজাজি কঙ্কর ঝুড়ে মারার প্রশ্নে অনেক মেজাজি হাজি পায়ের তলায় পিষ্ট হয়ে কন্মবেশি প্রতি বছর মারা যান। আর হাকিকি শয়তান হলো চারটি। এই একের ভেতরে চারটি রূপের শয়তান মাত্র দুইটি স্থানে বাস করে। এই কথাটি অনেকবার বলা হয়েছে। সেই স্থান দুইটির নাম হলো : একটি জিনের অন্তর এবং অপরটি মানুষের অন্তর। এই জিনের অন্তর এবং মানুষের অন্তরে অবস্থান করা শয়তানটিকে যারা বাহিরে খুঁজতে চেষ্টা করে তাদেরই বা কী দোষ দেব?

গুনেছি - জানি না ইহা কতটুকু সত্য যে, আজাজিলের বাবার নাম ছিল গাণ্ডিব। আজাজিলেরা দুই ভাই। বড় ভাইয়ের নাম আবুল, ছোট ভাইয়ের নাম আজাজিল। তাই আজাজিলের বাবাকে আবুল গাণ্ডিবও বলা হয়। এই আবুল গাণ্ডিবের ছেলে, ফেরেশতাদের ইমাম, আজাজিল যখন আদমের বশ্যতা স্বীকার করতে অস্বীকার করলো তথা মেজাজি ভাষায় সেজদা দিতে অস্বীকার করলো তখনই আজাজিল ইবলিসে পরিণত হলো। বালাসা অর্থ হলো অহঙ্কার। এই বালাসা শব্দটি আরবি নয়, বরং হিব্রু। শয়তানের আদি নাম ইবলিস।

এই ইবলিস প্রতিটি মানুষের অন্তরে অবস্থান করে। তাই রূপক ভাষায় বলা যেতে পারে যে, এই ইবলিসকে মুসলমান বানিয়ে ফেল।

আল্লাহর আবদুহদের সাথে আল্লাহ ইচ্ছা করেই ইবলিসকে দেন নাই। তাই আবদালদের কোনো এবাদত-বন্দেগি, ধ্যানসাধনা, মোরাকাবা-মোশাহেদা করার কথাটি পাই না। যদিও কিছু কিছু আরবি ভাষা জানা পণ্ডিতেরা আবদাল ওয়ায়েস করনিরও- তাঁর জীবনী লিখতে গিয়ে- এবাদত-বন্দেগির কথা লিখে ফেলেছেন। আরবি ভাষার পণ্ডিতেরা আবদালদেরকে নিজের মতো করে ভেবেছে তাই ভুলটি করা হয়েছে। এই রকম পদে পদে হোঁচট খাওয়া কতো মারাত্মক ভুলে সাধারণ মানুষদেরকে সঠিক পথ পাবার পথে বার বার হোঁচট খেতে হয়।

ওলি-আল্লাহর জেহাদ

‘আবদাল’ একটি বিশেষ আধ্যাত্মিক মর্যাদা। হজরত আবু দারদা (রা.) বলেন : নামাজ-রোজা বা তসবিহ-এর আধিক্যে কেহই তাদের উপর মর্যাদা লাভ করতে পারবে না।

আবদালরাও জিন এবং ফেরেশতাদের মতো নিজেদের আকৃতি পরিবর্তন করতে পারেন। এই আবদালেরা আল্লাহর কাছে বৃষ্টি চাইলে বৃষ্টি বর্ষিত হয়।

আবদালদের উসিলায় দুশমনদের বিরুদ্ধে সাহায্য পাওয়া যায়।

আবদালদের কাছে বৃষ্টি এবং আরও কিছু চাওয়া এবং আল্লাহর ওলিদের কাছে কিছু চাওয়াটা হালকা-পাতলা দৃষ্টিতে মনে হবে যে আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাদের কাছে চাওয়া হচ্ছে। মনে হতে পারে অনেকেরই কাছে যে এই রকম চাওয়াটা শেরেক। কিন্তু আসলে তা নয়। কারণ আবদাল এবং ওলি তাঁরাই, যাঁদের নফসের উপর আল্লাহ রহরূপে সম্পূর্ণ জাগ্রত অবস্থায় অবস্থান করেন।

আল্লাহ তথা পরমাত্মার সংজ্ঞাটির অর্থ এবং রহস্য না জানার দরুনই অনেক রকম উল্টাপাল্টা চিন্তা করাটা স্বাভাবিক। আগেই বলেছি যে মানুষ এবং জিনের সঙ্গেই রহ তথা পরমাত্মা তথা আল্লাহ অবস্থান করেন। সেই পরমাত্মা যখন কোনো ওলি এবং আবদালের জীবাত্মার উপর আপন মহিমায় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠেন, তখন তাঁদের কাছে চাওয়া আর আল্লাহর কাছে চাওয়া একই কথা। আল্লাহর ওলিরা নফল এবাদত করতে করতে আল্লাহর এত নিকটে এসে পড়ে যে, তখন সেই ওলির জিস্বা দিয়ে আল্লাহই কথা বলেন, ওলির চোখ দিয়ে আল্লাহই দেখেন, ওলির কান দিয়ে আল্লাহই শোনে। সুতরাং ওলির কাছে চাওয়া আর আল্লাহর কাছে চাওয়া একই কথা।

ওলি যদিও মানুষ, কিন্তু সাধারণ মানুষ নন। কারণ

ওলির জীবিত্ব

উপর পরমাত্মা तथा আল্লাহ আপন মহিমায় উদ্ভাসিত হয়ে আছেন। ইহা দেখাবার বিষয় নয়। প্রদর্শনের বিধানটি এখানে রাখা হয় নাই। কারণ সবাই যদি আল্লাহর ওলিদের এই রহস্য বুঝতে পারে তা হলে আল্লাহর পরীক্ষাটি আর থাকে না। বৈচিত্র্যের ক্ষুদ্র এবং বৃহৎ প্রতিটি বিষয়ের অভ্যন্তরে একেরই লীলাখেলা চলছে। এই লীলাখেলা কোথাও জ্ঞাতরূপে, কোথাও সেকাতরূপে, কোথাও সেকাতের সেকাতরূপে খেলে চলেছেন। সুতরাং চরম পর্যায়ে আর কোনো গালি থাকে না, যদিও বুঝতে গিয়ে অনেক সময় অনিচ্ছায় গালি দিতে হয়।

স্বর্ণের বিভিন্ন অলঙ্কার যেমন কানের দুল, নাকফুল, মাথার টিকলি, গলার হার, হাতের বালি ও চুড়ি এবং আংটি, কোমরের বিছা, অনেক নামে অনেক পুণের পরিচয় বহন করছে। সবগুলো একত্র করে গলিয়ে দেখুন তো! একটি স্বর্ণের পিণ্ড হয়ে যাবে। মূলে একই স্বর্ণ, অলঙ্কারের শৈল্পিক শৈলীতে বিভিন্নতার প্রকাশ দেখতে পাই। এই বিভিন্নতা প্রকাশের শৈলী একেরই গুণগান গাইছে। দৃষ্টির বিভিন্নতায় দর্শনের বিভিন্নতা অবধারিত। এই বিভিন্নতার মাঝে যদি একেরই লীলাখেলা কেউ বুঝতে না পারে তবে তাকেই বা কী দোষ দেব?

এক বৃদ্ধ হাজার মাস জেহাদ করে গেছেন। এই জেহাদটি যদি তলোয়ারের আঘাত দেওয়া জেহাদ হয়ে থাকে তা হলে প্রতিঘাত আসাটা স্বাভাবিক। অস্ত্রের জেহাদটি এখানে রূপক। রূপকতার আশ্রয় নিয়ে

বোঝানো হয়েছে যে পবিত্র নফসের সঙ্গে খান্নাসরূপী শয়তানকে যে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে সেই খান্নাসরূপী শয়তানকে বের করে দিতে সেই বৃদ্ধের এক হাজার মাস সময় লেগেছে। এটাই জেহাদ। এটাই জেহাদে আকবর। এটাই জেহাদে কবির। এটাই খাঁটি জেহাদ। কারণ এই জেহাদ খান্নাসরূপী শয়তানকে তাড়িয়ে আল্লাহকে পাওয়ার পথে আল্লাহর জন্য জেহাদ, যাকে আরবি ভাষায় ‘ফি সাবিলিল্লাহ’ বলা হয়।

এই জেহাদে যারা জয়ী তাঁদের আর মৃত্যু নাই। তাঁরা দুনিয়ার লোভ-মোহের মাযার বন্ধন ছিন্ন করে আল্লাহতে আত্মসমর্পণ করেছেন। এইরূপ জেহাদিদের কবরকে কবর না বলে মাজার অথবা রওজা বলা হয়। এবং এদেরকে গোপনে আল্লাহ রেজেক দান করছেন (‘বাল এনদা রাবিহিম এয়ার জাকুম’)^১। ইমাম গাজ্জালি তার অমর গ্রন্থ এহিয়ায়ে উলুমউদ্দিন-এ যে কন্যাদায়গ্রন্থ পিতাকে হজরত বাবা জুনুন মিসরির মাজারে সাহায্য চাইতে বলেছিলেন—ওটা ইকিকতে আল্লাহর কাছেই সাহায্য চাওয়া। কেউ বোঝে, কেউ বোঝে না। যে বোঝে সে কোনোদিন শেরেক বলবে না, আর যে বোঝে না সে ‘শেরেক, শেরেক’ বলে চিৎকার দিতে থাকবে।

দ্বান্দ্বিক দর্শনের ঝঙ্কার আর নৃত্য প্রতিটি পদক্ষেপে দেখতে পাই। কেউ দেখতে পায়, কেউ দেখতে পায় না।

ধরুন, একজন জেহাদ করার দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে গাড়িবোমায় নিজেকে আত্মাহুতি দিলো। নিম্নেষে প্রাণটি চলে গেল। কিন্তু একটাবার ভেবে দেখুন তো, যে মানুষটি গাড়িবোমা ফাটিয়ে নিম্নেষে আত্মাহুতি দিলো সেই মানুষটিকেই আত্মাহুতি দেবার আগে যদি বলা হয় যে জাবালুন নুর পর্বতের হেরাপ্তহায় নির্জনে একাকী ধ্যানমগ্ন হইও অথবা নির্জন একটা স্থানে একটি ঘর বানিয়ে পনেরোটি বছর ধ্যানসাধনা তথা মোরাকাবা-

মোশাহেদা করে যাও : আত্মাহুতি দেবার অভিপ্রায়ে যিনি দুঃখায়মান তিনি এই রকম নির্জনে একাকী পনেরটি বছর মোরাকাবা-মোশাহেদার পথে এগিয়ে যায় কি না বিরাট সন্দেহ থেকে যায়।

মুহুর্তে জীবন চলে যাওয়া আর তিলে তিলে বছরের পর বছর একাকী বোবার মতো নির্জন ধ্যানসাধনাটি করার মাঝে আকাশ-পাতাল পার্থক্য দেখতে পাই। নিম্নেষের আত্মাহুতিতে চিৎকার থাকে না, কিন্তু তিলে তিলে নির্জন একটি ঘরে অথবা পর্বত গুহায় বছরের পর বছর ধ্যানসাধনার মাঝে থাকে দুঃসহ জ্বালা-যন্ত্রণা, আক্ষেপ-উৎকর্ষা আর পরমাত্মার সঙ্গে মহামিলনের অদম্য আকাঙ্ক্ষা। কেউ বোঝে, কেউ বোঝে না। এই বোঝা এবং না বোঝার খেলাটি যদি না থাকতো তা হলে বৈচিত্র্যের এত লীলাখেলাও থাকতো না।

আল্লাহর আরেক নাম জুলজালাল, তথা নব নব রূপে প্রকাশ-বিকাশ এবং বহু রঙ-রূপ দেখিয়ে অবিরাম ছুটে চলছেন। একবার যে রূপটি আল্লাহ দেখান, সেই রূপটি আর কোনো দিন কোনো কালেও দেখানো হয় না। তাই তো আল্লাহর আরেক নাম জুলজালাল।

ইতিহাস বলে, পবিত্র যুদ্ধের নাম দিয়ে যুগে যুগে অনেক মানুষ হত্যা করা হয়েছে। যে যুদ্ধ ফি সাবিলিল্লাহ তথা আল্লাহর পথে হয় সেই যুদ্ধটিকে বলা হয় জেহাদে সগির তথা ছোট জেহাদ। আর যে যুদ্ধটি নিজের নফসের ভিতরে লুকিয়ে থাকা খান্নাসরূপী শয়তানের বিরুদ্ধে উহাকেই বলা হয় জেহাদে আকবর তথা শ্রেষ্ঠ জেহাদ। ইতিহাস হতে আমরা জানতে পারি যে, তবুকের যুদ্ধে জয়লাভ করার পর মহানবি সাহাবাদেরকে বললেন : এইবার তোমরা আপন আপন নফসের বিরুদ্ধে জেহাদ করার জন্য তৈরি হও। তবুকের যুদ্ধে জয়লাভ করাটি ছিল জেহাদে সগির আর নফসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাটি হলো জেহাদে আকবর।

জেহাদ জেহাদই। জেহাদের মধ্যে পবিত্র শব্দটি অচল। কোরান-এর কোথাও পবিত্র জেহাদ বলা হয় নি। যেমন কোরান-কে কোরান-এর কোথাও পবিত্র কোরান বলা

হয় নি, তবুও আমরা মনের অজান্তে পবিত্র কোরান বলে ফেলি। অনেকটা পানি খাও, চা খাও, সিগারেট খাও ইত্যাদির মতো। কারণ পানি পান করা যায়, চা পান করা যায় এবং ধূমপান করা যায়। কোরান-কে কিন্তু কোরান-এ চারটি নামে (অবশ্য আমাদের জ্ঞান মতে) ডাকা হয়েছে তথা চারটি নাম দেওয়া হয়েছে, যেমন : কোরানুল করিম, কোরানুল মজিদ, কোরানুল হাকিম ও কোরানুল মবিন। আমরা এই চারটি নাম দেওয়া সত্ত্বেও পবিত্র কোরান তথা হোলি কোরান বলে থাকি।

পবিত্র কোরান বলার মাঝেও একটি মহত্বই ফুটে ওঠে। কটাক্ষ করা মোটেও ঠিক নয়। মন্দ চিত্তার ধারণা দিয়ে এটা-সেটা বলা ঠিক নয়। জেহাদের বেলায়ও ওই একই কথাটি আসে। আপন নফসের ভেতর খান্নাসরুপী শয়তানের বিরুদ্ধে জেহাদটি যদিও বড় জেহাদ, তাই বলে অস্ত্রের জেহাদটিকেও মোটেই খাটো করে দেখা যায় না, যদি সেই অস্ত্রের জেহাদটি ফি সাবিলিল্লাহ তথা আল্লাহর পথে হয়। আল্লাহর পথে অস্ত্রের জেহাদটি যদি ফি সাবিলিল্লাহ না হয় তা হলে ওটা নিরেট একটি যুদ্ধ। তাই অস্ত্রের জেহাদটিকে বলা হয় জেহাদে সগির তথা ছোট জেহাদ। একটি বাহির, অপরটি ভেতর। একটি মূর্ত, অপরটি বিমূর্ত। একটি মেজাজি জেহাদ, অপরটি হাকিকি জেহাদ। মেজাজি জেহাদ আছে বলেই হাকিকি জেহাদের মূল্যটি জ্ঞানী লোকেরা বুঝতে পারেন।

আমরা দেখতে পাই যে, অনেকে হাকিকি জেহাদটি তথা জেহাদে কবিরটি বুঝবার পর মেজাজি জেহাদ তথা জেহাদে সগিরটিকে মেনে নিতে চায় না। আবার পরক্ষণে দেখতে পাই, অনেকে মেজাজি জেহাদ তথা

অস্ত্রের জেহাদটি মেনে নেয়, কিন্তু আপন নফসের ভিতরে খান্নাসরূপী শয়তানের বিরুদ্ধে জেহাদ করাটিকে, তথা জেহাদে আকবরকে, তথা হাকিকি জেহাদকে মেনে নিতে চায় না। এটা কারও জন্যই শোভনীয় নয় এবং শুভ ফলটি বয়ে আনতে পারে না।

‘আল্লাহ মানা সহজ, পীর মানা কঠিন’

বুখারি শরিফ-এ একটি মশহুর হাদিস আছে যার সারাংশটি তুলে ধরলাম : মহানবিকে এক সাহাবা প্রশ্ন করেছিলেন এই বলে যে, ‘ইয়া রাসুলুল্লাহ, কাবা শরিফ হতে বায়তুল মোকাদ্দাসের দূরত্ব কতটুকু?’ মহানবি সঙ্গে সঙ্গে বললেন, ‘চল্লিশ বছর।’ প্রথম আল্লাহর ঘর কাবা শরিফ হতে বায়তুল মোকাদ্দাসের দূরত্ব চল্লিশ বছরের পথ। এই দূরত্বটি কোনো বাহ্যিক দূরত্ব নয়, এই দূরত্বটি পথ অতিক্রম করার দূরত্ব নয়। কারণ মানচিত্রটি খুলে দেখুন, দেখতে পাবেন মক্কার কাবা ঘরটি এবং জেরুজালেমে অবস্থিত বায়তুল মোকাদ্দাসটির অবস্থান। যদি আমরা— প্লেনের কথা বাদ দিলাম, রেলগাড়ি ও মোটর গাড়ির কথাটিও বাদ দিলাম, কোনো জীবজন্তুর দ্বারা বহনযোগ্য গাড়ির কথাটিও বাদ দিলাম, এবং এমনকি যে কোনো ধরনের যানবাহনের কথাটি বাদ দিখে কেবলমাত্র পায়ে হেঁটেও যাত্রা শুরু করি তা হলে তিন মাস লাগে কিনা

সন্দেহ—তা হলে মহানবি কেন সঙ্গে সঙ্গে বলে দিলেন যে কাবা ও বায়তুল মোকাদ্দাসের দূরত্ব চল্লিশ বৎসর?

এই যাত্রাটি কেবলমাত্র আধ্যাত্মিক যাত্রা। কারণ মহানবি পনের বছর হেরাণ্ডহায় ধ্যানসাধনা করে চল্লিশ বৎসরে নবুয়ত পেয়েছেন। মহানবি নিজের জীবনের চল্লিশ বৎসরে যে নবুয়তটি পেয়েছেন সেই কথাটি এখানে বলেছেন, অন্যথায় চল্লিশ বছরের দূরত্বটি কোনো অবস্থাতেই মানানো যায় না। এখানে আধ্যাত্মিক ধ্যানসাধনার পথে অগ্রসর হবার কথাটি বলা হয়েছে। শ্রদ্ধেয় ওহাবি ভাইদেরকে বলি যে, আসুন একটু গবেষণা করুন, বিবেককে ফাঁকি না দিয়ে কাঁধের উপরের সাইনবোর্ডটি ফেলে দিয়ে একদম নিরপেক্ষ হয়ে বিষয়টি নিয়ে গবেষণা করুন। গবেষণার ফলটি যদি গৌজামিল হয় তা হলে সেটাও একটি তকদির। কারণ, জন্মের আগেই আপনার আমার সবার তকদির নির্ধারিত।

অধ্যাত্মপথে অগ্রসর হয়ে হেরাণ্ডহার মতো নির্জন স্থানে ধ্যানসাধনা করার অগ্রযাত্রাটির পরিপূর্ণ ইঙ্গিত বহন করছে এই হাদিসটি। সুতরাং সুফিবাদকে কেমন করে ফেলে দেওয়া যায়? সুফিবাদকে কেমন করে এড়িয়ে যাওয়া যায়? সুফিবাদকে কেমন করে অস্বীকার করা যায়?

নির্জনে ধ্যানসাধনা তথা মোরাকাবা-মোশাহেদা করার নামটিই হলো সুফিবাদে পা রাখা। যারা সুফিবাদ মানে না তাদেরকে বিনয়ের ভাষায় বলছি, বুকে হাত রেখে বলুন তো, মক্কার কাবা হতে জেরুজালেমের বায়তুল মোকাদ্দাসে যদি পায়ে হেঁটেও

কেউ যেতে চায় তা হলে কি চল্লিশটি বছর লাগতে পারে?

বেশিরভাগ মানুষ প্রথমেই নেগেটিভ তথা মন্দটি দেখতে ভালোবাসে। একটি ভালো মানুষের মাঝেও খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে খুঁজতে থাকে মন্দ কিছু আছে কি না। কেন প্রথমে পজিটিভ তথা ভালোর দিকটি দেখতে চায় না? কারণ প্রতিটি মানুষের সঙ্গে আল্লাহ পরীক্ষা করার জন্য শয়তানটিকে খান্নাসরূপে পবিত্র নফসের ভিতরে ঢুকিয়ে দিয়েছেন। খান্নাস কখনই পজিটিভ চিন্তাটি মোটেই পছন্দ করে না। তাই মানুষ খান্নাসের অদৃশ্য কুমন্ত্রণার ফাঁদে পড়ে নেগেটিভ তথা মন্দ চিন্তাটি করতে বাধ্য হয়। ধরুন, যদি কোনো গায়ক গাইতে থাকেন যে, ‘ভবের নাট্যশালায় মানুষ চেনা দায়’— তা হলে কমবেশি সবাই আমরা খুশি হই এবং আনন্দে হাসতে থাকি এবং বলতে থাকি যে, একটি খাসা গান গাওয়া হলো। কিন্তু পরক্ষণে সেই গায়কটিই যদি আরেকটি গান গায় আর সেই গানের বাক্যটি যদি এই হয় যে, ‘ভবের নাট্যশালায় নিজেকে চেনা দায়’, তা হলে সবার মুখই কমবেশি নীরবতা পালন করবে, অথবা একটি বিষাদের দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলবে। কেন? গানের বাক্যটি একদম পজিটিভ। পজিটিভ খান্নাসের কাছে অসহ্য যন্ত্রণাদায়ক একটি বিষয়।

একজন নিতান্ত গরিব মানুষ মুরগির ডিমের ঝোল দিয়ে ভাত খেয়েছে। তারই একজন পরিচিত মানুষ প্রশ্ন

করলো, কী দিয়ে ভাত খেয়েছো? গরিব মানুষটি পজ্জিটিভ ভাষায় উত্তর দিল; উত্তরটির ভাষা এই রকম, ‘আম্র একটা ডিমের অর্ধেক দিয়ে পুরো এক প্লেট ভাত খেয়েছি।’ হয়তো বন্ধু এ রকম কথা শুনে হাসবে। হয়তো আমরাও হাসবো। কিন্তু কথাটি অপ্রিয় হলেও এটা একটি পজ্জিটিভ বাক্য। লোকটি গরিব। বালবাচ্চা নিয়ে আম্র একটা ডিম খাবার সামর্থ্য নাই, তাই অর্ধেক ডিম দিয়ে ভাত খেয়েছে। কী চমৎকার ভাষায় জানিয়ে দিলো, আম্র একটা ডিমের অর্ধেক দিয়ে পুরো এক প্লেট ভাত খেয়েছে, তথা আর কোনো তরকারি ছিলো না, তথা আর কোনো তরকারি জোগাড় করার মতো টাকাপয়সা ছিলো না। এই সরল সহজ কথাটি শুনবার পরও আমরা কেন হাসি? কারণ কোনো মানুষই একা নয়, বরং সঙ্গে খান্নাসরুপী শয়তানটি বহাল তবিত্তে অবস্থান করছে। আসলে খান্নাস হাসায়, তাই আমিও হাসি। এই হাসিটি ওই গরিবের জন্য নির্মম হতে পারে জেনেও, মুখের সামনে না হাসলেও, লুকিয়ে লুকিয়ে অথবা মুখে রুমাল চেপে একটু না একটু হাসি। এই কথাগুলো বলার একটি মাত্র উদ্দেশ্যই হলো যে নেগেটিভ আর পজ্জিটিভ তথা মন্দ দিকটি এবং ভালো দিকটি বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করা।

বাগদাদের বিখ্যাত ওলি ফরিদ উদ্দিন আন্তারের অমর গ্রন্থ তাজকেরাতুল আউলিয়া-য় যার নামটি এবং জীবনীর কিয়দংশ প্রকাশ করা হয়েছে সেই ওলিয়ে

কাম্মেল হজুরত বাবা বশরে হাফির একটি মহামূল্যবান কথা বার বার মনে পড়ে যায়। তিনি তাঁর মুরিদদেরকে প্রায়ই বলতেন, ‘আমার প্রিয় বাবারা, একটি কথা সব সময় মনে রাখবে, আর সেই কথাটি হলো : আল্লাহ মানা খুবই সহজ, কিন্তু পীর মানা খুবই কঠিন।’

আমরা ইসলামের ইতিহাস ইতে জানতে পারি হৃদায়বিয়ার সন্ধি আর ওহদের যুদ্ধটির বিষয়ে। হৃদায়বিয়ার সন্ধিটি অনেকেই লজ্জাজনক সন্ধি বলে মনে মনে ভেবেছেন। কিন্তু এই সন্ধির পরিণামই হলো মক্কা বিজয়।

একজন ওলিয়ে কাম্মেল পীর সাহেব দশ-বারোজন শিষ্য নিয়ে রেলওয়ে স্টেশনে এসেছেন। রেলওয়ে স্টেশনে আসবার মাত্র কয়েক মিনিট আগে ট্রেনটি স্টেশন ছেড়ে চলে যায়। মুরিদানেরা পীর সাহেবকে ট্রেন ফেল করার দুঃখটি প্রকাশ করলো। পীর সাহেব বললেন, ‘আল্লাহ যা করেছেন তা আমাদের মঙ্গলের জন্যই করেছেন।’ পরের দিন খবরের কাগজে বড় বড় ছবিসহ সেই ট্রেনটির ভয়ঙ্কর এক্সিডেন্টে কয়েক শ’ লোক মারা যাবার খবরটি ছাপা হলো। এই খবরটি জানার পর মুরিদানেরা পীর সাহেবকে বললো, ‘হজুর, ট্রেন ফেল করে ভালোই হয়েছে। কারণ সেই ট্রেনের যাত্রী হলে মৃত্যুর আশঙ্কা অথবা জখম হবার ভয় ছিলো।’ প্রথমে ট্রেনটি ফেল করার দরুন সবাই মনে মনে দুঃখ পেয়েছে, কিন্তু এক্সিডেন্টের ঘটনাটি জানবার পর আল্লাহর কাছে শুকরিয়া আদায় করেছে। প্রথমে দুঃখ, পরে আনন্দ। কেউ বোঝে, কেউ বোঝে না।

অপারেশন করার সার্জনের চাকুটি স্টিল দিয়েই বানানো, আবার কসাইয়ের চাকুটিও স্টিল দিয়েই বানানো। সার্জন স্টিলের চাকু দিয়ে অপারেশন করে মানুষ বাঁচায় আর কসাই সাহেব স্টিলের চাকু দিয়ে জবাই করে গোশত বিক্রি করে। দুজনার চাকুই স্টিলের

তৈরি। দুজনেই কাটছে। একজন বাঁচাবার নিয়তে, অন্যজন গোশত বিক্রির নিয়তে।

ভারতের আধুনিক গজল গায়কদের মাঝে যিনি বিশেষ সুখ্যাতি অর্জন করেছেন সেই আদনান সামির গজল গাইবার আয়োজন করা হয়েছে আবাহনী মাঠে। দুই হাজার টাকার সাদা টিকেট পাঁচ হাজার টাকায় কালো করে আদনান সামির গজল শুনেছে অনেকেই। কিন্তু ওই একই গজল একই সুরে, একই রঙচঙে আমি যদি গাই তবে মানুষ পাওয়া তো দূরের কথা, বরং মোটাতাজা দুই চারটি কুকুরের উচ্চৈঃস্বরে ঘেউ ঘেউ করার সমূহ সম্ভাবনা থাকতে পারে। আদনান সামির জন্য যাহা লীলাখেলা উহা আমার জন্য বেদনাদায়ক টিটকারির শাস্তি। জানীরা আমার এই কথায় আসল বিষয়টি আশা করি বুঝতে পারবেন।

হজরত বশরে হাফির ভাষায়, ‘আল্লাহ মানা খুবই সহজ, কিন্তু পীর মানা খুবই কঠিন।’ –এই কথাটি অধম লিখকের জীবনে স্মরণীয় হয়ে থাকার কথা। কারণ আমি দামি সিগারেট পান করতাম : কখনও জন প্র্যয়ার্স, কখনও ডানহিল। ১৯৮০ সালে আমার পীর ও মুরশিদ কেবলোয়ে কাবা শাহ সুফি সৈয়দ মাওলানা শাহজালাল নুরী আল সুরেশ্বরী আমাকে ডেকে বাবা বশরে হাফির এই কথাটি বলার মাঝে কী বুঝতে পেরেছি বলে জানতে চাইলেন। অধম লিখক পীর

বাবাকে বললাম, ‘আপনিই ভালো জানেন।’ পীর বাবা বললেন, ‘ধরো, কোনো মুরিদকে যদি আমি ধূমপান হতে বিরত থাকার আদেশটি দেই তা হলে সেই মুরিদ খুবই বিব্রত বোধ করবে।’ আমি বললাম, ‘বাবা, আপনি ঠিকই বলেছেন।’ পীর বাবা বললেন, ‘তা হলে তুমি বুঝতে পেরেছো?’ আমি বললাম, ‘আমি পরিষ্কার বুঝতে পেরেছি।’ তারপর হতে দীর্ঘ ২৮ বছরে একটি সিগারেটও ভুলে তোঁটে রাখি নি। প্রথমে খুব কষ্ট হয়েছে। পরে বুঝতে পারলাম, জীবনভর ধূমপান করলেও এমনকি লাগুস পচে যাবার উপদ্রব হলেও আল্লাহ সোজাসুজি কখনই ধূমপান হতে বিরত থাকার কথাটি বলবেন না। বলবেন আপন পীর সাহেব। সুতরাং বাবা বশরে হাফির ‘আল্লাহ মানা খুবই সহজ, পীর মানা খুবই কঠিন’ কথাটি মর্মে মর্মে বুঝতে পারলাম।

যারা বুঝবার তারা এই সামান্য কথাতেই পরিষ্কার বুঝতে পারবেন। আর যারা বুঝেও বুঝতে চাইবে না তাদেরকে হাজারও দলিল-প্রমাণ দিয়েও বুঝানো যায় না।

আল্লাহ ও তাঁর আশেক অভিন্ন

ইয়েমেন হতে কিছু সংখ্যক খ্রিস্টান ধর্মের অনুসারী এসে মহানবিকে দেখতে চাইলো। মহানবিকে দেখেই ওই খ্রিস্টান ধর্মের অনুসারীরা মহানবিকে মাত্র একটি কথা

বলেছিল আর সেই কথাটি হলো : আমরা আল্লাহকে দেখতে চাই। এই কথাটি শুনে মহানবির মুখমণ্ডলে একটি পরিবর্তনের ভাব দেখা গেল। মহানবি সেই খ্রিস্টানদের লক্ষ করে বললেন, ‘মান রাখানি ফাকাদ রাখান হাক্ক’ অর্থাৎ, ‘যে আমাকে দেখেছে সে আল্লাহকে দেখেছে।’

এই কথা শোনার পর গুটি কয়েক খ্রিস্টান মুসলমান হয়ে গেল। মহানবির সাহাবারা কিছুটা অবাক হলেন বটে। তাই কোনো একদিন মহানবিকে সাহাবারা প্রশ্ন করলেন, ‘ইয়া রাসুলুল্লাহ, আপনাকে তো কাট্টা কাফের আবু জাহেল, আবু লাহাব, ওকবা, শায়েবা, আবদুল্লাহর মতো কাফেরেরা অনেকবার দেখেছে, কিন্তু তারা কি আল্লাহকে দেখতে পেয়েছে?’ মহানবি কিছুক্ষণ নীরব রইলেন। তারপর কোরান-এর সূরা আরাফের ১৯৮ নম্বর আয়াতের একটি অংশ পড়ে শোনালেন, ‘ইয়ান জুরুনা ইলাইকা ওয়াহম লাইউফসুরুন’ অর্থাৎ ‘দেখিতেছেন, তাহারা আপনাকে দেখিতেছে অথচ দেখিতেছে না।’ (বিষয়টি হবহ নয়, বরং সারাংশ নিজের ভাষায় লেখা হয়েছে।)

এই আয়াতটি একটু গবেষণা করলেই বোঝা যায় যে চর্মচক্ষুতে দেখাটাই আসল দেখা নয়। আসল দেখাটা হৃদয় দিয়ে, অন্তরের অন্তঃস্থল দিয়ে দেখতে হয়। একটি মেনজাজি দেখা, অপরটি হাকিকি দেখা। মেনজাজি

দেখাটা সবাই দেখতে পায়। তাই সবার সমর্থন পাওয়া যায়। কিন্তু হাকিকি দেখাটা অল্প সংখ্যক মানুষ আল্লাহর রহমতরূপে দেখতে পারে। আল্লাহর রহমত ছাড়া হাকিকি দেখা কারও পক্ষে সম্ভব নয়। সুতরাং ইসলামের প্রায় প্রতিটি বিষয়ের দুইটি দিক আছে এবং দুইটি দিক দেখতে পাই। একটি মেক্জাজি দিক এবং অপরটি হাকিকি দিক। একটি বাহিরের দিক এবং অপরটি ভেতরের দিক। একটি রূপক, অপরটি আসল। এই বিষয়টি বুঝতে না পারলে, অনুধাবন এবং অনুশীলন না করলে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের হালকা দর্শন তথা মেক্জাজি দর্শনের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করতে দেখি। এবং এই মেক্জাজি দর্শন তথা অনুষ্ঠানের ধর্মটিকে সর্বস্ব বলে মনে করে। এই ভুলগুলো হতে পরিব্রাণ পাবার উপায় ও অবলম্বন কেমন করে হতে পারে তার বিশদ ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করে গেছেন বিশ্ববিখ্যাত মাওলানা জালাল উদ্দিন রুমি তাঁর রচিত অমর গ্রন্থ মসনবি শরিফ-এ এবং স্পেনের বিখ্যাত সুফি সাধক মহিউদ্দিন ইবনুল আরাবি তাঁর অমর গ্রন্থ ফতুহাতুল মক্কি-তে এবং বিশ্ববিখ্যাত ওলি হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গাজ্জালি তাঁর অমর গ্রন্থ এহিয়ায়ে উলুম উদ্দিন-এ এবং বিশ্ববিখ্যাত ওলি ফরিদউদ্দিন আত্তার তাঁর রচিত মানতে কুত্বাতয়ের এবং তাজকেরাতুল আউলিয়া-তে। এবং এইভাবে আল্লাহর বহু ওলি-পীর-ফকির-গাউস-কতুব-আবদাল-

আরিফরা ইসলামের হাকিকি বিষয়গুলোর রহস্য ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলেছেন।

শ্রদ্ধেয় ওহাবি বিজ্ঞ আলেম-উলামারা বুদ্ধি করে কোনো ইসলামি চ্যানেলে জীবনেও ওলি-আল্লাহদের নামটি নেবেন না। কারণ শ্রদ্ধেয় আলেম-উলামারা সুফিবাদ মানা তো দূরে থাক, বরং ওলি-আল্লাহদেরকে কাফের ফতোয়া অনেক আগেই দিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং এদেরকে কতল করা তথা খুন করা ওয়াজিব বলে ওহাবিদের গুরুঠাকুর আবদুল ওহাব নজ্জির লিখনিতে পাওয়া যায়। ওহাবিদের টাকাপয়সায় যে সকল ইসলামি

চ্যানেল আছে সেইসব চ্যানেলে কেমন করে ওলি-আল্লাহদের কথা আশা করেন? ভুতের মুখে রামনাম যেমন কেউ আশা করেন না, সেই রকম ওহাবিদের টেলিভিশন চ্যানেলে এবং ওহাবিদের লিখনিতে ওলিদের শানশুকত বর্ণনার কথাটি আশা করা যায় না। তবে পাকিস্তানের একটি ইসলামি চ্যানেল আছে যে চ্যানেলটির নাম কিউ টিভি। ইহাই একমাত্র সুন্নিদের ইসলামি চ্যানেল। এই কিউ টিভি চ্যানেলটি ওহাবি মতবাদের ধ্যানধারণার মাথায় যে প্রতিনিয়ত আঘাত করে চলছে এতে অধিকাংশ মুসলমান সঠিক পথের একটি ধারণা পাচ্ছে।

অবশ্য চরম সত্যে ওহাবিদের এই লিখনি এবং টিভি চ্যানেলগুলো আছে বলেই আধ্যাত্মিক জগতে প্রবেশ করার প্রশ্নে দ্বান্দ্বিক দর্শনটিকে কোনোভাবেই এড়িয়ে যাওয়া যায় না। জার্মান দার্শনিক হেগেল সাহেবকে এ জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ দিতে হয়।

নফস খিসিস, খাল্লাসরূপী শয়তান অ্যান্টিখিসিস এবং নিজের ভেতরে রবরূপী আল্লাহর প্রকাশটি হলো সিনখিসিস।

তুমি যেমনে নাচাও তেমনি নাচি পুতলের কী দোষ? বাক্যটির অনেক রকম সমালোচনা, অনেক রকম বিচার-বিশ্লেষণ করা যায়, কিন্তু চরম পর্যায়ে দাঁড়িয়ে অন্ধকার পর্দা উন্মোচন করে দেখতে পাই একেরই লীলাখেলা, একেরই বিচ্ছেদ আর প্রেম, একেরই হা-হতাশ আর অন্যদিকে আনন্দ, একেরই অনাহারক্লিষ্ট মানুষের চোখে চাঁদটিকে মনে হয় কিছুটা পুড়ে যাওয়া রুটি। আবার অন্যদিকে রুটি-মাখন আর হালুয়া খাওয়ার ছড়াছড়ি আর আনন্দের হাসি। ‘লা মগজুদা ইল্লাল্লাহ’ অর্থাৎ ‘নাই কোনো অস্তিত্ব একমাত্র আল্লাহ ছাড়া।’ একটি ক্ষুদ্র বালুকণাও সাহস করে বলতে পারবে না যে, আমি যতই ছোট হই না কেন, কিন্তু আমি আল্লাহ হতে আলাদা। আমি আল্লাহ হতে আলাদা, এই কথাটি বলার অধিকার সমগ্র সৃষ্টিরাজ্যের কাউকে দেওয়া হয় নি, দেওয়া হয় না, দেওয়া হবেও না। কেউ এই কথাগুলোর রহস্য মনেপ্রাণে বুঝতে পারে, আবার কেউ এই কথাগুলোকে পাণ্ডলের প্রলোপ বলে হি হি করে হাসে। এখানেও দ্বন্দ্বিক দর্শনের গন্ধ পাই।

এক আল্লাহ-প্রেমিক সুলতানুল হিন্দ খাজা বাবার মাজারের কাছে নৃত্য করছে আর মাঝে মাঝে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। সহসা প্রেমিক নৃত্য বন্ধ করে চিৎকার দিয়ে বলছে যে, আমি যে নৃত্য আর ফুঁন্দন করছি এটাও তোমার ইশারায় করছি। সমীরণ বিহনে সাগরে উর্মির নৃত্যটি থাকে না। সমীরণ বিহনে উর্মির নৃত্য যেমন থাকে না, আল্লাহ, তোমার প্রেমসমীরণ না থাকলে নৃত্য আর ফুঁন্দনও থাকে না। এই নৃত্য ও ফুঁন্দন আপেক্ষিক দৃষ্টিভঙ্গিতে কখনও শোভন, কখনও শোভন নয়। কখনও আনন্দদায়ক, কখনও বেদনাদায়ক। কখনও তালের ছন্দ পাই, কখনও বেতালের গন্ধ পাই। তাই কাকে দোষ দেব? কাকে অপবাদ দেব?

কদরের রাত

এইবার আমরা 'লাইলাতুল কদর'— এর বিষয়টা নিয়ে সামান্য একটু আলোচনা করতে চাই, যদিও এই বিষয়টি মার্কিনের বাণী নামক বইটাতে আগেই লিখা হয়েছে। লাইলাতুল কদরের শাস্ত্রিক অর্থটি হলো শক্তিশালী রাত্রি, অথবা মর্যাদাপূর্ণ রাত্রি। 'লাইল' অর্থ রাত্রি এবং 'কদর' অর্থ প্রথমে শক্তিশালী তারপর মর্যাদাপূর্ণ।

এই কদর রাত্রিটির মাঝেও আমরা দুইটি রূপ দেখতে পাই। একটি মেজাজি রূপ এবং অপরটি হাকিকি রূপ। মেজাজি রূপের কদর রাত্রিটি মহানবি রমজানের শেষ অংশে বেজোড় রাত্রিতে খুঁজতে বলেছেন। কেন বেজোড় রাত্রিতে খুঁজতে বললেন? কেন জোড় রাত্রিতে খুঁজতে মানা করলেন? বেজোড় দিয়ে একের কথাটি বুঝানো হয়েছে আর জোড় দিয়ে দুইয়ের কথাটি বলা হয়েছে। কেন একের কথাটি বলা হলো? কেন বেজোড় রাত্রে লাইলাতুল কদরের রাত্রিটি খুঁজতে বলা হলো? কেন জোড় রাত্রে খোজা নিষেধ করে দিলেন?

হাকিকি দর্শনে নফস তথা আমি এবং খান্নাসরূপী শয়তান, যাহা সৃষ্টিরাজ্যের কোথাও নাই কেবলমাত্র মানব নফসের সঙ্গে খান্নাসকে থাকার বিশেষ উদ্দেশ্যে অনুমতি দেওয়া হয়েছে, সুতরাং আমি ও খান্নাস মিলে দুইজন তথা জোড়। সাধক যখন এই আমার ভেতরের খান্নাসরূপী শয়তানটিকে তাড়িয়ে দেবার জন্য সর্বপ্রকার লোভ-মোহ হতে হাত গুটিয়ে ধ্যানসাধনার মোরাকাবা-মোশাহেদায় লিপ্ত থাকেন তখন সাধকের জন্য ওটাই রোজা, ওটাই সিয়াম।

সিয়ামের শাস্ত্রিক অর্থটি হলো বিরত থাকা, বর্জন করা। কার থেকে বিরত থাকবো এবং কাকে বর্জন করবো? আপন নফসের ভেতরের খান্নাসরূপী শয়তানটিকে বর্জন করার ধ্যানসাধনাটিই হলো

হাকিকতের সিয়াম তথা রোজা। ধ্যানসাধনার চূড়ান্ত পর্যায়ে তথা শেষের দিকে যখন আল্লাহর বিশেষ রহমতে খান্নাসরূপী শয়তানটিকে আপন নফস হতে বর্জন করা হয় তখনই নফস একা হয়ে যায়। এবং তখনই সেই সাধকের জন্য কদর রাত্রিটির তথা শক্তিশালী রাত্রিটির আগমন ঘটে। তখনই সাধকের ভেতরের বীজরূপী রুহটি প্রকাশিত ও বিকশিত হয়ে পড়ে।

রুহ যখন বিকশিত ও প্রকাশিত হয়ে পড়ে তখনই উহাকে বলা হয় রুহ নাজেল করা। আর যেইমাত্র রুহ নাজেল করা হয় তখন ফেরেশতাদের আগমন অবধারিত। ইহাই হাকিকতের লাইলাতুল কদর।

যদি মেজাজি লাইলাতুল কদরের রাত্রিটির উল্লেখ না করা হতো তা হলে হাকিকতের লাইলাতুল কদরের হারিয়ে যাবার সম্ভব সম্ভাবনা থাকতো। মেজাজি লাইলাতুল কদরটি হলো মৃত তথা দেখা যায় আর হাকিকি লাইলাতুল কদরটি হলো বিমূর্ত তথা দেখা যায় না। তাই যে সার্থক হাকিকি লাইলাতুল কদর রাত্রিটির সন্ধান পেয়েছেন তাঁর জীবন আল্লাহর কাছে সার্থক হবে। হাকিকি লাইলাতুল কদর যে সাধকের জীবনে ঘটেছে তিনি নিঃসন্দেহে ওলিয়ে কাম্মেল, তিনি নিঃসন্দেহে সারাপা তথা আল্লাহর নুরের সাগরে অবগাহন করা একজন সাধক। এই রকম সাধকের পরিচয়টি আল্লাহ নিজেই রহস্যের দেয়াল দিয়ে ঢেকে রাখেন। কারণ সবাই যদি বুঝতে পারে, জানতে পারে, তা হলে ‘আমি তোমাদের পরীক্ষা করার জন্য দুনিয়াতে পাঠিয়েছি’ কথাটির আর সার্থকতাটি থাকে না।

সুতরাং এক কথায় বলা যায় যে রমজানের একশ, তেইশ, পঁচিশ, সাতাশ, উনতিরিশ— এই বেজোড়

রাব্রিষ্টুলোতে লাইলাতুল কদরের সন্ধান করাটা হলো মেজাজি লাইলাতুল কদর। এই মেজাজি লাইলাতুল কদরকে এড়িয়ে যাওয়া, কিছু একটা যা-তা মন্তব্য করা মোটেই ঠিক নয়, বরং অন্যায় বলেই ধরে নিতে চাই।

আল্লাহর হক ও বান্দার হক

আমরা কিছু একটি মূল্যবান আদর্শের কথাটি জেনেগুনে ভুলে যাই,

আর সেই কথাটি হলো : এবাদতকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে, একটি আল্লাহর হক এবং অপরটি বান্দার হক। খুব ছোট করে এই বিষয়টির

ওপর আলোচনা করতে চাই এই জন্যই যে ইহার বিস্তারিত ব্যাখ্যা- বিশ্লেষণ, দলিল-প্রমাণ দেওয়া হয়েছে আমার রচিত মারফতের গোপন কথা নামক বইতে।

আল্লাহর হক আদায় না করলে বান্দা আল্লাহর কাছে অপরাধী হয় এবং সেই অপরাধ মাফ করে দেবার একমাত্র ক্ষমতাটি আল্লাহরই উপর। আল্লাহর হক কী কী ইহা আর বলে দিতে হয় না এবং বলার প্রয়োজনও মনে করি না। কারণ এটা কন্মবেশি সবারই জ্ঞানা থাকার কথা। বান্দার হক যদি আদায় করা না হয় তা হলে যাকে হক হতে বঞ্চিত করা হয়েছে সে যদি মাফ

না করে তা হলে আল্লাহ মাফ করার বিধানটি রাখেন নি।

সুতরাং বান্দার হকটি খুবই মারাত্মক বিষয়, ভয়ঙ্কর ব্যাপার এবং বিব্রতকর অবস্থায় ফেলে দেয়।

কোরান বলেছে : তুমি কি সেই মানুষটিকে দেখেছ যে ইসলামের উপর মিথ্যা চাপিয়ে দেয় অথবা মিথ্যা আরোপ করে? সেই মানুষটি, যে এতিম হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়। এতিম হতে মুখ ফিরিয়ে নিলেই যদি ইসলাম হতে প্রথমেই বাদ পড়ে যায়, তা হলে এতিমের আত্মনত খেয়ানত এবং এতিমের হক ক্ষেপে দিলে কী রকম ভয়ঙ্কর অবস্থাটি দাঁড়ায়? বুকে হাত রেখে নিজের বিবেককে বার বার প্রশ্ন করে দেখুন তো?

এই অপ্রিয় সত্য কথাটি সব ফেরকার আলেম-উলামারা একবাক্যে স্বীকার করে। আল্লাহ বলেছেন যে, তোমরা যতই চালাকি করো না কেন আমার চেয়ে বড় চালাক নও। (হবহ উদ্ধৃত নয়)। কেন এই কথাটি তুলে ধরলাম? মানুষ নিজের স্বার্থের প্রশ্নে ফাঁকিবাজ। ফাঁকিবাজিটা তখনই

উঁকি-ঝুঁকি মারে যখন স্বার্থের উপরে আঘাত আসে। বান্দা চালাক, তাই মনে করে আল্লাহর এবাদত-বন্দেগি পালন করলেই বেহেস্তে যেতে পারবে।

কিন্তু এতিমদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলে, এতিমদের আত্মনত খেয়ানত করলে, এতিমদের আর্থিক সম্পত্তি ক্ষেপে দিলে বেহেস্তে যাবার প্রশ্নই উঠতে পারে না।

হ্যাঁ, তখনই বেহেস্তে যেতে পারবে যখন এতিমেরা তাদের হক মেরে দেবার পরও জেনে শুনে ক্ষমা করে দেবে। বান্দার হক আল্লাহ মার্ফ করে দেবার বিধানটি আল্লাহ নিজেই রাখেন নি। এই বান্দাদের অর্থনৈতিক কষ্ট দেওয়া, দারিদ্রের কষাঘাতে জর্জরিত করা যাদের স্বভাবে পরিণত হয়েছে তারা যতই আল্লাহর এবাদত-বন্দেগি করুক না কেন, বেহেস্তে যাবার প্রশ্নটিই উঠে না। এইখানেই এবং এই বিষয়েই বেশির ভাগ বান্দার খাবে এবং আল্লাহর দরবারে বিচারের মুখোমুখি হতে হবে। এ জন্যই বলা হয়ে থাকে যে অধিকাংশ মানুষেরই জাহান্নামে যাবার বেশি সম্ভাবনা আছে। এই বান্দার হক নিয়েই অনেক বান্দার আল্লাহর দরবারে বিচারের মুখোমুখি হয়ে জাহান্নামে যেতে হবে।

যদি কোনো দেশের সরকার বেকারদের বেকার-ভাতা দেবার ব্যবস্থা করে, বাসস্থানের ব্যবস্থা করে, চিকিৎসার ব্যবস্থা করে এবং সন্তানদের দায় দায়িত্ব গ্রহণ করে তা হলে সেই দেশে কমিউনিজম প্রবেশ করতে পারবে না। অথচ এই বান্দাদের হক আদায়ের বিষয়টিতে আমরা খুব বেশি একটা গুরুত্ব দেই না, যতটুকু গুরুত্ব দেই নামাজ-রোজার উপরে। মুয়াবিয়া কী করলো, উমাইয়াদের শাসনব্যবস্থা কেমনটি ছিলো এবং আব্বাসীয় আমলের শাসন ব্যবস্থাটি কেমন ছিলো এই বিষয়গুলো এইখানে তুলে ধরবার প্রয়োজন মনে করি

না। এই আধুনিক যুগে তথা এই একবিংশ যুগে এক মালয়শিয়া বাদে ছাপ্পান্নটি মুসলিম দেশের অবস্থাগুলো কেমন তা আর বলে দিতে হয় না। বুঝলে বুঝলেন, আর যদি না বোঝেন তো বলার কিছু নাই।

ইতিহাসের জনক হেরোডোটাস আমাদের যেমন ইতিহাস লিখতে এবং পড়তে শিখিয়েছেন, তেমনি বিশ্বব্যাপকের এককালের প্রেসিডেন্ট ম্যাকনামারা কমিউনিজমকে তেঁকাবার ট্যাবলেট-ক্যাপসুল নামে পরিচিত এনজিও-র মাধ্যমে মানবসেবা করার প্রতিষ্ঠানগুলোর জনক।

ওহাবি, শিয়া এবং ১০ই মোহরম পৃথিবীর অধিকাংশ মুসলমানই আহলে সুন্নাতুল জামাতের অনুসারী এবং তারপর শিয়া ফেরকার অনুসারী এবং তারপর ওহাবি ফেরকার অনুসারী। সমগ্র সৌদি আরব ওহাবি ফেরকার অনুসারী এবং ইরান শিয়া ফেরকার অনুসারী এবং ইরাকের অধিকাংশ মুসলমান শিয়া ফেরকার অনুসারী। আমার জানা মতে, সুন্নি ফেরকার অনুসারীদের একটিমাত্র টেলিভিশন চ্যানেল আছে এবং সেই চ্যানেলটির নাম কিউ টিভি। কিউ টিভি-তে কেবল সুন্নিদের আদর্শই প্রচার করে না, বরং অনেক ওলি-আল্লাহদের ফারসি ভাষায় রচিত দুঃপ্য অমর গ্রন্থগুলো পুনরায় ছাপিয়ে প্রচার করার

ব্যবস্থাটিও করেছে। শিয়া এবং ওহাবি উভয় ফেরকার মাথায় ইহা একটি প্রচণ্ড আঘাত। যেহেতু ইরান শিয়া ফেরকার অনুসারী এবং যেহেতু শিয়ারা সুফিবাদ মানে না তাই তাদের নিজস্ব ভাষায় রচিত ওলি-আল্লাহদের মহামূল্যবান গ্রন্থগুলো পুনরায় ছাপাবার প্রস্তুতি ওঠে না। অপরদিকে ওহাবিদের বেলায় তো আরও ভয়ঙ্কর ব্যাপার। ওহাবিরা আল্লাহর বড় বড় ওলিদেরকে মেনে নেবার প্রস্তুতি তো দূরে থাক, বরং কাকের ফতোয়া দিয়েছে। সুতরাং সুফিবাদ ওহাবিদের কাছে একটি অসহ্য বিষয়।

ওহাবিদের গুরুঠাকুর আবদুল ওহাব নজ্জদি সাহেব ওহাবি বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে শলা-পরামর্শ করতো। এক ওহাবি আনু বুদ্ধিজীবী বলে ফেললো যে, পৃথিবীর সমস্ত মাদ্রাসাগুলো হতে ফারসি ভাষাটি উঠিয়ে দিলে সুফিবাদের মৃত্যুঘণ্টা আপনিই বেজে উঠবে। কারণ সুফিবাদের ভাণ্ডারটি ফারসি ভাষায় রচিত হয়েছে। চেয়ে দেখুন, আজ আর পৃথিবীর কোনো মাদ্রাসায় ফারসি ভাষায় রচিত ওলি-আল্লাহদের বইগুলো পড়ানো হয় না। যখন মাদ্রাসায় ফারসি ভাষাটি চালু ছিলো তখন অনেক অনেক আল্লাহর ওলি মাদ্রাসা হতে বেরোতো। এখন আর মাদ্রাসা হতে ওলি বের হয় না। বৈজ্ঞানিক নিউটনের সূত্রটির চমৎকার মিল পাওয়া যায়। বৈজ্ঞানিক নিউটন বলেছেন যে, প্রত্যেকটি কাজের

সম্মান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া আছে। এখন মাদ্রাসা হতে আল্লাহর ওলি বের না হয়ে বের হয় তালেবান আর জঙ্গি।

সৌদি আরবের পেট্রোডলারের প্রচণ্ড দাপটে বহু সুন্নি আলেম-উলামাকে বিক্রি হয়ে যেতে দেখি। এই বিক্রি-হয়ে-যাওয়া আলেমদেরকে বলা হয় ‘বিকায়ী’ আলেম। ওহাবিদের দর্শনের সঙ্গে খারেজিদের দর্শনের হুবহু মিল পাওয়া যায়। ওহাবিদের দর্শনটি মনে হয় চমৎকার। ইমিটেশনের অলঙ্কার যে রকম চকচক করে, আসল অলঙ্কার ইমিটেশনের ধারে কাছেও যেতে পারে না। তাই সরল-সহজ মানুষগুলো এদের ফাদে পড়ে যায়। আবার ইরানের শিয়াদের প্রচারটিও কম নয়। তারাও ব্যাপক প্রচার করে চলেছে। শিয়া ও ওহাবিদের প্রচারের চাপাচাপিতে আহলে সুন্নাতুল জামাতের অনুসারীরা অনেকটা অসহায় হয়ে পড়েছে। কিন্তু সেভাগ্য যে পাকিস্তানের কিউ টিভি চ্যানেলটি কিছুটা হলেও উদ্ধার করতে পেরেছে।

পৃথিবীবিখ্যাত এক আহলে সুন্নাতুল জামাতের আলেম, যিনি ডক্টর উপাধিতে ভূষিত, সেই ডক্টর মোহাম্মদ আল তিজ্জানি আল সামাভি শিয়া ফেরকার অনুসারী হয়ে যান। তাঁর রচিত বিখ্যাত বই অবশেষে আমি সত্য পেলাম। বহু ভাষায় অনুদিত বইটির ১৭৩ পৃষ্ঠায় তিনি লিখেছেন, ‘অতঃপর আমি নিশ্চিত হই যে, “ইসনা আসারী” দলটাই সঠিক। অতএব আমি শিয়া হয়ে গেলাম।’

শিয়া ফেরকার অনুসারীরা হজরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.), ফারুক আজম হজরত ওমর ফারুক (রা.), জুন্নুন নুরাইন হজরত ওসমান গনি (রা.) এবং আশ্শারে-মোবাশ্শারা তথা দুনিয়াতে থেকেই যারা

জান্নাতের সুসংবাদ পেয়েছেন সেই দশজনের একজন হজরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রা.)- এই চার সাহাবার নাম-গন্ধটিও সহ্য করতে পারে না।

ড. মো. আল তিজানি আল সাম্মাভি এদের বিরুদ্ধে সুন্নিদের দলিল প্রমাণসহ এবং শিয়াহ সিঁতাহ হাদিসের রেফারেন্স দিয়ে প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, তাঁরা সাহাবা হবার মর্যাদাটুকুও হারিয়ে ফেলেছেন। আমি বলতে চাই না যে, অতিভক্তি চোরের লক্ষণ। কিন্তু এটুকু বলতে চাই যে ড. মোহাম্মদ আল তিজানি যেহেতু সুফিবাদ অস্বীকারকারী তাই গাদিরে খুম-এ মহানবির একটি কথার ভুল ব্যাখ্যা করেন। মহানবি বলেছিলেন, ‘আমি যার মাওলা, আলিও তার মাওলা’, এবং এই কথাটি বিনাবাক্যে সব সাহাবারা মেনে নিয়েছিলেন। এমনকি হজরত ওমর (রা.), হজরত আবু বকর (রা.), এবং হজরত ওসমান (রা.)-ও মেনে নিয়েছিলেন। মহানবির পর্দাশ্রয় করার পর মাওলা আলি (আ.)-কে কেন প্রথম খলিফা করা হলো না এটাই শিয়াদের বিরাট গোম্বা। এবং শিয়ারা মনে করে যে হজরত ওমর (রা.), হজরত আবুবকর (রা.) ওয়াদা ভঙ্গকারী। যেহেতু শিয়ারা সুফিবাদ মানে না সেহেতু সুফিবাদের জ্বলন্ত দলিলটি পেশ করলেও তারা মানবে না। কারণ দলিলটি নির্ভর করে সুলতানুল হিন্দ খাজা বাবার কথাগুলোর উপর, যে কথাগুলো আজও স্বর্ণে ক্ষোদিত অক্ষরে সদর দরজার উপরে লিখিত আছে : ‘শাহ হাম্বে

হোসাইন, বাদশা হাশ্বে হোসাইন’ অর্থাৎ ‘রাজা হোসাইন, রাজার রাজা হোসাইন।’

শিয়া এবং ওহাবিদের তো প্রশ্ন করাটি একটি মামুলি ব্যাপার, বরং আহলে সুন্নাতুল জামাতের অনুসারী অধম লেখকও যদি খাজা বাবাকে প্রশ্ন করি যে, ইমাম হোসাইন কেমন করে রাজা হলেন এবং ইমাম হোসাইন কেমন করে রাজার রাজা হলেন? ইসলামের ইতিহাস পড়লেই পরিষ্কার বোঝা যায় যে রাজা হয়েছিল এজিদ, খলিফা নামধারণ করে সিংহাসনে বসেছিল এজিদ, মুম্বিনদের আশ্রিত বলে ঘোষণা করে এজিদ মুসলিম জাহানের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হয়েছিল। রাজ্যশাসন করেছিল এজিদ, সৈন্য-সামন্ত নিয়ে মদিনা আক্রমণ করে বহু সাহাবা এবং তাদের সন্তানদেরকে নির্মম-নিষ্ঠুরভাবে শহিদ করেছিল এই এজিদ। অপরপক্ষে, ইমাম হোসাইন কারবালার রণপ্রান্তরে এজিদের সৈন্যবাহিনীর প্রধান ইবনে জিয়াদের হুকুমে

সপরিবারে শাহাদাত বরণ করেছিলেন। এমনকি আওলাদে রসুল দশমাসের শিশু আলি আসগর (আ.)-ও ওই কারবালার মাঠে শহিদ হয়েছিলেন। এই শাহাদাত বরণ করার কলঙ্কময় দিবসটির নাম ১০ই মোহরম। অনাগত কালের মুসলমানগণের খুঁত নিক্ষেপ করার, ষড়্ধার, ঝাড়-জুতা-পটা স্যাঙেল উড়ে মারার অপবাদ হতে বাচবার জন্য ১০ই মোহরমের অনেক প্রকার ফজিলতের বয়ানটি আমরা দেখতে পাই। আমরা দেখতে পাই, এই কলঙ্কময় ১০ই মোহরম দিবসটিকে দুই হাজার পাঁচশত নবির জন্মদিবস হিসাবে তথা পঁচিশ শত নবি এই ১০ই মোহরম তারিখে জন্মগ্রহণ

করেছিলেন। আমরা দেখতে পাই, আদমের (আ.) তওবা কবুল হয়েছিল এই ১০ই মোহরমের দিনে। আমরা দেখতে পাই, নূহ নবির (আ.) নোকাটি মহাপ্রবনের সময় ১০ই মোহরমের দিন জুদি পর্বতে ভিড়েছে। আমরা দেখতে পাই, মুসা নবি (আ.) নীলনদের মাঝখানের রাস্তাটি তৈরি করেছিলেন ১০ই মোহরমের দিনে। আমরা দেখতে পাই, ১৮ বছর পোকায়ে খাওয়া শরীরে অসহ্য যন্ত্রণা নিয়ে আইউব নবি (আ.) ১০ই মোহরমের দিন সম্পূর্ণ সেরে উঠলেন। আমরা দেখতে পাই, ইউনুস নবি (আ.) রজব মাসে দুই মাসের পেটে অবস্থান করছেন কমপক্ষে এক মাইল পানির নিচে দীর্ঘ তিনমাস : অক্সিজেন নাই, খাদ্য-পানি নাই, মাস দুটিও ইউনুস নবিকে গিলে ফেলে মহা মুশকিলে পড়ে গেল। তারপর এই ১০ মোহরমের দিনে বালুচড়ে ইউনুস নবিকে বন্দি করে ফেলে দিল। ইউনুস নবি (আ.) গা ঝাড়া দিয়ে বাড়িতে চলে গেলেন।

এই ১০ই মোহরমের ফজিলতের বয়ানটি আরও অনেক বড়। এখানে সামান্য কিছুটা তুলে ধরলাম। তুলে ধরলাম এ জন্য যে উমাইয়া রাজবংশ এবং আব্বাসীয়া রাজবংশ অনাগত কালের মুসলমানদের মগজ ধোলাই করবার চমৎকার ব্যবস্থাটি করে গেছে! সাবাস উমাইয়া রাজবংশ! ব্রেভো আব্বাসীয়া রাজবংশ! কিন্তু শুভকরীর বিরাট ফাঁকটুকু একটু গবেষণা করলে ধরা পড়ে যায়। এই সাবাস পাওয়া উমাইয়া রাজবংশটি শহিদে আজম ইমাম হোসাইনের শানমানটি মুছে ফেলার একটি পাকাপোক্ত সুচতুর ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। এই বিরাট শুভকরীর ফাঁকটুকু পাঠক বাবা-মায়েদেরকে একটু ধরিয়ে দিতে চাই।

আদমের (আ.) তওবা কবুল হয়েছিল এই ১০ই মোহরমের দিন। তওবা কবুল হবার সময়ে হাবিল-কাবিল এবং অন্য ভাইবোনের একজনও জন্মগ্রহণ করেন নি। এই নির্দিষ্ট ১০ই মোহরমের দিনটিতে আদমের তওবা যে কবুল হয়েছিল উহা কে লিখে রেখেছিল? মানুষই নাই অথচ ১০ই মোহরমের দিনটি নির্ধারণ করা যে একটি বিরাট ধাম্মাবাজি ইহা পরিষ্কার বোঝা যায়। আরও লক্ষ্য করার বিষয় যে, যতগুলি ঘটনা ১০ই মোহরমের দিন ঘটেছে সবগুলো সুখের ঘটনা, আনন্দের ঘটনা : কেবলমাত্র মহানবির আওলাদ, শহিদে আজম ইমাম হোসাইনই এই ১০ই মোহরমের দিন শাহাদাত বরণ করেন। আড়াই হাজার নবির জন্মদিন এই ১০ই মোহরম। সুতরাং আড়াই হাজার নবির সামনে ইমাম হোসাইনকে অবহেলা করার একটি বিরাট ধাম্মাবাজি। উমাইয়া রাজবংশ বুঝাতে চেয়েছিল যে আড়াই হাজার নবির শুভ জন্মদিনের সামনে ইমাম হোসাইনের শহিদ হবার ঘটনাটি তত গুরুত্ব বহন করে না। আচ্ছা, ধরে নিলাম, সমস্ত ঘটনাপ্রলো ১০ই মোহরমের দিনই ঘটেছিল। আমরা যদি উমাইয়া রাজবংশকে সামান্য একটি প্রশ্ন করি যে, সবচেয়ে লেটেষ্ট নবি- এখনও দেড় হাজার বছর পূর্ণ হয় নি, সেই লেটেষ্ট নবির জন্মদিন কেন অনেকগুলো? ওহাবি ফেরকার মুসলমানেরা ৯ই রবিউল আউয়াল, আহলে সুন্নাতুল জাম্মাতের অনুসারীরা ১২ই রবিউল আউয়াল- এভাবে একেক ফেরকার অনুসারীরা মহানবির জন্মদিবসটি একেকদিন পালন করে। লেটেষ্ট নবির উন্মত বলে যারা দাবি করে তাঁদের এই সেদিনের জন্মদিবসের ঘটনাটি কেন অনেক রকম হয়?

এই রকমভাবে ইসলামের কত বিষয়ে যে কত রকম গাঁজাখুরি গাঁজামিল দিয়ে রাখা হয়েছে, সেই গাঁজামিল হতে সত্য বিষয়টি তুলে ধরা চাট্টিখানি কথা নয়। মনেপ্রাণে সত্য উদ্ধার করার পথে অগ্রসর হতে গেলে পদে পদে আপনাকে হোঁচট খেতে হবে। আজ ইসলামের অনেক বিষয় গাঁজামিলের আবরণে ঢেকে আছে।

আমি দেখেছি, মুসলিম সমাজে যারা জাঁদবেল ইসলাম-গবেষক বলে পরিচিত তারাও এই ১০ই মোহরমের ফজিলতটি বর্ণনা করেন। আমি অসহায় দৃষ্টিতে তাদের দিকে চেয়ে থাকি আর হিটলারের প্রচারমন্ত্রী ড. গোয়েবল্‌সের কথা বার বার মনে করি।

উমাইয়া রাজবংশ কি ইমাম হোসাইনের স্থিতি মুছে ফেলতে পেরেছে? এজিদ রাজ্যশাসন করেছে সত্য, সিংহাসনে বসেছে সত্য, খলিফা নামধারণ করেছে সত্য, নিজেকে মুমিনদের আমির বলে ঘোষণা করেছে সত্য, কিন্তু অধিকাংশ মুসলমান হৃদয় হতে এজিদের নামটি চিরতরে মুছে ফেলে দিয়েছে। পক্ষান্তরে ইমাম হোসাইন মুসলিম জাহানের খলিফা হতে পারেন নি সত্য, কিন্তু দুনিয়ার অধিকাংশ মুসলমান তাঁকে হৃদয়ের রাজা এবং রাজার রাজা রূপে বুকে ধারণ করে রেখেছে। কোনো মুসলমানই নিজের এবং আত্মীয়-পরিজনের নামটির শেষে এজিদ শব্দটি ব্যবহার করে না। যেমন জাহাঙ্গীর এজিদ, নাহিদ এজিদ, বেদম এজিদ, তারিক এজিদ, মহসিন এজিদ এইভাবে ব্যবহার করে না, বরং এজিদ শব্দটিকে একটি অপমানজনক গালি মনে করে। অথচ ইমাম হোসাইন এবং আওলাদে রসূলদের নামগুলো আজও মুসলমানেরা বুকে ধারণ করে রেখেছে। যেমন জাহাঙ্গীর হোসাইন, নাহিদ হাসান, বেদম হোসাইন, তারিক হাসান, মহসিন আলি ইত্যাদি। ইমাম হোসাইনের নাম মুসলমানের হৃদয়ে চির অমর হয়ে

আছে, আর এজিদের নাম ইতিহাসের ড্রেনে স্থান পেয়েছে। তাই খাজা বাবা বলেছেন : রাজা হোসাইন, রাজার রাজা হোসাইন। এই রাজা, এই রাজার রাজা বিষ্ঠ-বৈভব আর দুনিয়ার সিংহাসনে বসা রাজা নয়, বরং হৃদয় জয় করার অমর রাজা, অমর রাজার রাজা।

ইফতার

মহানবি বলেছেন যে, যে-ব্যক্তি সবচাইতে তাড়াতাড়ি ইফতার করতে পারেন সেই ব্যক্তিটি আল্লাহর কাছে সবচাইতে প্রিয় বান্দা। (হবহ উদ্ধৃত নয়)। মহানবির এই হাদিসটির ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে ওহাবি ফেরকার অনুসারী এবং তাদের চেলা-চামুণ্ডারা মহাফাঁপড়ে পড়ে যায়। কারণ ওহাবিরা অধ্যাত্মবাদকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করে। কোনো অবস্থাতেই ওহাবিদের লিখনিতে, ওহাবিদের চিন্তা-চেতনায় অধ্যাত্মবাদের বিন্দু-বিসর্গও স্থান পায় না। অন্যদিকে মহানবির আরেকটি হাদিস তুলে ধরলাম। মহানবি বলেছেন : একটি কালো সুতা যখন অন্ধকারের সঙ্গে মিলে যায় তথা একাকার হয়ে যায় তখন ইফতার করিও। (হবহ উদ্ধৃত নয়)। ইফতার মূলত দুই প্রকার : একটি মেজাজি ইফতার এবং অপরটি হাকিকি ইফতার। মেজাজি ইফতারে মেজাজি রোজার শেষে কিছু হালকা খাদ্য খেতে হয়, যেমন

খোরমা, খেজুর, কাঁচা বুট, সিদ্ধবুট, মুড়ি, তেলেভাজা, পেঁয়াজু, বেগুনি, ফুলুরি, আলুর চপ ইত্যাদি। মেজাজি রোজা রাখার পর এই মেজাজি ইফতারটি আজানের সঙ্গে সঙ্গে যে করে সে কেমন করে আল্লাহর সবচেয়ে প্রিয় বান্দা হতে পারে? এইখানে এবং এই ইফতার বিষয়টির উপর যে হাদিসটি আছে উহা একদম হাকিকি ইফতার সম্পর্কে। মানুষ যখন একটানা রোজা রেখে নিজের ভেতরের ছয়টি রিপুকে নিজের নিয়ন্ত্রণে আনতে পারে তখনই নিজের ভেতরের খান্নাসরুপী শয়তানটি বন্দী হয়ে যায়, তথা শৃঙ্খলে আবদ্ধ করা হয়, তথা শয়তানটিকে শিকল দিয়ে বেঁধে ফেলা হয়। ছয়টি রিপুর কাজকর্মগুলো তখন রোজাদারদের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে এসে যায়। দুনিয়ার বৈষয়িক জ্বালা-যন্ত্রণা তখন আর সাধকের কাছে ঠাঁকিঝুঁকি মারতে পারে না, কারণ খান্নাসরুপী শয়তান বন্দী হয়ে আছে সাধকের সিয়াম সাধনার মাধ্যমে। যেইমাত্র সাধকের আপন নফসের উপর ছয়টি রিপুর লেলিহান জিহ্বাগুলো চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায় এবং রোজাদারদের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে এসে যায় তখনই সেই সাধকের জন্য সেই সময়টিকে বলা হয় ইফতারের সময়।

এই ইফতারের সময়টি যে রোজাদারের জীবনে সবচেয়ে তাড়াতাড়ি আগমন করে সেই আগমনের সময়টিকেই বলা হয় সবচেয়ে তাড়াতাড়ি ইফতার

করা, এবং সবচেয়ে তাড়াতাড়ি যে রোজাদার এই ইফতার করতে পারেন তিনিই আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় বান্দা। তাই বলে মেজাজি ইফতারটিকেও কোনো অবস্থাতেই অবহেলা করা যায় না, কারণ মেজাজি দ্বিগুণ হাকিকির সন্ধান পাওয়া যায়, কারণ ঘোয়া দেখেই আগুনের সন্ধান পাওয়া যায়। সুতরাং মেজাজি ইফতারটি দেখা যায়, দেখা যায় রোজা রাখার পর খেজুর, মুড়ি এবং ডালভাজা, ফুলুরি জাতীয় খাদ্য গ্রহণ করতে, কিন্তু হাকিকি ইফতারটি দেখা যায় না, কারণ ইহা বিমূর্ত।

মূর্ত এবং বিমূর্ত যে-যে বিষয়ের সঙ্গে জড়িয়ে আছে সেই সেই বিষয়ের সঙ্গে অনেক রকম পুরস্কার পাবার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে, এমনকি স্পেশাল জান্নাত দেবার কথাটিও বলা হয়েছে, কিন্তু কোরান-এ একটিবারও বলা হয় নি যে, আল্লাহ রোজাদারদের সঙ্গে থাকেন তথা ‘ইন্নালাহা মা আস সায়েমিনা’ (নিশ্চয়ই আমি রোজাদারদের সাথে থাকি)। এ রকম একটি কোরান-এর আয়াতও আমি পাই নি (আমার জানা মতে)। মেজাজি রোজা এবং মেজাজি ইফতারের একমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যটি হলো রোজাদারদেরকে হাকিকি রোজা এবং হাকিকি ইফতার বুঝিয়ে দেওয়া।

রমজানের সময় আল্লাহ সমস্ত শয়তানদেরকে বেঁধে রাখেন যাতে দুনিয়াতে শান্তি বিরাজ করে। এই কথাটিও

ম্লেজাজি নয়, বরং হাকিকি। ম্লেজাজি শয়তানদেরকে যদি বেঁধেই ফেলা হয় তো দুনিয়াভর শান্তি বিরাজ করবার কথা। ঝগড়াঝাঁটি, মারামারি, খুনখারাপি জাতীয় বিষয়গুলোর গুরুঠাকুরই হলো শয়তান। এই শয়তানদেরকেই যদি বেঁধে ফেলা হয় তো দুনিয়াতে শান্তি বিরাজ করার কথা।

যাহা আছে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে তাহা আছে প্রত্যেকটি মানুষের মধ্যে এবং রোজাদারও একজন মানুষ এবং এই একটানা রোজার সাধনায় যখন রোজাদার লেগে থাকেন, তখন আল্লাহর বিশেষ রহমত পেয়ে ছয়টি রিপু অদৃশ্য শৃঙ্খলে বন্দী হয়ে যায়। ‘আমি’-র সঙ্গে শয়তান-ইবলিস-মরদুদ-খান্নাসগুলোর অবস্থানটি কারাগারের দেয়াল দেবার মতো সাধকের মধ্যে বন্দী হয়ে যায়। এই বন্দী অবস্থাটি যে রোজাদার সবচেয়ে তাড়াতাড়ি তৈরি করতে পারেন তাঁকেই বলা হয়েছে সবচাইতে তাড়াতাড়ি ইফতারকারী। একটি মানব দেহকেও রূপক ভাষায় তথা ম্লেজাজি ভাষায় বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বুঝানো হয়ে থাকে। তাই বলা হয়ে থাকে, যা আছে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে তা আছে মানব দেহে। রূপক ভাষায় ‘আর্দ’ বলতে পৃথিবী, মাটি এবং একটি মানব দেহকেও বুঝানো হয়ে থাকে। ‘সাম্মাওয়াতি’ বলতে যেমন আকাশকে বুঝানো হয়েছে তেমনি মানব মনটিকেও বুঝানো হয়েছে। এই জাতীয় শয়তানগুলো মানবের

মনের আকাশে বিরাজ করে বলেই ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করতে গিয়ে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়। কেননা আরবি ভাষাটি অত্যন্ত গরিব ভাষা। দুঃখ পেলেও ইহা একটি সত্য কথা। কারণ ‘দারবুন’ তথা পেটানো বা মারা শব্দটি একশত রকম অর্থে ব্যবহার করা হয়। সুতরাং একটি শব্দ দিয়ে যদি একশত রকম অর্থ বুঝানো হয়ে থাকে তো অনেক রকম ফেরকা হতেই পারে। একেকজন তাদের মনের মতো করে মিলিয়ে ব্যাখ্যা করে যায় এবং এই বিভিন্ন ব্যাখ্যায় বিভিন্ন মতবাদ দেখতে পাওয়া যায়। তাই আমরা ইতিহাসের পাতায় দেখতে পাই যে, খারেজিদের সঙ্গে যুদ্ধ করার আগে মাওলা আলি (আ.) নিজেই বলেছেন যে, খারেজিরা আমাদের কোরান-এর ব্যাখ্যাটি গ্রহণ না-ও করতে পারে। তাই তিনি যুক্তি-তর্কের মাধ্যমে সন্ধিতে উপনীত হতে আদেশ করেছেন। যে-সাধক তথা রোজাদারের জীবনে একবার হাকিকি ইফতারটি হয়ে গেছে তার জন্য বাকি জীবনটি ষড়রিপুর বন্ধনমুক্ত জীবন, তথা খান্নাসরুপী শয়তান-ইবলিশ-মরদুদমুক্ত জীবন। এই জীবনকেই বলা হয় আমিত্ববিহীন জীবন, এই জীবনকেই বলা হয় হান্দি-খুদি-অহম-ইগো বিদায় করে দেবার জীবন।

তাই তো আমরা জানতে পেরেছি যে, খাজা মঈনউদ্দিন হাসান চিশতি তাঁর প্রধান খলিফা

কুতুবউদ্দিন বখতিয়ার কাকি ও অন্যান্যদের এই বলে উপদেশ দিচ্ছেন যে, প্রথমে ইফতার করতে শেখো তা হলে বাকি জীবনটি তোমার রোজা। এই কথাগুলো কেউ বোঝে, কেউ বোঝে না। কেউ মেনে নেয়, কেউ মেনে নেয় না। মেনে নেওয়াটাও তকদির, না মেনে নেওয়াটাও তকদির। সুতরাং এই বিষয়টিতে কাকে দোষ দিতে যাবো?

কালো সুতা আঁধারের সঙ্গে একাকার হয়ে যাবার সময় ইফতার করার কথাটি এবং সবচেয়ে তাড়াতাড়ি ইফতার করার কথাটির মাঝে মিল খুঁজে পায় না বলেই সূর্য ডোবার সাথে সাথে ইফতার করার বিধানটিকে গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু শিয়া ফেরকায় কালো সুতা আঁধারে একাকার হয়ে না যাওয়া পর্যন্ত ইফতার করার বিধানটি রাখা হয় নি। আমরা দেখতে পাই, ব্যবহারিক জীবনের অনেক বিষয়েই চার মাজহাবের চার ইমাম একমত হতে পারেন নি। এই একমত না হবার দরুন যারা দুঃখ প্রকাশ করে এবং চার মাজহাবের চার ইমামকে সমালোচনা করে, আমি তাদেরকে বোকাই বলতে চাই।

কোরান-হাদিস-এ কোথাও এই চার মাজহাবের নামগন্ধটিও পাওয়া যায় না। তা হলে কি এই চার মাজহাব মানাটিকে অন্যায় বলতে চান? না, কখনই না। কারণ চার মাজহাবের চার ইমাম ব্যবহারিক জীবনের যে নিয়ম-পদ্ধতি দিয়ে গেছেন তাই কোরান-হাদিস হতেই দিয়ে গেছেন। একেক মাজহাব একেকটি

নিয়ম গ্রহণ করেছে, তাই বিভিন্নতা দেখতে পাই; আসলে বিভিন্নতার মাঝেই একের ঐক্যতান্ত্রিকতা লুকিয়ে আছে।

অনেকে তো চার মাজ্হাবকে চারটি বেদাত বলে মনে করে। ধরে নিলাম বেদাত তথা নববিধান, কিন্তু এ বেদাত সুন্দর বেদাত তথা ‘বেদাতে হাসানা’, কিন্তু খারাপ বেদাত তথা ‘বেদাতে সাইয়া’ নয়। দুনিয়াতে মানুষ যে নূতন নূতন ব্যবহারিক বিষয়গুলো আবিষ্কার করে যাচ্ছে মানব মঙ্গলের জন্য সেইগুলোও তো বেদাত, কিন্তু সুন্দর বেদাত তথা বেদাতে হাসানা। রেডিও, টেলিভিশন, সিডি, ভিসিডি, ভিডিও হতে টেলিগ্রাম, টেলিফোন মোবাইল ফোন এবং আধুনিক চিকিৎসার অভাবনীয় উন্নয়নগুলো তো সবই বেদাত, কিন্তু সুন্দর বেদাত তথা ‘বেদাতে হাসানা।’

সুফিবাদ সার্বজনীন

এখন আমরা একটি মারাত্মক বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে চাই। সেই মারাত্মক বিষয়টি নিয়ে অনেক রকম জটিলতা এবং বিভ্রান্তিতে পড়ে যাওয়ার সম্ভব ঝুঁকি থাকতে পারে। আর সেই বিষয়টি হলো ধর্মনিরপেক্ষতা। ইসলাম কি ধর্মনিরপেক্ষতাকে সমর্থন করে, না করে না? এই প্রশ্নটি অনেকের মনের মাঝে ঝুঁকিঝুঁকি মারে। মূল বিষয়টি বলা এবং প্রয়োগ-পদ্ধতির ব্যাখ্যা দেওয়া দুটো আলাদা বিষয়। আমরা এখন ইসলামের মূল বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে চাই।

সূরা এখলাসের ২ নম্বর আয়াতে আল্লাহ ঘোষণা করেছেন যে তিনিই ‘সামাদ আল্লাহ’। সামাদ শব্দটির

অর্থ হলো কারো মুখাপেক্ষী না হওয়া। এখানেও দু'টো প্রশ্ন এসে দাঁড়ায়। একটি হলো, তিনি ছাড়া আর কিছুই নাই, সুতরাং মুখাপেক্ষী হবার প্রশ্নটিই আসে না। আরেকটি হলো, সমগ্র সৃষ্টিজগত আল্লাহর সেফাত তথা গুণাবলি। আল্লাহর সেফাত আল্লাহ ইতে আলাদা নয়, বরং আল্লাহ ইতেই তার আগমন। সুতরাং জ্ঞাত তথা মূল কখনও সেফাত তথা গুণাবলির মুখাপেক্ষী হতেই পারে না। তা হলে সমস্ত বিষয়টি একটি আত্মবিরোধের ব্যুত্তি হয়ে দাঁড়ায়। সামাদ আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী নন। যিনি কারোরই মুখাপেক্ষী নন, তিনিই একমাত্র মহানিরপেক্ষ। আল্লাহকে যারা মানতে চায় না, আল্লাহকে যারা অস্বীকার করে তথা যারা নাস্তিক, তাদেরকেও আল্লাহ পাক তাঁর নেয়ামত হতে বঞ্চিত করেন না। আল্লাহ জ্ঞানেন যে একজন নাস্তিক খুব বেশি হলে শত বছর জীবিত থাকবে, তারপর মৃত্যু নামক ঘটনা দিয়ে তাকে রহস্যলোকে নিয়ে যাবে এবং তখনই শাস্তির মাত্রাটি সে বুঝতে পারবে।

আমভাবে আল্লাহ পাক সবাইকে যে নেয়ামতটি দান করেন সেই

দানের রূপটি হয় 'রহমান'। কিন্তু একজন সাধক যখন আল্লাহর

দিদার পাবার সাধনায় বছরের পর বছর ধ্যানমগ্ন অবস্থায় কাটিয়ে দেন

এবং এক সময় আল্লাহর যে নিয়ামতটি লাভ করেন, উহা বিশেষ

নেয়ামত তথা বিশেষ দান। নিজের ভেতর হতে খাল্লাসরূপী শয়তানটিকে তাড়িয়ে দেবার ধ্যানসাধনায় যখন আল্লাহর রহমতে সফল হতে পারেন তখনই সেই সাধকের কাছে আল্লাহ 'রহিম'-রূপ ধারণ করেন।

কারণ

কম্মার পরেই এই দানটি করা হয়। তাই আল্লাহ এখানে ‘গাফুরুর রহিম’। কম্মার পরে ‘গাফুরুর রহমান’ হয় না, কারণ রহমানরূপে সাধারণ দান, যাহা কমবেশি সবাই ভোগ করে থাকে। তাই আমরা দেখতে পাই,

কোরান-এ কোথাও (আমার জ্ঞান মতে) গাফুরুর রহমান কথাটি একবারও ব্যবহার করা হয় নি।

‘সাম্মাদ আল্লাহ’ মহানিরপেক্ষ। সুতরাং সাম্মাদ আল্লাহর বাণীগুলো মহানিরপেক্ষ। সুতরাং আল্লাহ পাক মহানিরপেক্ষ। মহান আল্লাহ পাকের মহানিরপেক্ষতা কখনই ভাঙা হয় না। তাই অন্যত্র বলা হয়েছে, ‘সুন্নাতাল্লাহে না তাবদীলা’ তথা ‘আল্লাহর আইন কখনও বদলায় না।’ আল্লাহ পাক যেখানে নিজেই ঘোষণা করছেন যে তিনি সাম্মাদ আল্লাহ তথা মহানিরপেক্ষ আল্লাহ সেইখানে তার বাণীগুলোও মহানিরপেক্ষ।

সুতরাং ধর্মনিরপেক্ষতাই ইসলামের মূলমন্ত্র।
ধর্মনিরপেক্ষতাই ইসলামের একমাত্র আদর্শ।

ধর্মান্ধতা, ধর্মের নামে গৌড়ামি ইসলামের আদর্শ কখনই হতে পারে না। সুতরাং ব্যবহারিক জীবনে চলার পথে ধর্মনিরপেক্ষতাই হলো ইসলামের একমাত্র আদর্শ। এই জ্বলন্ত সূর্যের মতো পরিষ্কার বিষয়টি নিয়ে কতো রকম যে উল্টাপাল্টা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা হয় এবং সেই ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের সিদ্ধান্তটিও ভুল হতে বাধ্য। অবশ্য এই বিষয়টির জন্য কাকেই বা দোষ দিতে যাব? যে যে-রকম বোঝে সে সেই রকম বলে এবং লিখে।

সুতরাং বিভিন্ন ভাবের বিভিন্ন প্রকাশগুলো মতবিরোধ তৈরি করে। এখান থেকেই ফেরকাবাজি শুরু হয়। যতই বলি না কেন : আল্লাহ এক, কাবা এক, মহানবি লাসানি তথা য়ার দ্বিতীয়টি নাই, কোরান এক, কিন্তু বিভিন্ন মতের বিভিন্ন ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের পরিণামে বিভিন্ন রকম ফেরকা এক ইসলামের মাঝে দেখতে পাই। এ জন্যই বা কাকে দোষ দেব?

‘লা ইকরাহা ফিদদীন’ তথা ‘দীনের মধ্যে কোনো প্রকার জোর জ্বরদস্তি নাই’ কোরান-এর এই মহামূল্যবান বাণীটি না তুললেও চলে। ‘লাকুম দীনুকুম অলইয়া দীন’ তথা, ‘তোমাদের দীন তোমাদের কাছে এবং আমার দীন আমার কাছে।’ এই বিষয়টি গবেষকদেরকে অনেক সময় ভাবিয়ে তোলে। বিদায় হজ্জের শেষ বাণীতে আল্লাহ পাক জিবরাইলের মাধ্যমে এবং মহানবির মাধ্যমে তথা দুইটা মাধ্যমে আমাদেরকে জানিয়ে দিলেন যে, ‘তোমাদের দীনকে আজ পরিপূর্ণ করিয়া দিলাম।’ (আল্লাহ সর্বশক্তিমান হয়েও দুই-দুইটি উসিলা তথা মাধ্যমে কোরানুল করিম-কে পাঠালেন। সর্বশক্তিমান হয়েও আল্লাহ পাকের দুইটি উসিলা গ্রহণের বিষয়টি আমাদের ভাবিয়ে তোলে।) আল্লাহর দীন সব সময় পূর্ণ থাকে সুতরাং পরিপূর্ণ করার প্রশ্নই আসে না। যেমন ‘লাকুম দীনুকুম’ তোমাদের দীনসমূহ তথা মানুষের রচিত অসংখ্য দীনের উপর আল্লাহর একমাত্র

দীনটি দিয়ে রাঙিয়ে নেবার আদেশটি দেওয়া হয়েছে। মানুষের অগনিত দীনের সঙ্গে আল্লাহর একমাত্র দীনটিকে রাঙিয়ে নিতে চাইলে ধ্যানসাধনা তথা মোরাকাবা-মোশাহেদা করতেই হবে।

মহানবি যে হেরাণ্ডহায় পনেরটি বছর ধ্যানসাধনা করেছেন, সেই ধ্যানসাধনাটি কখনই মহানবির নিজের জন্য নয়, কারণ প্রথম মানব আদম যখন মাটি ও পানিতে অবস্থান করছেন তখনও তিনি নবিই ছিলেন। জীবনযাপনের প্রতিটি বিষয়ের প্রতিটি ক্ষেত্রে যে বিধানগুলো তিনি দিয়ে গেছেন সেই পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধানটির দ্বারা আল্লাহর দীনে প্রবেশ করার অফুরন্ত নেয়ামত দান করে গেছেন। এইভাবে প্রতিটি বিষয়ে যে নিয়মকানুনগুলো দেওয়া হয়েছে, এমনকি ভাবতেও অবাক লাগে যে অতিসূক্ষ্ম একটি বিধান : যেমন পানির গ্লাশটি ডান হাত দিয়ে ধরবে-এরকমভাবে প্রতিটি বিষয়ের সূক্ষ্ম বিধানগুলো একটির পর একটি দিয়ে যাবার জ্বলন্ত উদাহরণটি আমরা দুই লক্ষ চব্বিশ হাজার নবির মধ্যে দেখতে পাই না। তাই তিনি মহানবি, বিশ্বনবি, সরকারে দোআলম, ইমামে কেবলা তাইনে, সিরাজুম মুনিরা, রহমাতুল্লিল আল আমিন-এরকমভাবে অনেক নামে তাঁকে ডাকা যায়।

সুরা নজমে বলা হয়েছে যে, মহানবি নিজের প্রবৃত্তি (?) হতে একটি কথাও বলেন নি, বরং আল্লাহ যা বলেছেন তাই তিনি বলে গেছেন। (হবহ উদ্ধৃত নয়)।

একটি প্রশ্ন রাখতে চাই আর সেই প্রশ্নটি হলো, কোরান-এর কোনো এক সুরাতে (আম্মার জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও সুরাটির নাম বললাম না) আল্লাহ পাক বলছেন যে আপনার আগের গুনাহসমূহ এবং পেছনের গুনাহসমূহ মাফ করে দিয়েছেন। শ্রদ্ধেয় ওহাবি ভাইয়েরা এই আয়াতটিকে মহানবির ওপর চাপিয়ে দিয়েছে। কিন্তু এই আয়াতটি মহানবির উম্মতদেরকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে। কারণ মহানবি কোনো কথাই আল্লাহর হুকুম ছাড়া বলেন নাই, এই কথাটি আগেই কোরান-এ বলা হয়েছে। সুতরাং মহানবির আগের গুনাহ এবং পরের গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়েছে কথাটি একটি মারাত্মক এবং ভয়ঙ্কর আত্মবিরোধী কথা।

আল্লাহ এক অথচ কোরান-এ অনেক স্থানে ‘আম্মরা’ তথা বহুবচন ব্যবহার করেছেন। বিশেষ করে রেজেক বণ্টন করার সময়ে, হেদায়েত করার সময়ে আল্লাহর ‘আম্মি’ শব্দটি না পেয়ে ‘আম্মরা’ শব্দটি অকের হিসাবের মতো পাবেন। তাই বলে কি বহু আল্লাহ বলতে যাব? (নাউজ্জবিল্লাহ)। ঠিক সে রকমভাবে আপনার আগের গুনাহ এবং পেছনের গুনাহগুলো মাফ করে দেওয়া হয়েছে কথাটি বহুবচনে ব্যবহার না করে একবচনে ব্যবহার করা হয়েছে। যেখানে মহানবি আল্লাহর হুকুম ছাড়া জীবনে একটি কথাও বলেন নি, সেইখানে গুনাহ করার প্রশ্নটি কেমন করে আসতে পারে? কেমন করে মানায়? বরং বিরাট একটি আত্মবিরোধের ব্যুড়ি দেখতে পাই। এই আত্মবিরোধের কারণেই যারা আন্তরিকভাবে আল্লাহকে জানতে চায়, বুঝতে চায়, চিনতে চায় তাদের পদে পদে হোঁচট খেতে হয়। এ যেন প্রতিটি ভুল, প্রতিটি হোঁচট, একেকটি মের্টার্টাইটিস ক্যান্সার।

বাতাস না থাকলে যেমন সাগর আর নদীতে ঢেউ থাকে না, সে রকম কাকের-মোনাফেক-মুশরিক এই জাতীয় ভেজাল মানুষ না থাকলে মোমিনদের পরিচয়টির সার্থকতা থাকে কোথায়? আল্লাহ কোরান-

এ বলছেন, যদি আমি ইচ্ছা করতাম তো এক নিম্নেষে সব মানুষকে এক উন্নত তথা মুসলমান বানিয়ে ফেলতে পারতাম। কিন্তু সবাইকে মুসলমান বানিয়ে ফেললে আমার পরীক্ষাটি আর থাকে না তথা ‘পরীক্ষা করার জন্যই দুনিয়াতে পাঠানো হলো’ কথাটির সার্থকতা থাকে না। (হবহ উদ্ধৃত নয়)। অন্ধকার আছে বলেই আলোর মূল্যায়ন, রাত আছে বলেই দিনের পরিচয়, ভেজাল আছে বলেই খাঁটির সন্ধান, অসাধু আছে বলেই সাধুর মর্যাদা, কান্না আছে বলেই হাসিটিকেও দেখতে পাই, দুঃখ-যাতনা আছে বলেই

আনন্দের মূল্যায়ন।

প্রতিটি শিশু আত্মসমর্পনের মোকামে তথা ঘরে জন্মগ্রহণ করে। কার কাছে আত্মসমর্পন? আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পন। আর যারা আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পন করেছে তারা ইসলাম ধর্মটিকে গ্রহণ করে নিয়েছে এবং তারাই মুসলমান। আত্মসমর্পনের পরেই শান্তি আসে। সুতরাং ইসলাম শব্দটির প্রথম অর্থটি হলো আত্মসমর্পন এবং পরের অর্থটি হলো শান্তি। সুতরাং জগতে যত মানবশিশুর আগমন হয়েছে, হচ্ছে এবং হবে—প্রতিটি শিশুই মুসলমান। শিশুর পিতা-মাতা শিশুটিকে ধীরে ধীরে পিতা-মাতার ধর্মের দিকে নিয়ে যায়। ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায়ই হোক, অবশেষে শিশুটি যখন পূর্ণ যৌবনে উপনীত হয় তখন আত্মসমর্পনের ধর্মটি হাতে ছুটে যেতে থাকে এবং পিতা-মাতার ধর্মটিকে গ্রহণ করে। পিতা-মাতার ধর্মের সাইনবোর্ডটি তখন ওই সন্তানটির কাঁধের উপর ঝুলতে থাকে।

দলগত দর্শনের ভিত্তিতে বলছি (হাকিকতে নয়) : হিন্দুর ঘরে জন্মগ্রহণ করা শিশুটি হিন্দু নয়, বরং মুসলমান; জৈন ধর্মের পিতা-মাতার ঘরের শিশুটি জৈন

ধর্মের অনুসারী নয়, বরং মুসলমান; পার্শী ধর্মের পিতা-মাতার ঘরে জন্মগ্রহণ করা শিশুটি পার্শী নয়, বরং মুসলমান; বৌদ্ধ ধর্মের পিতা-মাতার ঘরে জন্মগ্রহণ করা সন্তানটি বৌদ্ধ নয়, বরং মুসলমান; খ্রিস্টান ধর্মের অনুসারী পিতা-মাতার ঘরে জন্মগ্রহণ করা শিশুটি খ্রিস্টান নয়, বরং মুসলমান; ইহুদি ধর্মের অনুসারী পিতা-মাতার ঘরে জন্মগ্রহণ করা শিশুটি ইহুদি নয়, বরং মুসলমান; সাবাইয়া ধর্মের অনুসারী পিতা-মাতার ঘরে জন্মগ্রহণ করা শিশুটি সাবাইয়া নয়, বরং মুসলমান; কনফুসিয়াস ধর্মের অনুসারী পিতা-মাতার ঘরে জন্মগ্রহণ করা শিশুটি কনফুসিয়াস নয়, বরং মুসলমান; তাও ধর্মের অনুসারী পিতা-মাতার ঘরে জন্মগ্রহণ করা শিশুটি তাও নয়, বরং মুসলমান; মানী ধর্মের অনুসারী পিতা-মাতার ঘরে জন্মগ্রহণ করা শিশুটি মানী নয়, বরং মুসলমান; মং ধর্মের অনুসারী পিতা-মাতার ঘরে জন্মগ্রহণ করা শিশুটি মং নয়, বরং মুসলমান; শিখ ধর্মের অনুসারী পিতা-মাতার ঘরে জন্মগ্রহণ করা শিশুটি শিখ নয়, বরং মুসলমান—এ রকমভাবে ছোট ছোট ধর্ম যেমন দেলমাদিল, আকা, দপলা, মিসমি এবং কোনো ধর্ম না-মানা পিতা-মাতার ঘরে জন্মগ্রহণ করা শিশুটি কোনো ধর্মেরই অনুসারী নয়, বরং মুসলমান। মুসলমান পিতা-মাতার ঘরে জন্মগ্রহণ করেছে যদি যোর্বনে আল্লাহতে আত্মসমর্পন না করে তা হলে মুসলমান পিতা-মাতার ঘরে জন্মগ্রহণ করেছে সে মোটেও মুসলমান নয়। এ বড় সাম্প্রতিক কথা। এ বড়ই নিরপেক্ষ কথা। এ বড়ই অপ্রিয় কথা। কিন্তু অপ্রিয় হলেও কথাটি একটি তেতো উলঙ্গ সত্যকথা। কেউ মানবে, কেউ মানবে না। মানাটাও তকদির, না-মানাটাও তকদির। সুতরাং বিশালতার প্রশ্নে, ব্যাপকতার প্রশ্নে কাকে দোষারোপ করতে যাব? তাই কোরান বিশ্বের মানবজাতিকে আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পন করার দাওয়াত দিচ্ছে। কেউ আল্লাহর দাওয়াত গ্রহণ করে, কেউ করে না। এই নেগেটিভ ও পজিটিভের খেলাটি মহাকালের কোন প্রান্তে যেয়ে শেষ হবে আমি জানি না।

আজ এই অত্যাধুনিক যুগে তথা আলট্রামডার্ন যুগে মানুষ কিছুটা হলেও সার্বজনীনতার পাশে গণ্ডির কুপমণ্ডুকতার বিশ্রী রূপগুলো কিছু না কিছু ধরতে পারে। সুতরাং আধুনিক বিজ্ঞান সত্য বোঝার সহায়ক, বিরোধী মোটেই নয়। গোত্রপ্রীতির অর্থ গণ্ডিতে অবস্থান করা বলে কোরান ঘোষণা দিয়েছে।

মহানিরপেক্ষ আল্লাহর বাণী যেমন মহানিরপেক্ষ তেমনিই আল্লাহর ধর্মটিও মহানিরপেক্ষ। মুসলমানের গৃহে জন্মগ্রহণ করলেই মুসলমান হয় না, বরং আল্লাহর দীনে আত্মসমর্পণ করতে পারলেই হয় সত্যিকার মুসলমান। তাই আমরা দেখতে পাই এই ধরণীর বুকে এই রকম খাঁটি মুসলমান কমই পাওয়া যায়।

একজন মানুষ যখন আল্লাহর ধর্ম ইসলামে সম্পূর্ণরূপে তথা পরিপূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করে ফেলেন তথা চরম পর্যায়ে আল্লাহর মাঝে ডুবে ফানাফিল্লাহ হয়ে যান তখন সেই ফানাফিল্লাহর মানুষটির জিস্মা আল্লাহর জিস্মাতে পরিণত হয়। তখন সেই বান্দার জিস্মা দিয়ে আল্লাহ কথা বলেন, সেই বান্দার কান দিয়ে আল্লাহ কথা শোনে, সেই বান্দার চোখ দিয়ে আল্লাহ দেখেন, সেই বান্দার হাত দিয়ে আল্লাহ কাজ করেন। ‘সামাদ’-রূপী আল্লাহ যে রকম মহানিরপেক্ষ, সেই বান্দাটির মাঝেও মহানিরপেক্ষতার নিয়ামত ফুটে ওঠে। ঐরাই আল্লাহর ওলি, গাউস, কুতুব, আবদাল, আরিফ, মুনি, খাম্বি, সেইন্ট, জিন্ননোসোফিস্ট-ইত্যাদি। ঐদেরকেই সুফি বলা হয়। এবং ঐরাই পরিপূর্ণ সার্বজনীন এবং মহানিরপেক্ষ। কারণ ঐরা আল্লাহর গুণে গুণাবিত। ঐরা সবাই মুসলমান, কিন্তু তারচেয়েও বড় পরিচয় হলো এরা

আল্লাহর ওলি। এই ওলিদেরকেই সুফি বলা হয় এবং এই ওলিদের কথাবার্তা, ধ্যানসাধনা, মোরাকাবা-মোশাহেদার পথে কেমন করে অগ্রসর হওয়া যায় সেই পথগুলোর নাম হলো সুফিবাদ। সুতরাং আদিতে সুফিবাদ, মাঝখানে সুফিবাদ, শেষে সুফিবাদ এবং মহাকালের সর্বাবস্থায় সুফিবাদ।

হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গাজ্জালি তাঁর রচিত অমর গ্রন্থ এহিয়ায়ে উলুম উদ্দিন-এ বলে গেছেন, সুফিবাদের পথে এগিয়ে যাওয়া বড়ই কষ্টকর। নিম্নে গাভিবোম্বা বিস্ফোরণ করে আত্মাহুতি দেওয়া যতটুকু সহজ, নির্জনে একাকী একটি ঘর অথবা গুহাতে অথবা অন্য যে কোনো নির্জন স্থানে পনেরটি বছর ধ্যানসাধনা করাটিক ততটুকু কঠিন। তাই এক ওলি বলে গেছেন : জীবন দেওয়া যত সহজ আল্লাহকে পাবার পথের সাধনাটিক ততটুকু কঠিন।

জেহাদ বনাম যুদ্ধ

তিলে তিলে নিজের ভেতরে অবস্থিত খান্নাসরূপী শয়তানকে তাড়িয়ে দেবার ধ্যানসাধনার নামই হলো জেহাদে আকবর, জেহাদে কবির। মানুষের একটি স্বভাব হলো, সে অন্যের দোষত্রুটিগুলো গলা টান দিয়ে ধরে এবং নিজের দোষত্রুটিগুলো খুব কমই দেখতে পায়। তলোয়ার আর অস্ত্রের জেহাদে নিম্নেষেই শহিদ হওয়া যায়, তাই এই শহিদের মর্যাদাটি জেহাদে সগির তথা

ছোট জেহাদ, তাও একটি শর্ত জুড়ে দেওয়া হয়েছে, আর সেই শর্তটির নাম হলো ‘ফি সাবিলিল্লাহ’, তথা আল্লাহর পথে যদি না হয় তা হলে তাকে জেহাদ বলা যাবে না। উহা হবে নিরৈট যুদ্ধ। জেহাদ এবং যুদ্ধের মাঝে আকাশ-পাতাল ব্যবধান। ইতিহাস হতে দেখতে পাই, অনেক যুদ্ধকে ফতোয়া দিয়ে জেহাদ নাম দেওয়া হয়েছে, আবার অনেকে যুদ্ধ বলেছেন।

মাওলা আলি এবং আমির মোয়াবিয়ার মধ্যে যে ভয়াবহ সিফফিনের যুদ্ধটি হয়েছিল উহাতে উভয় পক্ষেই মহানবির সাহাবারা ছিলেন। তবে বেশিরভাগ ইতিহাসবিদ এবং ইসলাম গবেষক আলির পক্ষটিকেই সমর্থন করেছেন। কারণ এই যুদ্ধে মহানবির জুঝা মোবারক পাওয়া তাবেয়িন হজরত ওয়ায়েস করনি মাওলা আলির পক্ষ নিয়ে যুদ্ধ করে দ্বিখণ্ডিত হয়েছিলেন। মাওলা আলির পক্ষে যুদ্ধ করে আসহাবে সুফ্যার জলিল কদরের সাহাবা এবং বহু হাদিস বর্ণনাকারী হজরত আবু হুরায়রাও শহিদ হয়েছেন। এরকমভাবে অনেক সাহাবা আলির পক্ষে যুদ্ধ করে শাহাদাত বরণ করেছেন। যদিও মহানবি বলেছেন, ‘যে মাওলা আলির বিরুদ্ধে অস্বধারণ করে সে মহানবির বিরুদ্ধে অস্বধারণ করে, আর যে মহানবির বিরুদ্ধে অস্বধারণ করে সে আল্লাহর বিরুদ্ধে অস্বধারণ করে।’ মহানবি বলেছেন ‘আমি যার মাওলা, আলিও তার

মাওলা।’ মহানবি বলেছেন, ‘আলি হতে যে মুখ ফিরিয়ে নিলো, সে আম্মা হতে (মহানবি) মুখ ফিরিয়ে নিলো।’ মহানবি বলেছেন ‘আম্মি (মহানবি) জ্ঞানের শহর এবং আলি তার একমাত্র দরজা।’ মহানবি বলেছেন, ‘আলির মূল্য আমার কাছে সেই রকম, যে রকম মানুষের দেহের উপর মাথাটির মূল্য।’ মহানবি বলেছেন, ‘আলির মূল্য আমার কাছে সে রকম, যে রকম দেহের মধ্যে প্রাণের মূল্য।’ (উদ্ধৃতিগুলো হুবহু নয়)। এ রকমভাবে অনেক উদাহরণ তুলে ধরা যায়।

ইতিহাসে ঘটে যাওয়া আরেকটি বেদনাদায়ক যুদ্ধের কথাটি আমরা জানতে পারি। সেই যুদ্ধটির একদিকে মহানবির স্ত্রী এবং মুসলমানদের অবিসংবাদিত মাতা তথা মা মেনে নিতেই হবে, অন্যথায় যে মানবে না সে কাফের-সেই মুসলমানদের মা, হজরত আবু বকর সিদ্দিকের কন্যা, মা আয়েশা (রা.) এবং অন্যপক্ষে মহানবির জামাতা মাওলা আলি (আ.)। সেই যুদ্ধটির নাম হলো জঙ্গ জাম্মাল তথা উটের যুদ্ধ। এই বিষয়টিতে অধম লিখকের কোনো মন্তব্য নাই, কারণ একদিকে মাওলা আলি, অপর দিকে মুসলমানদের মাতা, ইহা আল্লাহর কোরান-ই ঘোষণা করেছে। সুতরাং যত যুক্তিতর্ক, আইনের চুলচেরা বিশ্লেষণই থাক না কেন, যেখানে মহানবির স্ত্রীদেরকে কোরান মাতা বলে ঘোষণা করেছে সেখানে কোনো প্রকার মন্তব্য করা মোটেই সমীচীন নয়। এই নাজুক জায়গায় সর্বপ্রকার যুক্তিতর্কের লাগাম টেনে ধরতে হবে, খামিয়ে দিতে হবে সমস্ত প্রশ্ন। শত জিজ্ঞাসার কবর দিতে হবে এখানে। কারণ যুক্তির কবরের উপরেই ভালোবাসার ফুল ফুটে ওঠে। এই জঙ্গ জাম্মাল নামক নাজুক যুদ্ধটি বিচার-বিশ্লেষণ করতে গিয়ে অনেকের পা পিঁছলিয়ে যায়। পল্লবপ্রাচিত্যের আশ্ফালনে ফেটে পড়ে।

গৈরিক দাবদাহের মতো অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বেরিয়ে আসতে চায়। এই নাজুক যুদ্ধটি যুক্তি আর ভালোবাসার কোনটিতে দাঁড়িয়ে আছে সেটারই পরীক্ষা করার জন্য সংঘটিত হয়েছিল।

ওহদের যুদ্ধে মহানবির দাঁত শহিদ হয়েছিল। কিন্তু কোনো সাহাবাই তো সেই নির্দিষ্ট দাঁত দু'টো ভেঙে ফেলেন নি। কিন্তু মহানবির প্রেমিক হজরত ওয়ায়েস করনি একটি একটি করে সবগুলো দাঁত ভেঙে ফেলেছিলেন। পাকিস্তানের লাহোরে অবস্থিত শাহজাহান মসজিদের গেইটের উপর যে বড় ঘরটি বানানো হয়েছে সেই ঘরেই হজরত ওয়ায়েস করনির একটি পাথর-দিয়ে-ভেঙে ফেলা দাঁত আমরা দেখতে পাই। সেখানে পাক পাকাতনের অনেকগুলো ব্যবহারের জিনিস সযতনে রাখা হয়েছে। আওলাদে রসুলের এবং মহানবির ব্যবহার করা জিনিসপত্রের সঙ্গে কোনো সাহাবারই কোনো ব্যবহার করা জিনিস আমরা সেখানে দেখতে পাই না, একমাত্র তাবেয়িন এবং মহানবির প্রেমিক হজরত ওয়ায়েস করনির একটি পাথরের আঘাতে ভেঙে ফেলা দাঁতটি আমরা দেখতে পাই।

ওহদের যুদ্ধে মহানবির গণ্ডদেশ হতে যে রক্ত ঝরেছিল সেই পবিত্র রক্ত মোবারক দু'হাত বাড়িয়ে পান করেছিলেন সাহাবা সিনান ইবনে মালিক (রা.)। মহানবি এই পান করার দৃশ্যটি দেখে বলেছিলেন, 'আমার রক্ত যার দেহে অবস্থান করে তার জন্য দোজখ

হারাম।’ অথচ শরিয়তের দৃষ্টিতে রক্তপান করার কোনো বিধান নাই। হজরত উমর ফারুক (রা.) যখন ইসলাম গ্রহণ করে মুসলমান হয়েছেন তখন তাঁর আনন্দে আত্মহারা হয়ে নাচতে নাচতে চলে যাওয়ার বিধানটি শরিয়তে আছে কিনা আমার জ্ঞান নাই। যুক্তিতর্ক দিয়ে সত্যকে প্রায় ক্রেড়েই উদ্ধার করা যায়, আবার অনেক সময় বিভ্রান্তও হতে হয়।

ইহুদি মোল্লা-মুফতিরা যিশুখ্রিস্টকে শুলীতে চড়িয়ে বলেছিল, ‘তুমি মৃতকে জীবিত করতে পারো এটার সাক্ষী তো আমরা নিজেরাই। কিন্তু আমাদের দেওয়া শুলী হতে যদি বেরিয়ে আসতে পারো তবেই ধরে নেবো তুমি আসল নবি।’ যিশুখ্রিস্ট শুলী হতে বেরিয়ে আসেন নি। শুলী হতে বেরিয়ে আসলেই ইহুদি মোল্লা-মুফতিরা সবাই মুসলমান হয়ে যেত এবং ‘আমি তোমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য দুনিয়াতে পাঠিয়েছি’— এই কথাটির মূল্য অনেকখানি হালকা হয়ে যেত।

ধর্মের মূল সত্য

কয়েকটি শব্দ নয়, মাত্র কয়েকটি অক্ষর, মাত্র সাতটি অক্ষর। সেই সাতটি অক্ষরের নাম হলো : সা, বে, গা, মা, পা, ধা, নি, সী। আমরা অবাক হই, আমরা বিস্ময়ে অভিভূত হই যখন সঙ্গীতের জাদুরেল ওস্তাদের

বলেন যে, পৃথিবীতে আদিকাল হতে শুরু হয়ে যতদিন গান থাকবে, যতদিন যত প্রকার গান গাইবে, সব গানগুলো এই সাতটি অক্ষরে বাঁধা আছে। এই সাতপাকে বেঁধে দেওয়ার বাহিরে পৃথিবীতে কোনো গান নাই, থাকে না এবং থাকবেও না।

বিশ্ববিখ্যাত গায়ক প্যাটবুন, নাটকিং, এলভিস প্রিসলি, মাইকেল জ্যাকসন, ম্যাডোনা, এলটন জন, উস্লে কুলসুম, আবদুহ, সামিরা তৌফিক, চ্যাং ফ্যাং দি, নাজাকাত আলি, সালামত আলি, গোলাম আলি, ভীমসেন যোশি, যশরাজ, সুরাইয়া, নুরজাহান, কুন্দনলাল সায়গল, মুকেশ, রফি, লতা মুঙ্গেশকর, তালাত মাহমুদ, মেহেদী হাসান, হেমন্ত, সতীনাথ, সন্ধ্যা, সাবিনা ইত্যাদি বহু গায়ক আর গায়িকা যত প্রকার গান গেয়েছেন সবগুলো গানই এই সাতপাকে বাঁধা। এই সাতপাকের বাহিরে গান নাই।

পৃথিবীর প্রতিটি বিষয় এই রকম নির্দিষ্ট কয়েকটি ছকে বাঁধা থাকে। ধর্মের প্রশ্নে আমি তথা নফস, আল্লাহ তথা পরমাত্মা আর খান্নাসরুপী শয়তান— এই তিনজনের খেলাই চলছে জগতময়। এই তিনজনের খেলা ছাড়া আর কোনো খেলা নাই।

ধর্মের মূল বিষয়টিই হলো, আমি তথা নফস তথা জীবাত্মার মাঝে যে খান্নাসরুপী শয়তানটিকে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে পরীক্ষা করার জন্য, উহাকে বাহির করে দেওয়া। মহানবি বলেছেন, ‘যে তার নফসকে চিনতে

পেরেছে সে তার রবকে তথা আল্লাহকে চিনতে পেরেছে।' এখানে চিনতে পারে বা পারবে বলা হয় নি, বরং অতীত কালটি ব্যবহার করা হয়েছে।

এক জীবনে যদি নিজেকে তথা নফসকে চিনতে না পারে তা হলে কেয়ামতের পর আবার চেনার চেষ্টা চলতে থাকবে। যতদিন পর্যন্ত আমি তথা নফসটি রব তথা আল্লাহর পরিচয়টি জ্ঞানতে না পারবে ততদিন পর্যন্ত কেয়ামতের পর কেয়ামত ঘটতে থাকবে। কেয়ামত দুই প্রকার : একটি বড় কেয়ামত, অপরটি ছোট কেয়ামত। আল্লাহর সৃষ্টিরাজ্য তথা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যেদিন ভেঙে চূড়ে একাকার হয়ে যাবে উহাকেই বলা হয় বড় কেয়ামত তথা কেয়ামতে কবির। আর অপরদিকে মানুষের মৃত্যু-ঘটনাটিও একটি কেয়ামত। মৃত্যু-ঘটনা নামক কেয়ামতটির নাম হলো কেয়ামতে সগিরা তথা ছোট কেয়ামত। কেয়ামতের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিটি মানুষকে আবার উঠানো হবে। এই কথাটির গোপন রহস্য কেউ বুঝতে পারে, কেউ বুঝতে পারে না। বোঝাটাও তকদির, না বোঝাটাও তকদির। এই তকদিরের অতীব সূক্ষ্ম সুতাটি, যে সুতার বন্ধনে দুনিয়ার মঞ্চে পুতুলের মতো নেচে চলছি, সেই সুতোটি দেখতে পাই না। এই সুতোটির একেক ধর্মে, একেক ভাষায়, একেক রকম নাম দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ কোরান-এ বলেছেন যে, এমন কোনো জাতি, এমন কোনো সম্প্রদায় নাই যেখানে

আমরা নবি-রসুল সেই জাতির নিজস্ব ভাষায় আল্লাহর নিদর্শনসমূহ বর্ণনা ও ব্যাখ্যা করার জন্য পাঠাই নি। (হবহ উদ্ধৃত নয়)।

অখণ্ড বিশাল ভারতে এত জাতি, এত সম্প্রদায় দেখতে পাই, কিন্তু নবি-রসুলদের পরিচয়গুলো জানতে পারি না। যদি বলা হয়, অখণ্ড বিশাল ভারতে এত জাতি, এত সম্প্রদায়ের মাঝে কোনো নবি-রসুল পাঠানো হয় নি, তা হলে কোরান-এর সুরা ইব্রাহিম-এ বর্ণিত বাণীগুলোর কী জবাব দেওয়া যায়?

জ্ঞানীর নামধারণ করে যারা অজ্ঞানী তারাই ধর্মের বিশালতায়, ধর্মের সার্বজনীনতায় বিরাট বিরাট দেয়াল, বিরাট বিরাট প্রাচীর দাঁড় করিয়ে রেখেছে। সত্যসাগরে কেউ যদি অবগাহন করবার ইচ্ছা পোষণ করে তা হলে এই দেয়ালগুলো যেন মাছ ধরার অদৃশ্য কারেন্টজাল।

সেনেগগ, পাদ্রী-পোপ, পাণ্ডা-পুরোহিত, মোল্লা-মুফতি, পীর-সাজা পীর-ফকির, সাধু-সাজা সাধু এতগুলো কারেন্ট জালের মতো প্রাচীর ডিঙিয়ে গিয়ে সত্যসাগরে অবগাহন করা মোটেই চাটুখানি কথা নয়। তাই আমরা দেখতে পাই, আগের দিনের মুনি-ঋষিরা, আগের দিনের সেইন্ট-জিমনোসফিস্টরা, আগের দিনের পীর-ফকিরেরা পাহাড়-পর্বতে, জঙ্গলে, নদীর কূলে,

নির্জনে ঘর বানিয়ে অথবা গুহায় দিবানিশি ধ্যানসাধনা করে গেছেন। কেউ দশ বছর, কেউ বারো বছর, কেউ পনের বছর, কেউ তেইশ বছর। এমনকি কেউ উনত্রিশ বছর পর্যন্ত ধ্যানসাধনা করে গেছেন, যেটাকে আমরা আরবি ভাষায় মোরাকাবা-মোশাহেদা বলি। এই ধ্যানসাধনা তথা মোরাকাবা-মোশাহেদা ছাড়া নিজের ভেতর মিশে থাকা খান্নাসরূপী শয়তানটিকে তাড়িয়ে দেবার ব্যবস্থাপত্রটি অধম লিখকের জ্ঞানা নাই।

‘পাথরের আঘাত খাওয়া শয়তান হতে আশ্রয় চাইছি’— হাজার বার পড়লেও শয়তান আমাদের ছেড়ে দেবে না। তখনই শয়তানের বিদায়ঘণ্টা বাজতে শুরু করে দেয় যখন একজন সাধক মাসের পর মাস, বছরের পর বছর ধ্যানসাধনায় নিজেকে ডুবিয়ে রাখে। শয়তান হতে আশ্রয় চাই—মুখে বলাটা মেজাজি এবং শয়তানকে তাড়িয়ে দেবার ধ্যানসাধনাটি হলো হাকিকি। দুইটিরই প্রয়োজন আছে। মেজাজি ধাক্কা দিয়ে নিয়ে যায় হাকিকতে। তবে সবাইকে নয়, তকদিরে লেখা থাকলেই ধাক্কা খেতে হবে। সুতরাং প্রতিটি বিষয়ের মেজাজি রূপটিকে যারা অস্বীকার করতে চায় তারা বোকার দেশে বাস করে। (আবদাল এবং মাজ্জুবদের বেলায় প্রযোজ্য নয়)।

উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের ওস্তাদ ভীমসেন যোশী রঙচঙের বহু রকম কুস্তি দেখিয়ে গেয়ে চলেন, তখন মনে হয় উনি

বোধ হয় সাতপাকের বাঁধনটি ছিন্ন করে বেরিয়ে গেছেন। শ্রোতার মনে করাটি স্বাভাবিক, কারণ ভীমসেন যোশীর মতো গায়ক ভারতে আজ পর্যন্ত একটিও জন্মগ্রহণ করেন নি। গান শেষ হবার পর ওস্তাদ ভীমসেন যোশীকে বিনয়ের সঙ্গে একটু প্রশ্ন করেই দেখুন না যে, আপনার এই ব্যাপক-বিশাল-বিস্তৃত গানটিও কি সাতপাকেই বাঁধা? ওস্তাদ ভীমসেন যোশী ছোট্ট একটি উত্তর দেবেন : ‘হ্যাঁ’। হয়তো আপনি কথাটি শুনে চমকে যাবেন, অবাক হবেন, অনেক কিছু ভাবতে পারেন, কিন্তু সত্য অপ্রিয় হলেও সত্য যে, সব সঙ্গীতই সাতপাকে বাঁধা।

প্রতিটি ধর্ম বিষয়ের উপর মোটামোটা বহু বই রচিত হয়েছে; প্রকারভেদে কোনো ধর্মে বেশি, কোনো ধর্মে কম। কিন্তু সব ধর্মের মূল কথাটি হলো : নিজের ভেতর হতে খান্নাসরুপী শয়তানটিকে তাড়িয়ে দাও, মরদুদকে বের করে দাও, মায়ার বন্ধনকে ছিন্ন করো, কামনার কুয়াশা হতে মুক্ত হও— ইত্যাদি। যদি কেউ আল্লাহর ওলিকে প্রশ্ন করে যে ধর্মের এত বিশাল কথাগুলোর শেষ কথাটিই কি এই একটি কথা? উত্তরটি আসবে, ‘হ্যাঁ।’

নবি বড়, না রসুল বড়?

আমরা এখন একটি নাজুক বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে চাই। সেই নাজুক বিষয়টি হলো, নবি বড় না রসূল বড়? নবি এবং রসূলের মধ্যে যত বড় পার্থক্যই থাক না কেন, আমরা কোনো বিশ্ববিখ্যাত ঔলিকে রসূল বলতে যাব না। সমাজের প্রচলিত ধারার উপরে মানুষের যে মন ও মানসিকতার দর্শনটি দাঁড়িয়ে আছে উহার উপর কোনো কর্তৃত্ব প্রকাশ করার অভিলাষ আমাদের নাই। আমরা শুধু গবেষণার দৃষ্টিভঙ্গিতে কোরান কী বলছে তারই সামান্য কিছু কথা তুলে ধরতে চাই।

আন্তরিক গবেষণা করতে গিয়ে যদি অনিচ্ছাকৃত ভুলত্রুটি হয়ে যায় তার জন্যে প্রথমেই করজোড়ে ক্ষমাপ্রার্থনা করছি। আমরা কোরান-এর সূরা ফাতিরের প্রথম আয়াতেই দেখতে পাই যে ফেরেশতাদের থেকেই রসূল নির্বাচন করা হয় তথা বানানো হয়। প্রথম আয়াতটি ভালো করে পড়ে দেখুন, সেখানে কেবলমাত্র ফেরেশতাদেরকেই রসূল বানাবার কথাটি বলা হয়েছে। প্রথম আয়াতটিতে রসূল বানানোর প্রশ্নে মানুষের নামগন্ধটিও পাওয়া যায় না। অথচ ফেরেশতাদের নফসও নাই, রুহও নাই। ফেরেশতারা নির্বাচন করার ক্ষমতা হতে সম্পূর্ণ বঞ্চিত। ফেরেশতাদেরকে সীমিত স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি দেওয়া হয় নি। সীমিত ইচ্ছাশক্তি ও স্বাধীনতা দেবার প্রশ্নটি আসলেই নফস ও রুহের প্রশ্নটি

এসে যায়। অথচ ফেরেশতাদেরকে নফসও দেওয়া হয় নি, রুহও দেওয়া হয় নি। ফেরেশতারা হলো আল্লাহর সেফাতি নুরের তথা গুণগত নুরের তৈরি। তাই এক কথায় বলা যায় যে, ফেরেশতারা হলো সেফাতি নুরের তৈরি নফস-ও রুহ-বর্জিত একপ্রকার পবিত্র চাবি-মারী রোবট (?)। ফেরেশতারা যা ইচ্ছা তাই করতে পারে না এবং করার অধিকারটি তাদের দেওয়া হয় নি এবং করার বিধানটিও রাখা হয় নি। জিনজাতি এবং মানবজাতির সর্বকল্যাণের জন্য তথা ভালো করার জন্য ফেরেশতাদেরকে তৈরি করা হয়েছে। এক কথায়, ফেরেশতারা হলো মানবজাতির সেবক (জিনজাতির কথাটি আনলাম না)।

শক্তিশালী রাতে সাধক যখন রুহকে জাগ্রত করে ফেলেন সেই জাগ্রত অবস্থাটির নাম হলো রুহ নাজেল করা। এই রুহ যখন সাধকের নফসের উপর জাগ্রত হয় তখন খান্নাসরূপী শয়তানের অবস্থানটি আর থাকে না, এবং ফেরেশতাদেরকেও সেই শক্তিশালী রাতে নাজেল করা হয়। অথচ কোরান-এর সুরা ফাতিরের প্রথমেই বলা হয়েছে যে ফেরেশতাদের থেকে আমি রসূল নির্বাচিত করি। রসূল নির্বাচন করার প্রশ্নে এই পুরো আয়াতটিতে একটিবারও বলা হয় নি যে মানুষের থেকেও রসূল নির্বাচন করা হয়। আবার আমরা পরক্ষণে দেখতে পাই, কোরান-এর সুরা হজের পঁচাত্তর

নব্ব্বর আয়াতে আল্লাহ বলছেন যে, আমি ফেরেশতাদের থেকে এবং মানবজাতি হতে রসূল নির্বাচিত করি। এই আয়াতে ফেরেশতাদের সঙ্গে মানবজাতিকেও দেখতে পাই রসূল নির্বাচনের প্রশ্নে। এই আয়াতে ফেরেশতাদের হতে একচেটিয়া রসূল নির্বাচনের কথাটি বলা হয় নি, বরং ফেরেশতা এবং মানবজাতি হতে রসূল নির্বাচনের কথাটি বলা হয়েছে। আবার কোরান-এর

সূরা আনকাবুতের একত্রিশ নব্ব্বর আয়াতে বলা হয়েছে যে, নবি ইব্রাহিমের (আ.) সঙ্গে অনেক ফেরেশতাকে রসূলরূপে পাঠানো হয়েছে। এখানে একটি বিষয় ভালো করে লক্ষ করলেই পরিষ্কার বুঝা যায় যে, কোনো ফেরেশতাকেই নবি বানানো হয় নি অথবা নবিরূপে নির্বাচন করা হয় নি। সমগ্র কোরান-এর একটি আয়াতেও আমরা দেখতে পাই না যে, কোনো ফেরেশতাকে নবিরূপে নির্বাচিত করা হয়েছে (অবশ্য আমার জ্ঞান মতে)।

নবি কথাটি আসলেই মানবজাতির কথাটি আসে। রসূল কথাটি আসলেই মানবজাতি এবং ফেরেশতাদের কথাটি আসতে দেখি। কোরান-এর যেখানেই ফেরেশতা রসূল হয় সেখানে মানুষকেও রসূলরূপে নির্বাচন করার কথাটি দেখতে পাই। পরক্ষণে নবি নির্বাচন করার প্রশ্নে কেবলমাত্র মানবজাতি হতে নির্বাচন করার কথাটি দেখতে পাই। নবি নির্বাচনের প্রশ্নে সমগ্র কোরান-এর একটি আয়াতেও কোনো ফেরেশতাকে নবিরূপে দেখতে পাই না। সুতরাং নিঃসন্দেহে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, নবি বড় এবং রসূল ছোট। আবার আরেকটি এগিয়ে গিয়ে বলা যায় যে, সমগ্র কোরান-এ ‘খাতামানি

নবি' কথাটি পাবেন তথা নবি শেষ শব্দটি পাবেন, কিন্তু একটিবারও 'খাতাম্মার রসুল' শব্দটি কোরান-এ বলা হয় নি। 'খাতাম্মান' শব্দটিকে আমরা এখানে 'শেষ' অর্থে গ্রহণ করেছি। সিল-ম্মারা (অথবা মোহর-ম্মারা) অর্থটিও অনেকেই গ্রহণ করেন, তবে আমরা 'শেষ' রূপেই গ্রহণ করেছি। আমরা এ জন্যই করেছি যে খাতাম্মান শব্দটি রসুলের আগেও পাই নি, পিছেও পাই নি। খাতাম্মার রসুল শব্দটি একটিবারও যদি পাইতাম তা হলে আমাদের চিন্তাভাবনার মাঝে প্রশ্ন থেকে যেত। প্রশ্ন এ জন্যই থাকে নি যে, খাতাম্মার রসুল শব্দটি কোরান-এর এক জায়গাতেও নাই। সুতরাং আর বেশি দলিল-প্রমাণ দেবার প্রয়োজন মনে করি না। এর পরেও যদি কোনো ইসলাম গবেষক রসুলকে নবির চেয়ে বড় করতে চায় তা হলে আমাদের বিনা কিছু থাকে না, বরং আমরা ধরে নেব, ইহা গবেষকের নিজস্ব চিন্তা ভাবনার ফসল। অন্যথায় আমরা গবেষককে শ্রদ্ধা এবং বিনয়ের সাথে অনুরোধ করবো যে রসুল নবি হতে কেমন করে বড় হয় তার প্রমাণটি পেশ করুন। নবি এবং রসুল উভয়ের একটিকেও আমরা ছোটও করি না বড়ও করি না, কিন্তু কোরান-এর দৃষ্টিতে আমরা দেখতে পাই,

নবি-নির্বাচন করার সময়ে একবারও ফেরেশতার কথাটি আসে নাই অথবা বলা হয় নাই, কিন্তু রসুল-নির্বাচন করার সময়ে ফেরেশতা এবং মানবজাতি হতে নির্বাচিত হওয়ার কথাটি জানতে পারি। এমনকি রসুল-নির্বাচন করার বেলায় কেবলমাত্র ফেরেশতাদেরকেই দেখতে পাই এবং মানবজাতির নামগন্ধটিও পাই না (যেমন সুরা ফাতিরের এক নম্বর আয়াত)।

সৌরজগতে যে-কয়টি গ্রহের অবস্থান দেখতে পাই সেই গ্রহগুলোর মধ্যে দূরত্বের প্রশ্নে নয়, বরং আয়তনের

প্রশ্নে, ছোট-বড় দেখতে পাই। গ্রহগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড় গ্রহটির নাম যেমন বৃহস্পতি পাই, তেমনি সবচাইতে ছোট গ্রহটির নামও পাই। সেই ছোট গ্রহটির নাম বুধ। বৃহস্পতি গ্রহটি কেন বড় হলো এবং বুধ গ্রহটিই বা কেন ছোট হলো ইহার কার্যকারণ অধম লিখকের জ্ঞানা নাই। অধম লিখকের জ্ঞানা নাই যে, কেন ছয় হাজার আলোকবর্ষ দূরে অবস্থান করা নিউট্রন নক্ষত্রের এক চায়ের চামচ পরিমাণ উপাদান (মাটি বললাম না) পৃথিবীতে এনে যদি মাপা হয় তা হলে তার ওজন হবে একশত কোটি টন। সুতরাং নবি বড় না রসুল বড়— এই প্রশ্নের উত্তরটির বিচারের ভার পাঠক বাবা-মায়াদের কাছে তুলে দিলাম। আমি কেবল কোরান-এ যা আছে তারই সামান্য কিছু কথা তুলে ধরলাম।

বড় বড় ওলিদের রচিত বইতে পড়েছি যে প্রথমে রসুল তথা রেসালাত, তারপরে নবি তথা নবুয়াত, তারপরে ওলি তথা বেলায়েত, সর্বশেষে আবদুহ তথা আবদিয়াত। এই চারটি গুণেই পরিপূর্ণরূপে গুণাবিত আমাদের মহানবি মোহাম্মদুর রসুলুল্লাহ (আ.)। তাই দেখতে পাই, কোরান-এর সুরা বনি ইসরাইলে বলা হয়েছে যে, আবদুহকে মেরাজে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

মহানবিকে রাতের অন্ধকারে মেরাজে নিয়ে গেলেন। যদি প্রশ্ন করা হয়, দিনের বেলায় কেন নিয়ে যাওয়া হলো না? দিন রূপক ভাষায় প্রকাশ্য এবং রাত রূপক ভাষায় গোপনীয়। রহস্য চিরদিন গোপনীয়ই থাকে। রহস্যলোকের যাত্রাটিও তাই রাতের আঁধারেই হয়ে

থাকে, দিনের বেলায় নয়। বহুজগতের সব কিছু যেমন দিনের আলোতে প্রকাশিত হয়ে যায়, তেমনি রাত্রির অন্ধকারে ঢেকে যায়। বৈষয়িক কাজকর্ম, ব্যবসাবাণিজ্য, হিশাবনিকাশ, দোঁড়াদোঁড়ি, লাফালাফি দিনের বেলাতেই দেখতে পাই। সবার তথা ধৈর্য যেমন দেখানো যায় না, তেমনি আল্লাহর ওলি হবার বিষয়টিও দেখানো যায় না। ইহা একান্তই গোপনীয় বিষয়। প্রকাশ হয়ে গেলেই ধরা পড়ে যায় আর ধরা পড়ে গেলেই পরীক্ষা করার কথাটি হালকা হয়ে যায়।

শ্রদ্ধেয় ওহাবি ফেরকার অনুসারীরা কোরান-এর সূরা কাহাফকে যম্মের মতো ভয় করে। কারণ খিজির (খিজির শব্দটি কোরান-এ নাই, আছে আবদুহ, তবে খিজির অর্থ চিরসবুজ) আল্লাহর একজন ওলি। পক্ষান্তরে হজরত মুসা কালিমউল্লাহ (আ.) একজন জাঁদরেল নবি। হজরত মুসার নামটি কোরান-এ সবচাইতে বেশিবার উল্লেখ করা হয়েছে : আমার জ্ঞানা মতে একশত পঁয়ত্রিশবার। এই জাঁদরেল নবি মুসা ওলি খিজিরের কাছে জ্ঞান অর্জন করার জন্য দুই সমুদ্রের মিলনক্ষেত্রে যেয়ে উপস্থিত হন এবং খিজিরের দর্শন লাভ করেন। মুসা ওলি খিজিরের জ্ঞান অর্জন করার প্রশ্নটি না তুলে বরং প্রশ্ন করলেন যে নবি মুসা ধৈর্যধারণ করতে পারবেন কি না। বড়ই আফসোসের বিষয়, ওলি খিজিরের তিনটি কর্মকাণ্ডের একটিতেও নবি মুসা

ঐর্ষ্যধারণ করতে না পারার দরুন তাঁকে বিদায় করে দেওয়া হলো।

এই খিজির আর মুসা তথা ওলি আর নবির বিষয়টি ওহাবি ফেরকার অনুসারীদের কাছে বিষ। না পারে সহ্য করতে, না পারে ধারণ করে নিতে। অনেকটা হাঁসের শামুক গেলার মতো। যখন শামুক হাঁসের গলার মাঝে আটকিয়ে যায় তখন না পারে গিলতে, না পারে ফেলতে। তখনই চলে গৌজাম্বিল দেওয়া বস্ত্রাপচা গাঁজাখুরি গপ্পোসপ্পো। ওহাবি অনুসারীদের কোরান-এর তফসিরখানা পড়ে দেখুন না, হাড়ে হাড়ে টের পাবেন, টের পাবেন কত ধানে কত চিঁড়া। তাদের কোরান-এর তফসির পড়বার পর আপনি হাসবেন না কাঁদবেন, মালুমই করতে পারবেন না।

অধম লিখক ওহাবিদের রচিত কোরান-এর তফসির পড়ার পর চোখে অন্ধকার দেখতে শুরু করলাম। একি গুনি মনুরার মুখে! মনে পড়ে গেল মাওলা আলির মহামূল্যবান উপদেশটি। খারেজিদের বিরুদ্ধে নাহওয়ানের যুদ্ধটি সংঘটিত হবার আগে মাওলা আলি যে সন্ধির প্রস্তাবটি নিয়ে দূত পাঠিয়েছিলেন সেই দূতদেরকে বার বার বলে দিয়েছিলেন, সন্ধির প্রস্তাবে কোরান-এর ব্যাখ্যা দিতে যেয়ো না, কারণ তোমরা কোরান-এর ব্যাখ্যা দিবে এক রকম আর খারেজিরা দিবে সম্পূর্ণ অন্যরকম।

আহলে সুন্নাতুল জামাতের অনুসারীদের পরিচালিত কিউ টিভি-তে কাওয়ালির একটি নির্দিষ্ট অনুষ্ঠান প্রতিদিনই থাকে। মিলাদ মাহফিলও থাকে। মিলাদে দাঁড়িয়ে ‘ইয়া নবি, সালাম ওয়ালাইকা’ পড়া হয়। অথচ ওহাবি অনুসারীদের ইসলামের টেলিভিশনের চ্যানেলগুলোতে কাওয়ালির পর্বটি থাকার প্রশ্নই আসে না, কারণ ওহাবিরা কাওয়ালিকে সরাসর হারাম বলে জানে। ওহাবিরা নবির মিলাদের প্রশ্নে মিলাদ মাহফিলটিকে হারাম জানে এবং নবির নামে দাঁড়িয়ে কেয়াম করাটিকে সহ্যই করতে পারে না। ওহাবিদের দেশে ভারতের বানানো ঐতিহাসিক ছায়াছবি মোগলে আজম-এ মধুবালার ভৌটে যে ‘সরকারে-দোআলম’ গানটি—যাহা হজরত শাকিল বদায়ুনির রচিত এবং সুর দেওয়া-উহা সম্পূর্ণরূপে মুছে ফেলে দিয়ে ভিসিডি’র ক্যাসেটগুলো দেখানো হয়। কারণ মহানবির কাছে না চেয়ে আল্লাহর কাছে চাইতে হবে। (শুনতে ভালোই অথচ বিষ। দেখতে চকচক করে, আসলে সোনা নয়।)

ওহাবিরা বাবা শাহ জালালের কাছে চাওয়া, খাজা বাবার কাছে চাওয়া, বড় পীর সাহেবের কাছে চাওয়া, এবং এতকালের গুলিদের কাছে চাওয়াটিকে শেরেক বলে। আমাদের দেশে আমাদের টিভি চ্যানেলগুলোতে এই রকম সকম, এই রকম বোলচাল আমরা কমবেশি সবাই দেখতে পাই। আফসোস! বাংলাদেশ আহলে সুন্নাতুল জামাতের দেশ হয়েও পাকিস্তানের কিউ টিভি-র মতো একটিমাত্র আহলে সুন্নাতুল জামাতের টিভি চ্যানেল আজ পর্যন্ত খোলা হয় নাই। এর চেয়ে বড় দুর্ভাগ্য আর কী হতে পারে? আমাদের এই পোড়া কপাল কবে এবং কেমন করে জোড়া লাগতে পারে? ইমাম গাজ্জালি যে হজরত জুনুন মিসরির মাজারে চাইতে বলেছিলেন, এই চাওয়াটা ওহাবিদের কাছে অসহ্য। তাই ওহাবিদের গুরুঠাকুর আবদুল ওহাব নজ্জদির ‘খামসা কাফেরে আকবর’ তথা পাঁচজন শ্রেষ্ঠ কাফেরের তালিকার মধ্যে হজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গাজ্জালির নামটিও দেওয়া হয়েছে।

জজকোর্ট, হাইকোর্ট এবং সুপ্রিম কোর্টের বিচারকরা যখন এজলাসে আসেন তখন বড়-ছোট সব উকিলরা দাঁড়িয়ে সম্মান করেন; স্কুল, কলেজ এবং ভার্টিটিতে শিক্ষক যখন ক্লাসে ঢোকেন তখন ছাত্ররা দাঁড়িয়ে সম্মান করে; মন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রী এবং প্রেসিডেন্টের আগমনে সবাই দাঁড়িয়ে সম্মান করেন; জাতীয় সঙ্গীত বাজানোর সঙ্গে সঙ্গে সকল সংসদ সদস্য দাঁড়িয়ে সম্মান প্রদর্শন করেন : অথচ মহানবির মিলাদ মাহফিলে দাঁড়িয়ে সম্মান প্রদর্শন করাটায় ওহাবি ফেরকার অনুসারীদের বড়ই কষ্ট হয়। হায় রে বিবেক! হায় রে ফেরকার সাইনবোর্ড কাঁধে নেওয়া!

রবি ঠাকুরের গানে (জাতীয় সঙ্গীতটি রবি ঠাকুরের রচিত) দাঁড়াতে এদের মোটেই কষ্ট হয় না, বিবেক প্রশ্নবিদ্ধ হয় না, কিন্তু যাকে সৃষ্টি না করলে আল্লাহ কিছুই সৃষ্টি করতেন না সেই মহানবির গানে দাঁড়াতে অনেক কষ্ট হয়। এমনকি ওহাবি ফেরকার অনুসারীরা এ রকম কথাটিও বলে ফেলে যে, এত দেশের এত মিলাদ মাহফিলে তথা লক্ষ লক্ষ মিলাদ মাহফিলে মহানবি কেমন করে হাজির হতে পারেন? প্রশ্নের উত্তরটি দিতে বড়ই লজ্জা লাগে। লজ্জা লাগে এই জন্য যে, দুনিয়ার সকল মানুষ, সকল প্রকার জীবজন্তুর জ্ঞান কবচ করে এক আজরাইল ফেরেশতা। এক আজরাইল যে সবার জ্ঞান কবচ করতে পারে সেটা ওহাবি অনুসারীরা হাসিমুখে মেনে নেয়। এক শয়তানের দুনিয়ার সমস্ত জিন-ইনসানদেরকে কুমন্ত্রণা দেবার ক্ষমতায় বিশ্বাস করে ওহাবি ফেরকার অনুসারীরা। কিন্তু আফসোস! যে নবিকে সৃষ্টি না করলে আল্লাহ কিছুই সৃষ্টি করতেন না, সেই মহানবির পক্ষে এতগুলো মিলাদ মাহফিলে হাজির হবার বিশ্বাসটুকুও রাখতে পারে না।

বিশ্বাসের কী অপূর্ব রঙ চঙ! অপূর্ব তেলসম্মাতি! এই ধরনের বিশ্বাসের পক্ষে ওহাবি ফেরকার অনুসারীরা অনেক রকম দলিল পেশ করে।

মহানবি এলম্মে গায়েব জানেন না বলে ওহাবি ফেরকার অনুসারীরা মনে প্রাণে বিশ্বাস করে এবং তাদের লিখনিতে, তাদের কথাবার্তায়, তাদের টেলিভিশনের চ্যানেলের মাধ্যমে প্রচার করে। ধরে নিলাম মহানবি এলম্মে গায়েব জানতেন না (?) তা হলে কী ভয়াবহ পরিণামটি এসে দাঁড়ায় তা তারা একবারও চিন্তা করে না। কোরান-এর সূরা আলে ইমরানের ৪৯ নম্বর আয়াতে হজরত ইসা (আ.) তথা যিশুখ্রিস্ট বলছেন যে, হে আমার সাহাবারা, তোমরা কে কী খেয়ে এসেছ তা বলে দিতে পারি, এমনকি তোমাদের প্রত্যেকের বাড়িঘরের কোথায় কী কী রাখা হয়েছে তাও বলে দিতে পারি। (হবহ উদ্ধৃত নয়)। হজরত ইসা (আ.) তথা যিশুখ্রিস্ট যে এলম্মে গায়েব জানতেন ইহাই তার জ্বলন্ত দলিল। খ্রিস্টান পাদ্রী-পোপেরা ইক্কোনেশিয়ার জাভা দ্বীপে এবং তাসখন্দে কোরান হতে তথা এই সূরা আলে ইমরানের আয়াতটিকে সামনে রেখে যিশুখ্রিস্ট যে এলম্মে গায়েব জানতেন তার প্রমাণটি তুলে ধরে এবং জনতাকে সঙ্গে সঙ্গে বলে দেয় যে, 'দ্যাখো, তোমাদের মহানবি এলম্মে গায়েব জানতেন না। এটা আমাদের কথা নয়, বরং তোমাদেরই বড় বড় মোল্লা-মুফতিরা দলিল-প্রমাণ দিয়ে বলে গেছেন। এখন তোমরাই বলো, কোন নবি বড়? আমরা তো বাইবেল হতে এই এলম্মে গায়েবের দলিলটি পেশ করছি না, বরং তোমাদের কোরান হতেই দলিলটি পেশ করলাম।' এ রকমভাবে খ্রিস্টান পাদ্রী ও পোপেরা নানা দেশে, নানা মাহফিলে এই জাতীয় তুলনামূলক কথাগুলো জনতার সামনে তুলে ধরে এবং এই তুলে ধরাটা কোরান-হাদিস হতে তুলে ধরে। এই ভয়াবহ অপপ্রচারের দরুন কতো মুসলমান যে খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করেছে তার দলিল আমাদেরই এক সুন্নি মাওলানা অডিও ক্যাসেটের মাধ্যমে দুঃখ ও ক্লেশ নিয়ে বলে গেছেন। এটাই বোধ হয় খনার বচনের নিজের পায়ে নিজের কুড়াল মারা।

এটাই বোধ হয় নিজের নাক কেটে অপরের যাত্রাভঙ্গ করা। এটাই বোধ হয় অপরের জন্য কুয়া খুঁড়ে সেই কুয়াতে নিজের পড়ে যাওয়া। পৃথিবীর ওলি-গাউস-কুতুব-আবদাল-আরিফরা অনেক বিধর্মীকে মুসলমান বানিয়ে গেছেন আর এইসব ওহাবি আলেম-উলামাদের কাণ্ডকারখানাগুলো বিচার করার ভারটি পাঠকদের হাতে তুলে দিলাম।

কোরান-এর সুরা আলে ইমরানের এই ৪৯ নম্বর আয়াতটিতে বলা হয়েছে যে, হজরত ইসা (আ.) আল্লাহর হুকমে মৃতকে জীবিত করেছেন। আমি এক জাদুরেল ওহাবি আলেমকে এই দলিলটি দেখানোর পর তিনি বললেন যে, এটা মরা মানুষকে জীবিত করার কথা বলা হয় নি, বলা হয়েছে জ্ঞানে যারা মরা তাদেরকে জ্ঞান দিয়ে জীবিত করার কথাটি। আমি বললাম যে, জ্ঞানে যে মরা তাকে জ্ঞান দিয়ে জীবিত কথাটিও কোরান-এ আছে, কিন্তু সেই আয়াতের সঙ্গে ‘কুম বেইজনিলাহ’ বা ‘আল্লাহর হুকমে’ কথাটি একবারও বলা হয় নি। অথচ মৃতকে জীবিত করার বেলায় ‘কুম বেইজনিলাহ’ কথাটি কোরান বলেছে। উনি আমার কথা শুনে তার মন মতো যুক্তি দাঁড় করালেন। আমি তার কথাগুলো শোনার পর কিছু না বলে আবার আরেকটি প্রশ্ন তুলে ধরলাম। ওই একই আয়াতে বলা হয়েছে যে, কাদামাটি দিয়ে একটি পাখি বানিয়ে নিয়ে আসো, আমি (ইসা আ.) ফৎকার দেবার সঙ্গে সঙ্গে উহা জীবন্ত হয়ে উড়ে চলে যাবে। (হবহ উদ্ধৃত নয়)।

আমি ওহাবি আলেমকে প্রশ্ন করলাম, কাদামাটির তৈরি পাখিটির ভেতর তো কোনো প্রাণই নাই, তা হলে উহা কেমন করে ফৎকার দেবার সঙ্গে সঙ্গে জীবিত হয়ে উড়ে গেল? ওহাবি ফেরকার সেই আলেমকে কিছুই বলার থাকে না। কারণ ইহা তকদিরের খেলা। আরও মজার ব্যাপারটি হলো, আমি যে দলের অনুসারী সেই আহলে সুন্নাতুল জামাতের একজন জাদুরেল আলেম আমাকে এই পাখি ফৎকারের বিষয়টির উপর একটি বিশ্বয়কর চমৎকার ব্যাখ্যা দান করলেন। উনি আমাকে বুঝিয়ে দিলেন যে হজরত ইসা (আ.)-এর সাহাবারা

তাড়াতাড়ি মাটি দিয়ে একটি পাখি বানিয়ে সামনে আনলেন এবং ফুৎকার দেবার সঙ্গে সঙ্গে ইঁহা পাখি হয়েছে বটে, কিন্তু সেই পাখিটির নাম হলো বাদুড়। আমি প্রশ্ন করলাম, ভাই বাদুড় কেন? উনি বললেন, কাদামাটি দিয়ে এত তাড়াতাড়ি পাখিটি বানানো হয়েছে যে সেই পাখিটির পায়খানা-প্রস্রাবের রাস্তা দুটি দেওয়া হয় নি। আমাকে আরও বললেন, বাদুড়ের পায়খানা-প্রস্রাব করার রাস্তা দুটোর একটিও নাই, তাই বাদুড় মুখ দিয়ে খায়, মুখ দিয়ে মলমূত্র পরিত্যাগ করে, মুখ দিয়ে বাচ্চা হয়। আমি উনাকে বললাম, চমৎকার ব্যাখ্যাটি দিয়েছেন। আমার ইঁহা জানা ছিল না। কিন্তু কিছুদিন আগে ডিসকভারি নামক টেলিভিশন চ্যানেলে জানতে পারলাম যে বাদুড়ের জন্ম আজ হতে কমপক্ষে আনুমানিক পঞ্চাশ লক্ষ বছর আগে। হজরত ইঁসা (অ.ি.)-র জন্ম আজ হতে দুই হাজার বছরের কিছুটা উপরে। কোথায় দুই হাজার বছর, আর কোথায় পঞ্চাশ লক্ষ বছর! বিজ্ঞান ধর্মের উপর কুসংস্কারের মরচে পড়া বিষয়গুলো কামারের মতো হার্পরে লোহি লাল করার পর হাতুড়ির আঘাতে লোহের উপর যত রকম জঞ্জালের জংগুলো ছিটকিয়ে ফেলে দেয়।

এইসব আলেম-উলামারা আজও উর্টের উপর বসে আজব আজব ব্যাখ্যা দান-খয়রাত করেন। যেমন এই আধুনিক যুগে আধুনিক কবিতা- লিখতে গিয়ে এক কবি প্রেমিকাকে কবিতার ভাষায় এই বলে ইঁশিয়ার করে দিচ্ছে যে, ‘তোমার ভালোবাসা না পেলে পৃথিবীটাকে ভারত মহাসাগরে ফেলে দেব।’ অধম লিখকের ছয় কন্যার এক কন্যা আমাকে প্রশ্ন করেছিল, ‘বাবা, ভারত মহাসাগর বড়, না পৃথিবী বড়?’ আমি আর হাসি চেপে না রেখে হা হা করে হাসতে থাকি।

মোল্লাদের সংকীর্ণতা

এই কিছুদিন আগের একটি ঘটনা। তখনও ভারত ব্রিটিশের গোলাম। ১৯৪৬ সাল। কেরানিগঞ্জ উপজেলার শুভাচ্যা ইউনিয়নের চুনকুটিয়া গ্রামে জামে মসজিদে ওয়াজ করার জন্য দাওয়াত করা হয়েছিল সেই দিনের বিখ্যাত আলেম টাঁদপুর জিলার ষাটনলের অধিবাসী মাওলানা ইব্রাহিম নুরী কে। সেই দিনেই উনাকে ওয়াজ করার পর পঞ্চাশ টাকা দক্ষিণা দেওয়া হতো। অধম লিখকের বয়স তখন আনুমানিক সোয়া সাত বছর, কারণ আমার জন্ম হয়েছিল ১৯৩৮ সালের ২৫ আগস্ট। সেই দিনে ওয়াজ করার সময়ে কোনো মাইক ব্যবহার করতে দেখি নি। মাওলানা ইব্রাহিম নুরীর গলার আওয়াজ ছিলো সিংহের গর্জন করার মতো এবং অপূর্ব সন্মোহনী শক্তির অধিকারী ছিলেন। ওয়াজ করার মাঝে মাওলানা ইব্রাহিম নুরী বলে ফেললেন যে ইংরেজি পড়া হারাম এবং যারা ইংরেজি পড়বে তারা হাবিয়া দোজখে চলে যাবে। আমি তখন সেই বয়সে ইংরেজি আদর্শলিপি পাঠ করছি। আমার শিশুমনে ভয়ঙ্কর একটি দাগ কেটেছিল। বাড়িতে এসে বাবাকে

বললাম, ‘আমি আর পাঠশালায় পড়তে যাবো না।’ বাবা অবাক হয়ে বললেন, ‘কেন যাবে না?’ আমি বললাম, ‘আমি মাদ্রাসায় লেখাপড়া করবো। কারণ ইংরেজি পড়ে হাবিয়া নামক দোজ্জখে যেতে আমার দারুণ ভয় লাগে।’ আমার বাবা ঢাকা ভার্গিটি হতে ১৯২২ সালে এম এ পাশ করেছেন। তাই আমি বাবাকে সরল মনে বললাম ‘তুমি আর আমার মায়ের মামা ওয়াজেদ আলী তথা আমার নানাভাই আগেই হাবিয়া দোজ্জখে চলে গেছে।’ বাবা আমাকে বললেন, ‘মাওলানা ইব্রাহিম নুরীর এই কয়টি কথা বাদ দিয়ে দাও।’ সেই বয়সে প্রতিবাদ করার বুদ্ধিটুকুও ছিল না। নীরব রইলাম। কিন্তু আজ এই সত্তর বছর বয়সে যখন চিন্তা করি যে ইংরেজি শিক্ষার প্রশ্নে অন্য ধর্মের অনুসারীদের থেকে মুসলমানদের অনেক পিছিয়ে যাবার অন্যতম কারণ হলো মাওলানা ইব্রাহিম নুরীর মতো মাওলানাাদের এই রকম প্রচার।

আমার কিছুটা মনে আছে, সপ্তগাত প্রত্নিকার মালিক নাসির উদ্দিন সাহেবের জীবনেও এই রকম ঘটনাটি বাস্তবে ঘটেছিল। কারণ নাসির উদ্দিনের পিতা ততটা শিক্ষিত ছিলেন না। পৃথিবী যখন দ্রুত গতিতে এগিয়ে যায় তখন এই জাতীয় কিছু শ্রদ্ধেয় আলেম-উলামা পেছনের অন্ধকার যুগের দিকে টেনে নিয়ে যাবার আশ্রয় চেষ্টা চালায়।

বহুর দশেক আগের কথা। গুলশানে বাস করা আমার এক রোগী আমাকে বলে ফেললেন যে গুলশান, বারিধারা, বনানী, শকর, ঈদগাহ, ধানমন্ডীতে যারা বাস করেন তারা তাদের ছেলেমেয়েদের কমই মাদ্রাসা শিক্ষায় শিক্ষিত করেন। কথাটি কতটুকু সত্য আমি তা জানি না।

এই সেদিন, ১৯৬৯ সালে, অলড্রিন আর আর্মস্ট্রং যখন চাঁদের বুকে পা রাখলেন তখন অধিকাংশ আলেম-উলামা বিশ্বাস করা তো দূরে থাক, বরং উদ্ভট গাঁজাখোরের মস্তিষ্কের ফসল বলে নানা রকম ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা হতো। অথচ এই অত্যাধুনিক বিজ্ঞানের যুগে, স্যাটেলাইটের মাধ্যমে মোবাইল ফোনের যুগে, যারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতেন তারা ভিজা বেড়ালের মতো চুপ করে থাকেন। বিজ্ঞান এদেরকে ঘাড় ধরে প্রগতির পথে নিয়ে যায়। এরা নাকি কান্নায় কেঁদে কেঁদে বড় কষ্টে প্রগতির পথে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলতে থাকেন।

মুন্সিগঞ্জ জেলার রামপাল নামক স্থানে অনেক আগে একটি ওয়াজের মাহফিলে এক মাওলানা ধমক দিয়ে বললেন যে, যিনি জন্ম দিয়েছেন কেবলমাত্র তাকেই বাবা বলে ডাকতে হবে, অন্য কাহাকেও কোনো অবস্থাতেই বাবা বলা যাবে না। বুঝতে পারলাম মাওলানা সাহেব

গোলাবি ওহাবি। উনি বুঝাতে চেয়েছেন যে, আমরা যে খাজা বাবা বলি তাহা বলা সঠিক নয়। ওয়াজ শেষে খাবার টেবিলে বসে মাওলানা সাহেবকে প্রশ্ন করলাম, ‘আপনি কি বিবাহিত?’ উনি বললেন, ‘হ্যাঁ।’ ‘আপনার কি সন্তান আছে?’ উনি বললেন, ‘দুটি মেয়ে এবং একটি ছেলে আছে।’ কিছু অপ্রাসঙ্গিক কথা বলার পর একসময় উনাকে প্রশ্ন করলাম, ‘আপনার মেয়েকে মা এবং ছেলেকে বাবা বলে কি ডাকেন?’ উনি বললেন, ‘হ্যাঁ।’ আমি পুনরায় প্রশ্ন করলাম, ‘আপনার মেয়ে কি আপনার বাবার বিবাহিত স্ত্রী এবং আপনার ছেলে কি আপনার মায়ের বিবাহিত স্বামী?’

উনি লজ্জায় ‘নাউজুবিল্লাহ’ শব্দটি ব্যবহার করলেন। ‘আপনার মেয়ে আপনার মা না হয়েও মা, এবং আপনার ছেলে আপনার বাবা না হয়েও বাবা,’ আমি ওনাকে বললাম। ‘জন্মপিতা’, ‘ডাকের পিতা’, ‘ধর্মপিতা’, ‘উকিল পিতা’, ‘জাতির পিতা’ ইত্যাদি শব্দগুলো আলঙ্কারিক। যেমন খাজা বাবা বলাটিও আলঙ্কারিক।

যদিও বিষয়টি এখানে অপ্রাসঙ্গিক, কিন্তু না বলে পারলাম না : ইসলামের ইতিহাস পড়লে জানা যায় যে, কোনো এক যুদ্ধে মাওলা আলি (আ.) কাফেরটিকে পরাজিত করে তরবারির আঘাত হানবেন এমন সময় সেই কাফেরটি মাওলা আলিকে লক্ষ্য করে খুঁত নিক্ষেপ করলো। মাওলা আলি হত্যা করা হতে বিরত রইলেন। বিস্ময়ে অবাক হয়ে কাফেরটি মাওলা আলিকে জিজ্ঞেস করলো, ‘কেন আপনি আমাকে হত্যা করলেন না?’

মাওলা আলি বললেন ‘তুমি যখন আমার শরীরে খুঁত
নিষ্কেপ করেছ সেই মুহূর্তে আমার খুব রাগ হয়েছিল।
এই রাগের মাথায় যদি আমি তোমাকে হত্যা করতাম
তা হলে এই হত্যাটি আমার স্বার্থে করা হতো। আমার
স্বার্থের উপর

আঘাত লাগলে আমি কাহাকেও হত্যা করি না। আমি
তখনই হত্যা করি, যখন সেই হত্যাটি একমাত্র ফি
সাবিলিল্লাহ হয়, তথা আল্লাহর পথে হয়। আমার স্বার্থে
হত্যা করা আর আল্লাহর পথে তথা ফি সাবিলিল্লাহর
জন্য হত্যা করা দুটো বিষয় মোটেই এক নয়, বরং
আকাশ-পাতাল প্রভেদ।’ পরে সেই কাফেরটি কলেমা
পরে মুসলমান হয়ে গেলেন এবং মহানবির একজন
সাহাবা হবার সৌভাগ্য লাভ করলেন।

ফি সাবিলিল্লাহর এত সুন্দর দৃষ্টান্ত আমাদেরকে
অভিভূত করে। মাওলা আলি এই ফি সাবিলিল্লাহর জন্য
কতটুকু সাবধান থাকতেন তারই জ্বলন্তনমুনাটি আমরা
ইতিহাসে দেখতে পাই। কিন্তু আফসোস! ইতিহাসে এ
রকম জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত থাকার পরেও ইতিহাস হতে আমরা
কমই এ রকম শিক্ষাটি গ্রহণ করতে পেরেছি।

আমরা হাদিস হতে একটি মূল্যবান শিক্ষা পাই।
মহানবি একদিন সাহাবাদের মধ্যে পণ্যসামগ্রী বিতরণ
করছিলেন। এমন সময়ে একজন বলে ফেললো, ‘হে
মুহম্মদ, আপনি ন্যায়বিচার করুন এবং আল্লাহকে ভয়
করুন।’ উপস্থিত সব সাহাবারা এই কথা শোনার পর
চমকে গিয়েছিলেন। ফারুকে আজম হজরত উমর (রা.)

সেই লোকটিকে হত্যা করতে চাইলে মহানবি হত্যা করতে নিষেধ করলেন এবং বললেন, ‘এই লোকটি হতে একটি ফেতনার সৃষ্টি হবে।’ এই লোকটি হতেই খারেজি ফেরকার জন্ম হয়েছিল।

সিফ্যিনের যুদ্ধের পর খারেজিরা একটি দলে সংগঠিত হতে পেরেছিল। সেই ইতিহাস কমবেশি সবারই জানা থাকার কথা। নাহওয়ানের যুদ্ধে মাওলা আলির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়ে এদের অনেকেই মারা পড়ে এবং ছত্রভঙ্গ হয়ে এদিকসেদিক পালিয়ে যায়। খারেজিদের দর্শনে আল্লাহর ওলিদের স্থান পাবার প্রশ্নই ওঠে না। কারণ আল্লাহর ওলিদের মাওলা যিনি সেই আলির বিরুদ্ধেই এরা অস্ত্রধারণ করেছিল। এরা মহানবির সাফায়াতকে মেনে নেয় না।

আমরা হাদিসে পাই, জাহান্নামের আগুনে একজন জ্বলছে, মহানবি সেই জাহান্নামিকে তুলে জান্নাতে টুকিয়ে দিলেন। এই জাতীয় হাদিসগুলোকে খারেজি মন-মানসিকতায় গড়ে ওঠা মুসলমানেরা মেনে নিতে চায় না। আমরা স্পষ্ট দেখতে পাই যে আহলে সুন্নাতুল জাম্মাতের আজ্ঞান দেবার পর যে দোয়াটি পড়া হয় তার সাথে ওহাবিদের আজ্ঞানের দোয়ার কোনো মিল নাই। সেই খারেজিরা আর নেই সত্য, কিন্তু তাদের দর্শন আজও বেঁচে আছে।

কোনো এক অজ্ঞাত কারণে হাক্কুল এবাদ তথা বান্দার হকটির বিষয়ে কোরান-হাদিস-এ বার বার সাবধান করে দেওয়া হয়েছে এবং বার বার বলা হয়েছে যে বান্দার হক মেনে দিলে আল্লাহ মাফ করার বিধানটি রাখেন নি, তবে যে বান্দার হকটি মারা হয়েছে সেই বান্দা যদি মাফ করে দেন তো বলার কিছু নাই।

অধিকাংশ মানুষ জাহান্নামে যাবে এই বান্দার হক মেরে দেবার প্রশ্নে। তাই আল্লাহ কোরান-এ বলেছেন, তোমরা যতই চালাকি করো না কেন আমি সবচেয়ে বড় চালাক। (হবহ উদ্ধৃত নয়)।

নামাজ-রোজা বিষয়টি একান্ত আল্লাহর বিষয় এবং মাফ করে দেবার বিষয়টিও আল্লাহর এখতিয়ারভুক্ত। যেহেতু আল্লাহ নিজেই বলেছেন যে, বান্দার হক মেরে দিলে আল্লাহ মাফ করবেন না, বরং যাদের হক মেরেছে তারা মাফ না করা পর্যন্ত, এখানে একটা বিরাট কিত্তুরয়ে গেল। এই ভয়াবহ কিত্তুর খপ্পরে পড়ে বেশির ভাগ মানুষ যে জাহান্নামে যাবে ইহা মনেই করতে চায় না।

এই হক্কুল এবাদ তথা বান্দার হকটির বিষয়ে দশ বছর পরিশ্রম করে যে বইটি আমি লিখেছি সেই বইটির নাম মারেফতের গোপন কথা। অধ্যাত্মবাদের কিছু কথা এবং বাকি সমস্ত বিষয়টি হক্কুল এবাদের উপর রচিত হয়েছে। অধম লিখক বলতে চেয়েছিলাম যে, হক্কুল এবাদ তথা বান্দার হক বিষয়টি বেমালুম ভুলে গিয়ে যারা অধ্যাত্মবাদের চর্চা করতে চায় তাদের জন্য কষ্ট হয় এবং বড়ই দুঃখ লাগে। অধম লিখক মনে করে হক্কুল এবাদকে অস্বীকার করে হক্কুল্লাহর রহস্যের কথা জানানার আগ্রহটি অনেকটা গাছের গোড়া কেটে গাছের মাথায় পানি ঢালার মতো।

সালাত তথা নামাজ

এবার আমরা নামাজ বিষয়টির উপর সামান্য আলোচনা করতে চাই। নামাজ যদিও ফারসি শব্দ, কিন্তু ইহার আরবি শব্দটি হলো সালাত। সালাত শব্দটির অর্থ হলো সংযোগ প্রচেষ্টা, যোগাযোগ স্থাপন করা। সেই সংযোগ, সেই যোগাযোগ কার সঙ্গে? আল্লাহর সঙ্গে, না দুনিয়াদারির সঙ্গে? ‘আত্‌তালেবুদ দুনিয়া মরদুদ’ অর্থাৎ ‘যে কেবলমাত্র দুনিয়াই চায় সে মরদুদ নামক শয়তান।’ যদিও চার প্রকার শয়তানই মানুষের অন্তরে বাস করে এবং সৃষ্টিজগতের আর কোথাও বাস করার অনুমতি দেওয়া হয় নি, তবু খান্নাস এবং মরদুদ এই দুইটি রূপ শয়তানের ভয়ঙ্কর রূপ। শয়তানের খান্নাস এবং মরদুদ রূপ দুইটি যার অন্তরে ভয়ঙ্কররূপে বাসা বেঁধে আছে তারা সত্যিই বদনসিব।

সালাত তথা নামাজ ওয়াক্‌তিয়া এবং দায়েম্বি। সকল নবি-রসুলের আমলেই সালাত কায়েম করার কথাটি আমরা কোরান হতে জানতে পারি এবং এ-ও জানতে পারি যে, যারা সালাত কায়েম করতে পেরেছেন তাদের কপালে সালাত কায়েমের চিহ্নটি ফুটে ওঠে।

ওয়াক্‌তিয়া সালাত তথা নামাজ মহানবির আমল হতে শুরু হয়েছে এবং মহানবি মেরাজে গিয়ে ঈশ্বতদের জন্য পাঁচ ওয়াক্‌ত সালাতটি রহমতের উপহার হিসাবে নিয়ে এসেছেন। যদিও পঞ্চাশ ওয়াক্‌ত নামাজ দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু হজরত মুসা (আ.)-র বার বার অনুরোধে আল্লাহর কাছে গিয়ে অবশেষে পাঁচ ওয়াক্‌ত নামাজটি নিয়ে এসেছেন।

যদি কেউ অধম লিখককে এই প্রশ্নটি করেন যে, মহানবি কেমন করে মুসা নবির অনুরোধে বার বার আল্লাহর কাছে গিয়ে অবিশেষে পাঁচ ওয়াস্ত নামাজ নিয়ে এলেন? হজরত মুসা নবি কেমন করে মহানবিকে অনুরোধ ও উপদেশ দিতে পারেন? এই কথাটির উত্তর অধম লিখকের জানা নাই।

ওয়াস্তিয়া সালাত পালন করতে গেলে কপালে ঘষা খাওয়ার কালো দাগ পড়ে। এই কপালে ঘষা খাওয়া কালো দাগটিই কি সালাত কায়েমের চিহ্ন ফুটে ওঠা? এই জাতীয় চিহ্নটিকে কোরান-এর ভাষায় সিন্মা বলা হয়। এই ওয়াস্তিয়া সালাত পূর্ববর্তী নবিদের অনুসারীদের মাঝে প্রচলিত ছিল না, সুতরাং পূর্ববর্তী নবিদের অনুসারীদের কপালে এই কালো কহর জাতীয় চিহ্নটি ফুটে উঠবার প্রশ্নই আসে না। তবে কি ইহা আল্লাহর দেওয়া নুরানি চিহ্ন? অথবা অন্য কিছু যা অধম লিখকের জানা নাই?

মহানবি বলেছেন, ‘আসসালাতুদ দাওয়ামি আফজালুম মিনাল সালাতিল ওয়াস্তি’ অর্থাৎ ‘ওয়াস্তিয়া নামাজি হইতে দায়েমি নামাজ অনেক মর্যাদাপূর্ণ (তথা আফজাল)।’ আমরা কোরান-এর সূরা মারিজের ২৩ নম্বর আয়াতেও দায়েমি সালাতের কথাটি জানতে পারি। কোরান বলছে, ‘আল্লাজিনা ইম্ম আলা সালাতেহিম দায়েমুন’ অর্থাৎ ‘তাহারা সালাতের (নামাজ) উপর সব সময় অবস্থান করেন।’

একটু ভালো করে লক্ষ করে দেখুন যে দায়েমি সালাত (নামাজি)-টির কথা কোরান-এও পাই, কিন্তু পাঁচ ওয়াস্ত নামাজের কথাটি কোরান-এ উল্লেখ করা হয় নি। মহানবিকে রাতে মেবাজে নেবার বিষয়টি কোরান-এ উল্লেখ আছে, কিন্তু পাঁচ ওয়াস্ত নামাজ যে উনি সঙ্গে করে নিয়ে এলেন সেই কথাটির উল্লেখ কোরান-এর কোথাও নাই। এক মোতাজ্জিলা ফেরকার অনুসারী, আল্লামা জামাকসুরি, তাঁর রচিত তফসিরে কাশশাফ-এ সূরা বনি ইসরাইলের ৭৮ নম্বর আয়াতটি দিয়ে প্রমাণ করতে চেয়েছেন পাঁচ ওয়াস্ত নামাজের কথা। যদিও পাঁচ ওয়াস্ত নামাজের কথাটি এই আয়াত দিয়ে প্রমাণিত হয়

না, তবু আল্লামা জাম্বাকসুরিকে তাঁর এই গবেষণার জন্য ধন্যবাদ জানাই।

হজরত জাবেরের বর্ণিত হাদিসটি এখানে তুলে ধরলাম : ‘ম্বেফতাহল জান্নাতে আস্সালাত ওয়া ম্বেফতাহ সালাতিত্ত তহর’ অর্থাৎ ‘জান্নাতের চাবি হলো নামাজ আর নামাজের চাবিটি হলো তাহারত অর্থাৎ পবিত্রতা।’ পরম শ্রদ্ধেয় আলেম-উলামারা ‘নামাজ বেহেশতের চাবি’ কথাটি উল্লেখ করেন, কিন্তু নামাজেরও যে চাবি আছে এবং নামাজের সেই চাবিটির নাম তাহারত অর্থাৎ পবিত্রতা, ইহা প্রায় কেউই এড়িয়ে যাওয়া হয়। এড়িয়ে যাবার কারণও আছে। কারণ এমনিতেই মানুষ নামাজের প্রতি উদাসীন, তাই নামাজের চাবিটি যে তাহারত উহা বলতে গেলে আরও উদাসীন হয়ে পড়ার সম্ভাবনা থাকে।

শরীর পাকসাফ থাকার পরও পানি দিয়ে ওজু করে নামাজ পড়তে হয়। এই শরীরের পাকসাফ থাকা এবং পানি দিয়ে ওজু করাটি হলো ম্বেজাজি তাহারত তথা ম্বেজাজি পবিত্রতা। এই ম্বেজাজি তাহারত তথা ম্বেজাজি পবিত্রতা দিয়ে কেমন করে হাকিকি তাহারত তথা হাকিকি পবিত্রতার দিকে এগিয়ে যেতে হবে তারই একটি মূল্যবান পদক্ষেপ এবং মূল্যবান শিক্ষা। সুতরাং ম্বেজাজি তাহারত তথা ম্বেজাজি পবিত্রতাটিকেও অবহেলা করতে নাই। নামাজের চাবি তাহারত তথা পবিত্রতা। ম্বেজাজি তাহারত তথা ম্বেজাজি পবিত্রতা তখনই হাকিকি তাহারতে তথা হাকিকি পবিত্রতায় নিয়ে যায়, যখন সালাতি তথা নামাজি আপন নফ্সের সঙ্গে জড়িয়ে দেওয়া খান্নাসরূপী শয়তানটিকে বাহির করে দিতে পারে। যেইমাত্র খান্নাসরূপী শয়তানকে

আপন আপন নফস হতে সালাতি তথা নামাজি বের করে দিতে পারেন তখনই দায়েমি সালাতটি প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়, তখনই আল্লাহর সঙ্গে সালাতির যোগাযোগ হয়ে যায়, তখনই আল্লাহর সঙ্গে সালাতি সংযোগে চিরস্থায়ীরূপে তথা দায়েমিরূপে অবস্থান করেন। এই সালাতই, এই নামাজই সালাতিকে তথা নামাজিকে মেরাজে নিয়ে যায়। এ জন্যই বলা হয়, মোমিনের সালাতই হলো মেরাজ। কারণ মোমিনের সঙ্গে তখন আর খান্নাসরূপী শয়তানটি অবস্থান করতে পারে না। খান্নাসরূপী শয়তানটিকে সালাতের মাধ্যমে, নামাজের মাধ্যমে, যোগাযোগের মাধ্যমে, সংযোগের মাধ্যমে আপন নফস হতে বাহির করে দেওয়ামাত্র সালাতি মোমিন হয়ে যায়। ইহাই মোমিনের আসল সংজ্ঞা, ইহাই মোমিনের হাকিকি বয়ান। আপন নফসের সঙ্গে খান্নাসরূপী শয়তান যতদিন কমবেশি অবস্থান করে সেই সালাতি তথা নামাজি ততদিন কেবলমাত্র আমানু তথা ইমানদার। কারণ আল্লাহপাক মোমিনদের সঙ্গে থাকেন, আমানুদের সঙ্গে থাকেন না।

কোরান-এ সালাতের উল্লেখসমূহ

এখন আমরা কোরানুল করিম হতে সালাত তথা নামাজ বিষয়টি যেখানে যেখানে উল্লেখ করা হয়েছে তার সামান্য কিছু নমুনা তুলে ধরতে চাই।

কোরান-এ সালাতের উল্লেখ : ১

কোরান-এর ২ নম্বর সূরা আল বাকারার ৩ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে : যাহারা গায়েবের (অদেখার) প্রতি বিশ্বাস করে (আল্লাজিনা ইউম্মেনুনা বিল গায়েব) এবং সালাত কায়েম করে (ওয়া ইউক্বিমুনাস সালাত) এবং আমরা (এখানে আল্লাহ 'আমি' বলেন নি, তাই হবহ রাখলাম) তাহাদেরকে যে বেজেক দিয়াছি (ওয়া মিম্মা রাজ্জাকনাহম), তাহা ব্যয় করে (ইউনফেকুন)।

ব্যাখ্যা

এই আয়াতে সালাত কায়েমের আগের শর্তটি হলো, যারা বিল গায়েবের উপর ইম্যান আনে। বিল গায়েব শব্দটির বাংলা অনুবাদ করা হয় অদৃশ্য। এই অদৃশ্য বলতে কী বুঝায়? বিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে দৃশ্য এবং অদৃশ্যের বিষয়গুলোর ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ অনেক জটিল। আমরা ইচ্ছা করেই সেইসব জটিল পথে অগ্রসর না হয়ে সোজা কথায় বলতে চাই, আল্লাহ তথা সমস্ত সৃষ্টির সেফাত-সমূহ এবং জাত-সমূহের একত্রিত রূপটির নাম হলো আল্লাহ। সেই আল্লাহ তথা রুহ তথা 'আমরা'-রূপী রুহ, ফেরেশতা, আখেরাত, বেহেশত, এবং দোজখের উপর না দেখেই বিশ্বাস স্থাপন করাটাকেই বিল গায়েবে বিশ্বাস করা তথা অদৃশ্যে বিশ্বাস বলতে চাই। এইসব বিষয়গুলো তথা বিল গায়েবগুলো দেখবার কোনো যন্ত্র

বা উপায়- উপকরণ এই সর্বাধুনিক বিজ্ঞানও আবিষ্কার করতে পারে নি। অথচ অবাক হবার কথাটি হলো, এই আল্লাহই ‘নাহনু আকরাবু’-রূপে, রূহরূপে প্রতিটি মানুষের সঙ্গেই তথা জীবন-রংগের নিকটেই অবস্থান করছেন। এই অবস্থানটির ঘোষণা কোরান দেবার পরও আমরা কিছুই বুঝতে পারি না। তাই এটা বিল গায়েবের জ্ঞান। তারপর যে ফেরেশতাদের কথা বলা হয়েছে উহা প্রতিটি মানুষের ভিতরেই থাক আর বাহিরেই থাক, আমরা দেখতে পাই না। এই দেখতে না-পাওয়া বিষয়টিকেই বিল গায়েব বলা হয়। আখেরাত আর কেয়ামত শব্দ দু’টো যদিও পাশাপাশি চলে তবু এখানে মৃত্যু-ঘটনাটির কথাকেই আখেরাত বলা হয়েছে। এবং উহাও প্রতিটি মানুষের সঙ্গেই জড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। তারপর আসে জ্ঞানাত এবং জাহান্নামের কথাটি। জ্ঞানাত ও জাহান্নাম কথা দু’টো বলতে গেলে মেজাজি এবং হাকিকির কথাটি এসে পড়ে। মেজাজি জ্ঞানাত ও জাহান্নাম সম্ভবত বাহিরে থাকে (অধম লিখকের জ্ঞান নাই)। কিন্তু হাকিকি জ্ঞানাত ও জাহান্নাম যে প্রতিটি মানুষের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে দেওয়া হয়েছে উহাতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নাই। তাই বলা হয়ে থাকে, যিনি জ্ঞানাতে অবস্থান করেন তার কাছে সব কিছুই জ্ঞানাত আর যে জাহান্নামে অবস্থান করে তার

কাছে সব কিছুই জাহান্নাম। এই বিষয়গুলোর উপর তথা বিল গায়েবের উপর দৃঢ় আস্থা যারা রাখতে পারবেন তাদেরকে এর আগেই বলা হয়েছে মুঠাকি। আল্লাহ যেমন সবরকারীর সঙ্গে তথা যারা ধৈর্যধারণ করে তাদের সঙ্গে থাকবার কথাটি কোরান-এ ঘোষণা করা হয়েছে, তেমনি যারা মুঠাকি তাদের সঙ্গেও আল্লাহ আছেন বা থাকেন বলে ঘোষণাটি কোরান দিয়েছে। সুতরাং মুঠাকি বলতে তাদেরকেই বোঝানো হয়েছে যারা দায়েমি সালাতের মধ্যে তথা চিরস্থায়ী যোগাযোগ স্থাপন করাটির প্রশ্নে ধ্যানসাধনা ও মোরাকাবা-মোশাহেদার অবিরাম সাধনা চালিয়ে যান। এই অবিরাম ধ্যানসাধনা ও মোরাকাবা-মোশাহেদাটি এ জন্যই মুঠাকির করা করে যান যাতে বিল গায়েবের বিষয়গুলো তথা অদৃশ্যের বিষয়গুলো মুঠাকির ভেতর গোপনে প্রকাশিত হয়ে পড়ে। যদি সবার জন্যই প্রকাশিত হয়ে যাবার বিধানটি দেওয়া হতো তা হলে দুনিয়াতে আল্লাহ যে আমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য পাঠিয়েছেন সেই কথাটির আর কোনো মূল্য থাকতো না। তা হলে সবাই মুসলমান হয়ে যেত। আর সবাই মুসলমান হয়ে গেলে আল্লাহর এই জটিল খেলাগুলোর কোনো মূল্যায়ন থাকতো না। এই কথাগুলো কোরান-এর অনেক আয়াতে অনেক রকম ভাষায় জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই মুঠাকি নামক সাধকেরাই ধ্যানসাধনা এবং মোরাকাবা-মোশাহেদার মাধ্যমে বিল গায়েবের তথা অদৃশ্যের ঘটনাগুলো জেনে নেবার প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়ে যান। তাই আল্লাহ এই মুঠাকিদের সঙ্গে সব সময় আছেন বলে কোরান ঘোষণা দিয়েছে। মুঠাকি বলার প্রশ্নেও মেজাজি মুঠাকি এবং হাকিকি মুঠাকির কথাটি এসে পড়ে। মেজাজি মুঠাকির বিল গায়েবের দৃশ্যগুলোর প্রতি ইমান এনেও,

ধ্যানসাধনা করেও, এইসব বিষয়ের রহস্য উদ্ঘাটন করতে পারে না। তারাও মুঠাকি, তবে তারা ম্লেজাজি মুঠাকি। তারা মোটেও হাকিকি মুঠাকি নয়। কারণ হাকিকি মুঠাকি হবার সঙ্গে সঙ্গে নির্বাক হয়ে যান। নিরাকার আল্লাহ যেমন সাকার মানুষ ছাড়া কথা বলার বিধানটি রাখেন নি, তেমনি হাকিকি মুঠাকিদের মাধ্যমেই আল্লাহ কথা বলে যান। তাই আমরা হাদিসে দেখতে পাই, মহানবি বলেছেন, আল্লাহর খাস বান্দা নফল এবাদত-বন্ধেগি করতে করতে এমন একটি পর্যায়ে এসে পড়েন যখন ওই খাস বান্দা, ওই খাস মুঠাকির মুখেই আল্লাহ কথা বলেন, ওই খাস বান্দা ও হাকিকি মুঠাকির চোখে আল্লাহ দর্শন করেন-ইত্যাদি। (হাদিসটি হুবহু উদ্ধৃত নয়)।

তাই মুঠাকিরা বিল গায়েবের উপর ইম্মান আনে তথা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সালাত কায়েম করে তথা আল্লাহর সঙ্গে যোগাযোগ করার অবিরাম প্রচেষ্টা চালিয়ে যায় এবং তাদেরকে যে রেজেক দান করা হয়েছে উহা হতে ব্যয় করে- রেজেকের বেলাতেও ম্লেজাজি এবং হাকিকি কথাটি এসে পড়ে। ম্লেজাজি রেজেক দান করাটি তথা ব্যয় করাটির কথা দ্বারা আমরা মোটামুটিভাবে দুনিয়ার ধনসম্পদ ব্যয় করার কথাটি বুঝে থাকি। দুনিয়ার ধনসম্পদ নামক রেজেক কথাটির সঙ্গে বেহিশাব কথাটি মোটেই খাটে না, কারণ আধুনিক বিজ্ঞান দুনিয়াতে চাউল, গম, কাসাভা, আলু, ডাল, পিঁয়াজ, রশুন, আদা এবং ইত্যাদি ধনসম্পদ বিষয়ের রেজেকগুলোর পরিমাণটুকু অনায়াসে বলে

দিতে পারে। তা হলে বেহিশাব কথাটি দুনিয়ার ধনসম্পদের প্রশ্নে অধম লিখকের মনে হয়, খাটে না। কিন্তু যেটি হাকিকি রেজেক, যেটি অসীম রেজেক, যেটি নুরানি রেজেক, যেটি রহস্যের রেজেক উহা মাপার যন্ত্রটি আধুনিক বিজ্ঞানও আবিষ্কার করতে পারে নি এবং কেয়ামত পর্যন্ত তা না পারারই কথা। একজন হাকিকি মুঠাকি আরেকজন মেক্জাজি মুঠাকিকে যখন রহস্যের রেজেক দান করেন তখনই সঙ্গে সঙ্গে মেক্জাজি মুঠাকিটি হাকিকি মুঠাকিতে পরিণত হয়ে যান। তাই কোরান সর্বপ্রথম একটি প্রচণ্ড চপেটাঘাত করছে এই বলে যে ‘আলিফ-লাম-মিম ওইটাই কেতাব।’ এখানে দাঁড়ি দেওয়া হয়েছে তথা বাক্যটি শেষ করে দেওয়া হয়েছে। অনেকেই এই বিষয়টি বুঝতে না পেরে কত রকমের যে ধানাইপানাই করতে থাকে এবং সেই ধানাইপানাইয়ের একেক রকম রূপ ও রঙ দেখে সরল পাঠকেরা দিশেহারা হয়ে পড়ে। অনেক শ্রদ্ধেয় ধানাইপানাই করনেওয়ালো পাঠকেরা তথা লিখকেরা কিছু বুঝতে না পেরে ইহার উপর একটি বিশেষণ তথা টাইটেল জুড়ে দেয় আর সেই টাইটেলটির নাম হলো ‘হরুফ আল মুকাত্তায়াত’ তথা বিচ্ছিন্ন অক্ষরসমূহ। পাঠকদের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে যে বিচ্ছিন্ন অক্ষরসমূহকেই হরুফে মুকাত্তায়াত বলা হয়।

কী চমৎকার টাইটেলটি আলিফ-লাম-মিমের মাথার উপরে টুপি পরানোর মতো পরিয়ে দিয়ে আবার গুরুগম্ভীর ভাষায়, শব্দচয়নের অলঙ্কারে সাধারণ মানুষকে বুঝিয়ে দেয় যে, ইহার তাৎপর্য তথা ব্যাখ্যা একমাত্র আল্লাহই জানেন। এই কথাগুলো বলেই গবেষকেরা খালাস পেতে চায়, মুক্তি পেতে চায়। কিন্তু কোরান বলছে : আল্লাহ পাক কোনো কিছুই কারণ ছাড়া তথা অকারণে বলেন না, তথা মানুষকে বুঝিয়ে দেবার জন্যই কোরান-এর কথাগুলো। অথচ না বুঝে, না শুনে, না গবেষণা করে, না ধ্যানসাধনা করে, ‘এই বিষয়গুলো আল্লাহই ভালো জানেন’ বলে একখানা খাসা বাক্য লিখে খালাস পেতে চায়। আফসোস! এইসব গবেষকেরা মনের ভুলেও একটি কথা লিখতে জানে না, আর সেই কথাটি হলো—কোরান-এর এই কথাগুলোর অর্থ আমাদের জানা নাই। ‘আমাদের জানা নাই’ কথাটি লিখলে তথাকথিত ইসলাম গবেষকদের মান-ইজ্জত আর থাকে না। তাই নরওয়ের বিখ্যাত দার্শনিক সোরেন কিয়ের্কেগার্ড বার বার তার শিষ্যদেরকে একটি কথা বলেছিলেন আর সেই মহামূল্যবান কথাটি হলো : হে আমার শিষ্যরা, জেনে রাখো, যে মানুষটি সব প্রশ্নের উত্তর গরগর গরগর করে দিতে পারে সে একজন বিপদজনক মানুষ। তার থেকে দূরে থেকে। কারণ তার থেকে জ্ঞান যতটুকু অর্জন

করতে পারবে তার চেয়ে বেশি অহঙ্কার তোমাদেরকে গ্রাস করে ফেলবে। (হবহ উদ্ধৃত নয়)।

মহানবি বলেছেন, আগুন যেমন কাঠ খেয়ে ফেলে, অহঙ্কার সে রকম মানুষের মানবিক গুণগুলোকে খেয়ে ফেলে। অধম লিখক ইয়তো কিছু লেখাপড়া করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, অনেক ইসলাম গবেষক, অনেক ধর্মের ধ্বজধারী, অনেক কোরান অনুবাদক, অনেক কোরান-এর তফসিরকারক আপন প্রবৃত্তির বেষ্টনীর দ্বারা বুঝতে না পেরে কত রকম ভিজাইনের যে গুল-মারা বিদ্যা লিখে গেছেন তার ইয়াত্তা নাই। একটি বারের তরেও গুল-মারা বিদ্যাটি ফেলে দিয়ে অকপটে বলে দিতে পারলো না যে, কোরান-এর এই আয়াতগুলো ব্যাখ্যা করার মতো জ্ঞান আমার নাই। অথবা, কোরান-এর এই আয়াতের মর্মার্থ উদ্ধার করতে পারলাম না।

‘জালিকাল কেতাব’ অর্থাৎ ‘ওইটাই কেতাব।’ বলা হয় নি, ‘হাজ্জাল কেতাব’ তথা ‘এইটাই কেতাব।’ ‘ওইটাই কেতাব।’ কোনটা কেতাব? বলা হয় নি জালিকাল কোরান, বলা হয় নি জালিকাল ফোরকান : বলা হয়েছে জালিকাল কেতাব তথা ওইটাই কেতাব। খাস নিয়তে, পবিত্র মন নিয়ে আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আস্থা ও ভয় রেখে আলিফ-লাম-মিম নামক আয়াতটির গবেষণা করে যান। অবশ্য অনেকেই আলিফ-লাম-মিমের রহস্যটি মোটামুটিভাবে লিখে গেছেন। সেই লেখা ভুল হোক, কিন্তু আন্তরিকতার প্রশ্নে পুরস্কার অবধারিত।

কোরান কোথাও কোরান-কে কেতাব বলেছে, আবার কেতাব শব্দটি দিয়ে আল্লাহর সৃষ্টিরাজ্যের প্রকাশ ও বিকাশের চলমান ধারাটিকে বুঝানো হয়েছে। ওইটাই কেতাব। কোনটা? আলিফ-লাম-মিমটাই কেতাব। বাক্যটি এখানেই শেষ। তাই কোরান-এর সর্বপ্রথমেই রহস্যলোকের রহস্যময় কথার একটি মাত্র বাক্য

মানবজাতির গালের উপরে প্রচণ্ড চপেটাঘাত। হজরত শাহ সুফি সদর উদ্দিন আহমদ চিশতি এই আলিফ-লাম-মিমের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণটি করেছেন। সেই ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণটি ভুলই হোক আর শুদ্ধই হোক, কিন্তু আন্তরিকতার প্রশ্নে নিজের বিবেককে ফাঁকি দেবার অবকাশটি রাখেন নি।

এই মহান আল্লাহর ওলি সুফি সদর উদ্দিন আহমদ চিশতি আলিফ লাম-মিম বিষয়টির উপর যে ব্যাখ্যাটি দিয়ে গেছেন উহাই হবহ তাঁর ভাষায়, তাঁর কোরান দর্শন নামক কোরান-এর তফসির হতে তুলে ধরলাম :

“আলে মিম (অর্থাৎ মোহাম্মদের বংশধর)

“আল এবং মিম অক্ষরের উপর চিরস্থায়ী মদ রহিয়াছে। তাহা ছাড়া মিমের উপর তসদীদ রহিয়াছে। মোহাম্মদ (আ) তাঁহার আল সহকারে সৃষ্টির মধ্যে জাহেরে এবং বাতেনে চিরন্তন হইয়া বিরাজমান রহিয়াছেন। এখানে ‘আল’ অর্থ নূরের বংশধর। আদিতে মোহাম্মদ ও অন্ত্রে মোহাম্মদ, মধ্যে মোহাম্মদ, তাঁহাদের সবাই মোহাম্মদ। সৃষ্টির আদি-অন্তে আল্লাহর প্রতিনিধি হিসাবে সর্বত্র তাঁহারাই কর্তাব্যক্তি। মিমের উপর তসদীদ

রহিয়াছে। ফলত : ইহার উচ্চারণে মীম দ্বিগুন হইতেছে অর্থাৎ মোহান্সদই মোহান্সদ।

“এই সংকেতটি ৬টি সুরার উদ্ঘাটিকারূপে বা প্রারম্ভিক সংকেতরূপে বর্ণিত হইয়াছে। যথা : সুরা বাকারা, আলে ইমরান, আনকাবুত, রুম, লোকমান এবং সেজদা।

“অনুবাদ : (২ : ১-৩) – আলে মোহান্সদ, উহা আল কেতাব, নাই তাহাতে সন্দেহের কোন অবকাশ—উহা একটি হেদায়েত সেই সকল মোস্তাকিদেদের জন্য যাহারা গায়েবের সহিত ঈমানের কাজ করে এবং সালাত দাঁড় করে এবং আমরা যে রেজেক দিয়াছি তাহা হইতে ব্যয় করে।

“ব্যাখ্যা : স্রষ্টার বিকাশ বিজ্ঞানকে কেতাব বলে। স্রষ্টার সকল প্রকার বিকাশ বিজ্ঞানের মধ্যে অর্থাৎ তাঁহার কেতাবসমূহের মধ্যে মোহান্সদের (আ) বংশধর হইলেন বিশিষ্ট একটি মহান কেতাব।

“অনুবাদ : (৩১ : ১-৩)– আলে মোহান্সদ—তাঁহারা বিজ্ঞানময় আল কেতাবের পরিচয়, (তাঁহারা) সৌন্দর্যের অনুশীলনকারীদের জন্য (বা সংকর্মশীলদের জন্য) একটি হেদায়েত ও রহমত।

“অনুবাদ : (৩২ : ১-২)– আলে মোহান্সদ রাব্বিল আলামীন হইতে আল কেতাবের নাজেল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।”

অধম লিখকের মতে, আলিফ-লাম-মিমের রহস্যময় ব্যাখ্যাটি তিনি যে অতি সংক্ষেপে দিয়েছেন উহা একটি চমৎকার ব্যাখ্যা। তা ছাড়াও এই আলিফ-লাম-মিম

বিষয়টির উপর অনেক ইসলাম গবেষক অনেক রকম ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়ে গেছেন। যে গবেষক যতটুকু বুঝতে পেরেছেন ততটুকুই ব্যাখ্যা লিখে গেছেন। অনেক গবেষক তো আবার ভেটো-মারা বিদ্যার সিলমোহরটি মেরে দিয়েছেন। বলেছেন, এই আলিফ-লাম-মিমের অর্থটি আল্লাহই ভালো জানেন। এটা কোনো যুক্তিসঙ্গত কথা হলো? আল্লাহ তো সবই জানেন, এটা একটা অতি সাধারণ মানুষও জানে। যেহেতু আল্লাহ কথাটি বলেছেন এবং আল্লাহ বলেছেন কোনো কিছুই আমি অনর্থক বলিও না, সৃষ্টিও করি না— এরপরেও আল্লাহর উপর বিষয়টি চাপিয়ে দিয়ে নিজেকে খালাস করার প্রচেষ্টাটি কতটুকু গ্রহণযোগ্য তা পাঠকেরাই বিচার করবেন।

গবেষণায় ভুল হোক এতে আপত্তি নাই, কিন্তু আপত্তিটি তখনই করা যাবে যখন আন্তরিকতার প্রশ্ন নিয়ে বিতর্কিত হতে হয়। অবশ্যই আল্লাহ প্রতিটি মানুষের অন্তরের আন্তরিকতাটি বুঝেন। কেবলমাত্র একটি দুঃখই থেকে যায় আর সেই দুঃখটি হলো এই আলিফ-লাম-মিমের রহস্যটি ‘আমি বুঝতে পারলাম না’ বলে অকপটে স্বীকার না করা।

এই কেতাবের সব কিছু বোঝা যে একটি অসম্ভব ব্যাপার, বিশেষ করে একজনের পক্ষে, তা কোরান-এর সূরা লোকমানের ২৭ নম্বর আয়াতেই বলে দেওয়া হয়েছে। অতি সংক্ষেপে বলছি : দুনিয়ার সব পানি যদি

কালি হয়, এবং গাছগুলো যদি কলম হয়, তবুও কেতাবের ব্যাখ্যা করাটি সম্ভবপর হবে না। শুধু তাই নয়, বরং আরও জোর দিয়ে কোরান বলছে, এরকমভাবে দুনিয়ার সব পানি যদি সাতবার পানিও হয়, দুনিয়ার সবগুলো গাছ যদি সাতবার কলমও হয়, তবু কেতাবের ব্যাখ্যা লিখে শেষ করা যাবে না। যেখানে দুনিয়ার সামান্য কালি-কলম এবং ছাপাখানার মেশিন দিয়েও শেষ করা যাচ্ছে না সেখানে দুনিয়ার সমস্ত পানির তুলনায় এই কালির অবস্থানটি কতটুকু হতে পারে তা বিচারের ভারটি পাঠকের হাতেই তুলে দিলাম।

আমরা অজ্ঞানতার কারণে একে অপরকে এইসব বিষয় নিয়ে কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি করি। অথচ যাকে যতটুকু বুঝবার—জ্ঞানবার রহমত আল্লাহ দান করেছেন, সে ততটুকুই বুঝতে এবং জানতে পারবে। সুতরাং কটাক্ষ করাটা সমীচীন মনে করি না।

পরম শ্রদ্ধেয় ইমাম কুরতুবি তাঁর তফসিরে বলেছেন : এই আলিফ-লাম-মিমের অর্থটি একমাত্র আল্লাহই জানেন। সুতরাং ইহার অর্থ আল্লাহর হাতেই থাকবে, কোনো মানুষ উহার ব্যাখ্যা প্রদান করবে না। ইমাম কুরতুবির মতে, এই আলিফ-লাম-মিমের ব্যাখ্যাটি কোনো মানুষের লিখা উচিত নয়।

আল্লাহর এই রহস্যময় জ্ঞানের গাঢ়িটি যদি তাঁর কাছেই থাকতে দেওয়া হোক বলে উপদেশ দেন তা হলে প্রশ্নটি আসে, এই গাঢ়িটি আল্লাহ কেন কোরান-এ প্রকাশ করলেন? শুধু প্রকাশই নয়, বরং সোজা আল্লাহ প্রথমেই বলে ফেলেছেন, ‘ওইটাই কেতাব।’ অথচ কোরান পড়লে আমরা দেখতে পাই, কেবল নবি-রসুলদেরই নয়, বরং আল্লাহর আবদালদেরকেও কেতাব দান করার কথাটি বলা হয়েছে। ‘ওইটাই কেতাব’ তথা উপরের আলিফ-লাম-মিমটাই কেতাব। এখানে ‘জালিকাল’ শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে, ‘হাজ্জাল কেতাব’ শব্দটি ব্যবহার করা হয় নি। তা হলে আমরা দেখতে পাই, একদিকে নবি-রসুল এবং আবদালদের কেতাব দেওয়া হয়েছে, অন্যদিকে পরম শ্রদ্ধেয় কুরতুবি সাহেব আল্লাহর হাতেই বিষয়টি রেখে দেবার উপদেশটি দান করেছেন। ইহাতে কি স্পষ্ট আত্মবিরোধটি দেখতে পাওয়া যায় না?

কেতাবের জ্ঞানটি তো আল্লাহই দান করার কথাটি বলেছেন বার বার। অথচ ‘ওইটাই কেতাব’ বলে বাক্যটিকে শেষ করা হয়েছে তথা ‘আলিফ-লাম-মিম জালিকাল কেতাব’ তথা ‘আলিফ-লাম-মিম ওইটাই কেতাব’ বলে বাক্যটি শেষ করে দেওয়া হলো। তারপরেই কিছু বলা হয়েছে : এই কেতাবের রহস্যটি কেবলমাত্র মুত্তাকিরাই বুঝতে পারবে তথা পথের সন্ধান

পাবে তথা রহস্যলোকের রহস্যময় কথাগুলো বুঝতে পারবে। আবার মুঠাকি হবার শর্তটি তার পরের আয়াতে দেওয়া হয়েছে। শর্তটি একটি একটি করে দেওয়া হয়েছে। প্রথম শর্তটি হলো : মুঠাকিদেবকে বিল গায়েবের উপর তথা অদৃশ্যের উপর ইম্মান আনতে হবে তথা বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। দ্বিতীয় শর্তটি হলো : সালাত কায়েম করতে হবে, তথা আল্লাহর সঙ্গে কেমন করে যোগাযোগ করতে হবে সেই যোগাযোগের পদ্ধতিটি, ফর্মুলাটি জেনে নিতে হবে— তা সেটা ম্লেজাজি সালাতের মাধ্যমেই হোক আর হাকিকি সালাতের মাধ্যমেই হোক, তা সেটা ওয়াস্তিয়া সালাতের মাধ্যমেই হোক আর দায়েমি সালাতের মাধ্যমেই হোক। যদিও মহানবি বলে গেছেন : ‘আস্ সালাতুদ্ দায়েমি আফজালুম মিনাল সালাতিল ওয়াস্তি’ তথা ‘ওয়াস্তিয়া নামাজ হতে দায়েমি সালাতের মর্যাদা অনেক বেশি উন্নত। এই কথাটি কেবল হাদিসেই বলা হয় নি, বরং কোরান-এর ৭০ নম্বর সূরা আল মারেক্কের ২৩ নম্বর আয়াতেও আল্লাহ বলছেন : ‘আল্লাখিনাহম আলা সালাতিহিম দায়িমুনা’ অর্থাৎ ‘যারা দায়েমি সালাতের উপর দৃষ্টিমান।’

ঢাকাইয়া ভাষায় বলে : ‘কচু কাটতে কাটতেই ডাকাইত হয়।’ আমরাও বলতে চাই, এই ওয়াস্তিয়া সালাতের অনুশীলনের মাধ্যমেই একদিন দায়েমি

সালাতের অধিকারী হয়। তারপরের শর্তটি হলো : রেজেক বণ্টন করতে হবে, যে-রেজেক আল্লাহ কর্তৃক দেওয়া হয়েছে। বিষয়সম্পদের রেজেকটি মেকাজ্জি রেজেক আর আধ্যাত্মিক রহস্যময় জ্ঞানগুলোকে বিতরণ করার নামটি হলো হাকিকি রেজেক। আমরা অনেকেই মেকাজ্জি আর হাকিকির বিষয়গুলোকে এক করে মহা লাবড়া পাকিয়ে ফেলি আর এই লাবড়া পাকানোর ফলেই মোহাম্মদি ইসলামের (?) ৭৩টি ফেরকা দেখতে পাই। এটা খুব বেশি একটা নতুন কিছু নয়, এটা খুব বেশি একটা অবাক হবার বিষয়ও নয়। কেন? কারণ ইহুদিদের আমলে ইব্রাহিমি ইসলামকে (?) ৭১টি ভাগে ভাগ করে ফেলেছিল এই মতভেদ এবং বিভিন্ন রকম ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের কারণে। তারপর আমরা দেখতে পাই, ইসাযি ইসলামের (?) মতভেদটিও আরও এক ডিগ্রি উপরে উঠে গেল। ইসাযি ইসলামের (?) মাঝেও মতভেদ বিভিন্ন রকম ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের ফলে তা ৭২ ফেরকায় বিভক্ত হয়ে গেল। পাঠকদেরকে মনে করিয়ে দিতে চাই যে এই কথাগুলো অধম লিখকের কথা নয়, বরং মহানবির কথা তথা হাদিস। (হবহ উদ্ধৃত নয়)।

সুফিয়ান আসসাওয়ারিহ মতে মুজাহিদ হতে ইবনে আবু নজিহ বলেছেন যে তিনি বলেছেন : আলিফ-লাম-মিম, হা-মিম, আলিম-লাম-মিম সোয়াদ- এইগুলো হলো কোরানুল হাকিম-এর চাবি। বন্ধ দরজার তালা

খুলতে যেমন চাবির প্রয়োজন হয়, এই শব্দগুলিও কোরান-এর দরজা খোলার চাবি। মুজাহিদ হতে আরও বড় বড় ইসলাম গবেষকেরা একই রকম মন্তব্য করেছেন। আবার মুজাহিদের আরেক রকম কথায় ইবনে আবু নজিহ

হতে শিবলি ও তার নিকট হতে আবু হজায়ফা, মুসা ইবনে মাসউদ তারাও সবাই একবাক্যে বলেছেন যে, আমরা গবেষণা করে দেখলাম, আলিফ-লাম-মিম কোরান-এর অন্যতম নাম। প্রশ্ন থেকে যায়, এই কালির অঙ্করের ছাপার কাগজে লেখা কোরান-এর নাম, নাকি কোরান যে হাকিকতে তথা মূলে নুরময় সে কোরান-এর নামটি আলিফ-লাম-মিম তাঁরা বলেছেন? এই কথাটি উল্লেখ করা হয় নি যে, আলিফ-লাম-মিমটি কি ম্লেজাজি কোরান-এর অন্যতম নাম, নাকি নুরি কোরান-এর অন্যতম নাম। এদের কথার সঙ্গে একমত হয়ে ইসলাম গবেষক কাতাদাহ এবং জায়েদ ইবনে আসলামও ওই একই কথাই বলেছেন তথা পূর্ণ সমর্থন দিয়েছেন।

দামি ক্যামেরায় বাঘ-সিংহের সুন্দর এবং স্পষ্ট দু'টি বড় ছবি দেখলে সবাই বাঘ আর সিংহই বলবে, কিন্তু এই বলাটা মোটেই মিথ্যা নয়, যদিও হাকিকতে মিথ্যা এবং ম্লেজাজিতে একদম সত্য। বুকে হাত রেখে বলুন তো, ওই বাঘ আর সিংহের ছবি দুটো কি আসলেই বাঘ-সিংহ নাকি তাদের ম্লেজাজি রূপ? তা হলে হাকিকতের বাঘ আর সিংহ তথা আসল বাঘ আর সিংহ দেখতে হলে আপনাকে অবশ্যই চিড়িয়াখানায় যেতে হবে। কাগজ-কালির আঁচড়ে লেখা ম্লেজাজি কোরান-টির ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ দুনিয়ার বড় বড় মাদ্রাসায় করা

হয়। আবার নুরি কোরান-এর তথা হাকিকি কোরান-এর তথা আসল কোরান-এর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণটি করার যদি কারও প্রবল ইচ্ছা থাকে তা হলে পীরের আদেশ মতো হেরাশুহার মতো নির্জন স্থানে দশ-পনের বছর অবিরাম ধ্যানসাধনা ও মোরাকাবা-মোশাহেদা করতেই হবে। কারণ নুরি কোরান-এর কোনো অক্ষর নাই : মেজাজি কোরান-এর অক্ষর আছে, শব্দ আছে, বাক্য আছে। অবশ্য নুরি কোরান-এর শিক্ষালাভ করার তরে নির্জনে ১০/১৫ বছর ধ্যানসাধনা করাটি হাতে গোনা কিছু গবেষক করে যান। এই জাতীয় গবেষকদের গবেষক না বলে পীর, মুরশিদ, ওলি, গাউস, কুতুব, আবদাল এবং আরিফ বলাই উচিত। তাঁদের মতো হাকিকি কোরান-এর জ্ঞানে যারা জ্ঞানী তাদের কাছে প্রথমে মুরিদ হতে হবে। মেজাজি কোরান জ্ঞানতে হলে যেমন মাদ্রাসায় গিয়ে মাদ্রাসার গুরুদের কাছে শিখে নিতে হয়, জেনে নিতে হয়, বুঝে নিতে হয় এবং অনেক রকম ফেরকাবাজির ব্যাকরণের ঘোরপ্যাচ শিখে নিতে হয়। মাদ্রাসার গুরুরা মেজাজি কোরান-এর পীর আর হাকিকি কোরান-এর তথা নুরি কোরান-এর রহস্য জ্ঞানতে হলে নুরি কোরান-এর রহস্য যিনি জেনেছেন তাঁর কাছে মুরিদ হতেই হবে। সুতরাং মাদ্রাসায় মেজাজি কোরান-এর শিক্ষাদানকারী পীর বা গুরুকে যেমন কোনোক্রমেই অবহেলা অথবা অবজ্ঞা প্রদর্শন করা যায়

না, হাকিকি কোরান তথা নুরি কোরান-এর বেলাতেও ওই একই কথা প্রযোজ্য।

ইসলাম গবেষক কাতাদাহ এবং জায়েদ ইবনে আসলামের মতামতের সঙ্গে আর এক ইসলাম গবেষক আবদুর রহমান ইবনে জায়েদ ইবনে আসলামের মতামতটি প্রায় একই রকম দেখতে পাই। অবশ্য কোরান-এর নাম এবং সুরার নাম এই দু'টি মতের মধ্যে কোনো পার্থক্য দেখতে পাই না। কারণ কোরান-এর সুরাগুলো কোরান-এর ভেতরেই অনেক রকম নামে অভিহিত হয়েছে।

আবার অন্য একটি ইসলাম গবেষকের দল বলেছেন যে এই মতটি অবাস্তব। এই অবাস্তব হবার কারণটি তারা দেখিয়েছেন এই বলে যে আলিফ-লাম-মিম-সোয়াদ বলতে কখনই পূর্ণ কোরান বোঝায় না, বরং সুরা আরাফকেই বোঝায়। এই জাতীয় গবেষকেরা বলেন, সুরার নাম আর কোরান-এর নাম এক কথা নহে। অধম লিখক একজন পচা ইসলাম গবেষক। আমি এই পরম শ্রদ্ধেয় গবেষকদের সঙ্গে একমত হতে পারলাম না। কেননা সমগ্র কোরান-এর কথা ও দর্শন মাত্র হাতে গোনা কয়েকটি ফর্মুলার মধ্যেই নিরন্তর ঘূর্ণায়মান। অবশ্য এই পরম শ্রদ্ধেয় গবেষকদেরকে একদম ফেলে দেওয়া যায় না। কারণ সুন্দর বনের রয়েল বেঙ্গল টাইগার আর দুনিয়ার তাবৎ জঙ্গলের টাইগারদের নকশা-পড়চা, দাগ নম্বর, খতিয়ান নম্বরে সামান্য কিছুটা পার্থক্য থাকতে পারে, কিন্তু হরিণ শিকার করার

প্রশ্নে এরা সবাই ভয়ঙ্কর চালাক চতুর। অবশ্য এই গবেষকেরা এই মতামতগুলো জানিয়ে দেবার পরও পরিতৃপ্ত হতে পারেন নি। সংশয় তথা নিহুবে চিন্তদাহ হওয়াতে অকপটে বলে ফেলেছেন যে, আল্লাহই সবচাইতে ভালো জ্ঞানেন, তথা ভেটো মারার বিদ্যাটি জাহির করে ফেললেন, তথা আল্লাহর স্বক্কে বিষয়গুলোর রহস্য ছেড়ে দিলেন। অবশ্য যে গবেষক যে রকমভাবে বুঝতে পেরেছেন, সেই গবেষক আন্তরিকতার সহিতই ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করে গেছেন। ইহাতে সন্দেহের অবকাশ থাকার কথা নয়।

আবার আরেক দল ইসলামের গবেষক বলে থাকেন, আলিফ-লাম-মিম- ইহা আল্লাহরই নাম। ইসলাম গবেষক শাদ শাবি বলেন আল্লাহ জাল্লা শানাহ-র ইশারা ইঙ্গিতের নামে সুরা শুরু করা হয়েছে। এই গবেষকের সঙ্গে আরও দুইজন ইসলামের গবেষক সালেম ইবনে আবদুল্লাহ এবং ইসমাইল ইবনে আবদুর রহমান এই রকম কথাই বলেছেন। আবার অন্য এক ইসলাম গবেষক আল শুদ্দি হতে শুবা বিবরণ দিয়েছেন, ‘আমার নিকট এই রকম একটি খবর জানতে পেরেছি যে হজরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন : আলিফ-লাম-মিম আল্লাহ জাল্লা শানাহর একটি প্রধান নাম।’ অধম লিখকের মতে হজরত ইবনে আব্বাসের এই কথাটি খুবই সুন্দর এবং রহস্যময়। কিন্তু ইহার ব্যাখ্যা-

বিশ্লেষণটি বিস্তারিত দেওয়া তো দূরে থাক, একটি কথাও লিখে যান নি।

শুবা-র বর্ণিত হাদিসটিকে সমর্থন দিয়ে ইসলাম গবেষক ইবনে জারির বিদ্বার হতে তিনি ইবনে মাহদি হতে এবং তিনি শুবা হতে বর্ণনা করেছেন যে, শুবা বলেছেন, ‘আমি শুদ্ধিকে হা-মিম, তোয়া-হা-মিম ও আলিফ-লাম-মিম সম্পর্কে প্রশ্ন করাতে তিনি বলেছেন : হজরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন উহা আল্লাহরই বিশেষ নাম।’ হজরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর এই বর্ণনাটিকে ইবনে জারির বলেছেন, ‘আমাকে মোহাম্মদ ইবনুল মুসনি, আবু নুমান ও শুবা ইসমাইল আল শুদ্দি হতে তিনি মোররাহ আল হামদানি হতে এই বর্ণনা শোনান যে, মোররাহ আল হামদানি বলেছেন এবং আবদুল্লাহ বলেছেন, মাওলা আলি (আ.) ও হজরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতেও একই রকম বর্ণনা পাওয়া যায়।’

কেন এতগুলো ডকুমেন্ট তথা দলিল-দস্তাবেজ পাঠকদের কাছে তুলে ধরলাম? তুলে ধরলাম এ জন্য যে, হজরত শাহ সুফি সদর উদ্দিন আহমদ চিশতি যে আলিফ-লাম-মিম দ্বারা ‘আলে মিম’ তথা মোহাম্মদের বংশধরদেরকেই বোঝানো হয়েছে তার সুন্দর ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণগুলো দিয়েছেন তা সুন্দরভাবে প্রমাণিত হয়ে গেল। আবার আলি ইবনে আবু তালহা বলেছেন : উহা কসম বিশেষ। আল্লাহ ইহার দ্বারা কসম করেছেন। আসলে উহা আল্লাহর নাম। আবার হজরত ইকরামা হতে খালিদ আল হিজাহ, ইবনে আলিয়া, ইবনে জারির ও ইবনে আবু হাতিম বলেছেন যে হজরত ইকরামা বলেছেন : আলিফ-লাম-মিম একটি শপথবাক্য। অধম

লিখক এইখানে একমত হতে পারলাম না। কারণ আলিফ-লাম-মিম-এর পরেই বলা হয়েছে জালিকাল কেতাব-তথা আলিফ-লাম-মিম ওইটাই হলো কেতাব। কেতাব কী করে শপথ হতে পারে ইহা আমার জ্ঞানা নাই। কারণ আল্লাহ কোরান-এর আরও অনেক স্থানে কসম খেয়েছেন, কিন্তু এইখানে কসম খাবার নামগন্ধটিও নাই। তা হলে ইহা কেমন করে কসম হয়? কারণের মাধ্যমেই কার্যের প্রতিফলন ঘটে। কারণের মাধ্যমেই কর্মের বিকাশ ঘটে। সেই বিকাশটি চলমানই হোক, আর স্থিরই হোক, আর আপেক্ষিকতার অবগুণ্ঠনেই থাক, আর বিবর্তনবাদের ক্রমাবয়ে ধাপে ধাপে আল্লাহর শান-মান- জালুয়াগুলোর প্রকাশই হোক। কারণ আল্লাহর আরেক নাম জুলজালাল। ইহার ভাবার্থটি হলো পৃথিবী নামক গ্রহে এক সেকেন্ডে ৬০০ কোটি মানুষের চালচলন, প্রকৃতির জলবায়ুর রূপবদল, খাল-বিল-নদী-নালা সাগরের গহীনে মৎস্য নামক জীবদের চালচলন ইত্যাদি এক সেকেন্ডে, ধরে নিলাম ১০ হাজার কোটি, একেক রকম রূপ-রঙ-চং দেখানোর পর আর কোনোদিন কোনো কালেও সেই রূপটি দেখানো হয় না। তাই তিনি কারামতওয়ালা জুলজালাল। সম্ভবত সমগ্র কোরান-এ এটাই আল্লাহর সবচাইতে বড় অহঙ্কার (আল্লামা ইকবালের মতে)।

আবার অন্যত্র হজরত ইবনে আব্বাস (রা.) এ রকম কথাও বলেছেন যে আলিফ-লাম-মিমের অর্থটি হলো, ‘আনাল্লাহু আলামু’ তথা ‘আমি আল্লাহ অধিক জানি।’ এই কথার সঙ্গে ইসলাম গবেষক সাঈদ ইবনে জুবায়েরও একমত পোষণ করেন। এই কথাটিতে অধম লিখক মোটেই একমত হতে পারলাম না, কারণ আল্লাহই সব জানেন, এটা সাধারণ মুসলমান তো বটেই, অন্য ধর্মের অনুসারীরাও একমত। সূর্যের সাক্ষ্য এবং চাঁদের সাক্ষ্য দেবার মতো এই গ্রহে আর দ্বিতীয় সাক্ষীটি পাওয়া যায় না। ইহা বললেও যা, না বললেও তা। কিন্তু এই কথাটি কিছুটা হলেও মেনে নেওয়া যেত, যদি ‘জালিকাল’ কেতাব তথা ওইটাই কেতাব কথাটি না থাকতো। ‘জালিকাল

কেতাব’ কথাটি কোরান-এ থাকতেই বিশ্বমানবকে কেতাবের রহস্যটি উদ্ঘাটন করার আশ্বাস জানানো হয়েছে। যেমন— ‘লা তাকরাবুস্ সালাতা’ তথা ‘নামাজের ধারে কাছেও যেয়ো না’ বলে বাক্যটি শেষ করা হয় নি, বরং পরের অংশটিতে বলা হয়েছে, ‘ওয়া আন্তুম গুকারা’ তথা ‘নেশাগ্রস্ত অবস্থায়’ তথা মাতাল অবস্থায়। এই শেষের বাক্যটি না উল্লেখ করা হলে নামাজের বিষয়টি যে কোরান-এ ৮২ বার বলা হয়েছে উহার মূল্যায়নটি আর থাকছে কোথায়? সুতরাং আলিফ-লাম-মিম দিয়ে যদি বাক্যটি শেষ করা হতো

তবে অধম লিখকের বলার কিছুই থাকতো না, কিন্তু চিন্তা করার প্রশ্নটি, ভেবে দেখার বিষয়টি তখনই আসে যখন বলা হলো : ওইটাই কেতাব।

নবি-রসুলদের কেতাব দান করা হয়েছে, কিন্তু আবদালদেরও যে কেতাব দান করা হয়েছে সেই কথাটি কোরান-এর বেশ কয়েকটি সূরাতে আমরা দেখতে পাই। হ্যাঁ, অবশ্যই মেনে নেব, আল্লাহর এই কেতাবে জ্ঞানের গভীরতার প্রশ্নে, ব্যাপকতার প্রশ্নে ছোট-বড় থাকতে পারে। যেমন, পাঁচ কেজি ওজনের মোমবাতি জ্বালালে যে আলো ছড়ায়, পাঁচ টাকা দামের মোমবাতিতে সে রকম আলো ছড়ানোর প্রশ্নই আসে না— অথচ উভয়টির উৎসই আলো, কিন্তু প্রকাশের প্রশ্নে, ব্যাপকতায় অনেক বড় হেরফের দেখতে পাই।

সূরা কাহাফে খিজিরের তিনটি ঘটনা জ্ঞাদরেল নবি মুসা কালিমুল্লাহ (আ.), যার নামটি কোরান-এ সম্ভবত ১৩৫ বার উল্লেখ করা হয়েছে, সেই নবি খিজির নামক ওলির জ্ঞানের মাখামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারলেন না, বরং উল্টা-পাল্টা লাইন-ছাড়া ঘটনাগুলোর অবতারণা দেখে তিনবারই প্রশ্ন করে ফেলেছিলেন। শর্তও ছিলো, তিনবার যদি ধৈর্যধারণ করতে না পারেন তা হলে বিদায় নিতে হবে। তাই নবি মুসা (আ.) বিদায় নিতে বাধ্য হলেন। এখানে কয়েকটি বিশেষ রহস্যপূর্ণ কথা বলতে হয়। প্রথমেই বলতে হয়, সূরা কাহাফের কোথাও খিজির

নামটি নাই, আছে ‘আবদুহ’। এই আবদুহরাই আধ্যাত্মিক জ্ঞানের চরম পর্যায়ের সদস্য। এই আবদুহদের উপর আল্লাহ আর কোনো জ্ঞানী তৈরি করেন নাই। সুরা বনি ইসরাঈলের প্রথম আয়াতটি ভালো করে বার বার পড়ে দেখুন তো! উহাতে কি নবিরসুলের কথাটি বলা হয়েছে, না ‘আসরা বে আবদিহি লাইলান্’ কথাটি বলা হয়েছে? তা হলে খিজির কথাটি কোথা হতে এল? খিজির শব্দের অর্থ হলো চিরস্থায়ী, চিরসবুজ। এই সবুজ কখনই বিবর্ণ রূপধারণ করে না।

তারপরের প্রশ্নটি হলো, মুসা (আ.)-র মতো জাদুরেল নবির গুরু হয়ে যাচ্ছেন আল্লাহর ওলি। আর সেই আল্লাহর ওলিদেরকেই ওহাবি এবং বাটালভি ফেরকার অনুসারীরা বেমানুষ অস্বীকার করে যায়। মুসা নবির সামনে খিজির নামক আবদুহর মর্যাদার স্থানটি কত উঁচুতে তা-ও কি বলে দিতে হবে? হাতের আঙুল কি কেউ আয়না দিয়ে দেখে?

মানুষের শেষ সম্বলটির নাম হলো বিবেক। সেই বিবেকটিকে নিরপেক্ষ না রেখে অহঙ্কারের বানানো অন্ধকার গর্তে যারা মাটিচাপা দিয়ে ফেলে তারা যেন নিজেরাই নিজেদের ডায়েরিতে লিখে রাখেন : আজ আমি পশুর চেয়েও অধমে পরিণত হয়ে গেলাম।

এখানে এসেই দার্শনিক সোরেন কিয়ের্কেগার্ডের কথাটি বার বার মনে পড়ছে, আর সেই কথাটি হলো : ‘যিনি সব প্রশ্নের উত্তরগুলো গরগর গরগর করে দিয়ে ফেলেন, তিনি একজন বিপদজনক মানুষ। তার থেকে

দূরে থেকে।’ কেন এই কথাটি দার্শনিক সাহেব বললেন? বললেন এই জন্য যে, এরা জ্ঞানের নামে অনেক রকম কথার নমুনা তুলে সরল মানুষদেরকে বিভ্রান্ত করে, দিশেহারা করে তোলে, সিদ্ধান্তহীনতার বিষণ্ণতা নামক সাইকোলজিকাল রোগে ভোগায়। কারণ যে বা যিনি সব কিছু বুঝে গেছেন, জেনে গেছেন তাকে আর বোঝানোও যায় না, জানানোও যায় না। মনে হয় এদের অন্তরেই অজ্ঞতার অন্ধকারের অহঙ্কারের সিলমোহরটি আল্লাহ মেরে দিয়েছেন।

ইসলাম গবেষক আবু শুদ্দি আবু মালেক এবং আবু সালেহ হতে ইবনে আব্বাস (রা.)-এর এক বর্ণনা এবং মুররাতুল হামদানি ইবনে মাসউদ-এর এবং অন্য এক সাহাবির বর্ণনাটি তুলে ধরেছেন। উহাতে বলা হয়েছে : ‘আলিফ-লাম-মিম তিনটি বর্ণ আল্লাহর নাম।’

ইসলাম গবেষক আবু জাফর আর রাজি রবি ইবনে আনাস এবং তিনি আবুল আলিয়া হতে বর্ণনা করেন : আল্লাহর কলামে আলিফ-লাম-মিম তিনটি অক্ষর আরবি ২৯টি অক্ষরের মধ্যেই অবস্থান করে। তবে উহাতে সব রকম রহস্যই লুকিয়ে আছে। আল্লাহর রহস্যের দরজা কেউ যদি খুলতে চায় তা হলে প্রতিটি অক্ষরই তালা লাগানো দরজায় চাবি। এই তিনটি অক্ষর বিশেষ চাবি। আবার, ইসলাম গবেষক ইবনে আবু হাতিম বলেছেন। ‘আলিফ আল্লাহর নামের প্রথম অক্ষর, লাম আল্লাহর লতিফ তথা মেহেরবান নামের এবং মিম আল্লাহর মজিদ তথা মহিয়ান নামের প্রথম অক্ষর। আলিফ দিয়ে আলাউল্লাহ তথা আল্লাহর নিয়ামত, লাম দিয়ে লুৎফুল্লাহ তথা আল্লাহর করুণা ও অনুকম্পা এবং মিম দিয়ে মাজ্দুল্লাহ তথা আল্লাহর মহিমাবিত

উদারচিত্ততা প্রকাশ পায়।' তিনি আরও একটি বিষয়ের অবতারণা করেছেন, যে বিষয়টির আগা-মাথা অধম লিখক কিছুই বুঝতে পারি নি। আর তা হলো : আলিফ দিয়ে এক বছর, লাম দিয়ে তিরিশ বছর এবং মিম দিয়ে চল্লিশ বছর বোঝাতে চেয়েছেন।

এই যে 'আলিফ-লাম-মিম জালিকাল কেতাব' বাক্যটির একেক ইসলাম গবেষক একেক রকম ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ প্রদান করেছেন, ইহাই গবেষণার প্রশ্নে চিন্তার স্বাধীনতার পরিচয় বহন করে। এমনকি মহানবির মহান কয়েকজন সাহাবার ব্যাখ্যাটিও তুলে ধরলাম। তুলে ধরলাম এই জন্য যে, যদি পাঠকেরা একটু খেয়াল করে দেখেন তা হলে দেখতে পারেন যে এই কথাগুলোর একটিও মহানবির বর্ণিত হাদিস নয়। এই জন্য ইসলাম গবেষকদের এবং কয়েকজন মহান সাহাবাকে আমরা আন্তরিক মোবারকবাদ জানাই। আমরা আরও মোবারকবাদ জানাই এই জন্য যে, কোনো গবেষকই মহানবির হাদিস বলে উল্লেখ করেন নি, বরং নিজেদের আন্তরিক গবেষণার ফলটি অকপটে প্রকাশ করে গেছেন। সুতরাং যে যতটুকু আল্লাহর জ্ঞানের বোঝা বইবার উপযুক্ত, সে বা তিনি ততটুকুই বর্ণনা করতে পারেন।

পরিশেষে আরও একটু কথা থেকে যায় বলে পুনরায় বাধ্য হয়ে লিখতে হলো, আর সেটা হলো হজরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেছেন, 'আলিফ-লাম-মিম – আলিফ অর্থ আল্লাহ, লাম অর্থ জিবরাইল এবং মিম অর্থ মোহাম্মদ।' আবার এ-ও বলা হয়েছে যে, আলিফ দিয়ে

আল্লাহর দানসমূহ, লাম দিয়ে তাঁর দয়া এবং মিম দিয়ে আল্লাহর প্রভুত্ব বুঝানো হয়েছে।

আবদুল্লাহ ইউসুফ আলি তাঁর ইংরেজি ভাষায় রচিত বিশ্ববিখ্যাত দ্য হোলি কোরান-এ বলেছেন ‘বাহ্যিক জ্ঞান দিয়ে রহস্যময় জ্ঞানের অর্থটি বোঝা যায় না, যদিও কোরান নিজেই ঘোষণা করেছে একটি প্লেইন বুক তথা সহজবোধ্য কেতাব হিশাবে। যদিও সহজবোধ্য কেতাব আল্লাহ বলেছেন তারপরেও একটি কথা থেকে যায় আর সেটা হলো, কত অল্প লোকেই না এটা বুঝতে পারে।’ তিনি আরও বলেছেন, ‘যিনি যতটুকু বুঝবার শক্তি অর্জন করেছেন, তার উপলব্ধির ব্যাপকতাও ততটুকু।’

পরম শ্রদ্ধেয় আবদুল মজিদ দরিয়াবাদি তাঁর কোরান-এর তফসিরে আলিফ-লাম-মিম বিষয়টিতে কিছু নূতন কথা যোগ করেছেন। উনি বুঝাতে চেয়েছেন যে, মিস্টিসিজম তথা রহস্যবাদের দিকে অগ্রসর হবার জন্য আলিফ-লাম-মিম এই তিনটি অক্ষর সংকেত স্বরূপ। কোরান যদিও একটি সম্পূর্ণ জীবন-বিধান এবং একটি জীবন-দর্শন, তারপরও বলতে হয় যে কোরান-এ যে একটি রহস্যলোকের দর্শন রূপক ভাষায় দেওয়া হয়েছে উহাই সর্বপ্রথম বলা হয়েছে। পরম শ্রদ্ধেয় আবদুল মজিদ দরিয়াবাদি আরও একটি চমৎকার উদাহরণ টেনে বলেছেন যে, ওল্ড টেস্টামেন্ট তথা পুরাতন নিয়ম যে ভাষায় নাজেল হয়েছিল সেই

ভাষাতেও এই রকম অন্ধরের সমাহার ছিলো। হিন্দুধর্মের বেদ-পুরাণ এবং গীতা-তে সংস্কৃত ভাষায় এই রকম অন্ধরসমূহ আছে কি না অধম লিখকের তা জ্ঞানা নাই। যদি এই রকম সাংকেতিক অন্ধরের সমাহার থেকেই থাকে তা হলে কোনো হিন্দুধর্ম বিশেষজ্ঞ জ্ঞানিয়ে দিলে কৃতার্থ হবো। তবে হিন্দু একজন মহাপুরুষ মহাদেব বলেছেন যে, যে-ধর্মে রহস্যলোকের কথা নাই তথা অধ্যাত্মবাদের শিক্ষা নাই, উহা কোনো ধর্মই নহে। উহা উদ্দেশ্যবিহীন সৈনিক ধর্ম পালন করা ছাড়া আর কিছুই নয়।

একটি কথা যদিও এই বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত নহে, তবু তিনটি ধর্মে এক রকম কথা পাবার মিলটি পাওয়া যায়, উহা আমার রচিত সুফিবাদ আত্মপরিচয়ের একমাত্র পথ-এর ৪র্থ খণ্ডে বিস্তারিত ব্যাখ্যাসহ বলা হয়েছে। সেই কথাটি অতি সংক্ষেপে বলছি আর তা হলো, মহানবির কাছে নাজেল হওয়া কোরান-এর সর্বশেষ আয়াতটি: যদিও এই সর্বশেষ আয়াতটি একটি বিরাট সুরার চিপি-র ভেতর রেখে দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে: ‘আজ তোমাদের ধর্মটিকে পরিপূর্ণ করে দিলাম।’ ঠিক এই রকম কথাটি ভগবান শ্রীকৃষ্ণও বলেছেন এবং ইসাযি মুসলমান ধর্মের নবি হজরত ইসা (আ.) তথা যিশুখ্রিস্ট একই রকম কথা বলেছেন। যেহেতু সুফিবাদ আত্মপরিচয়ের একমাত্র পথ-এর চতুর্থ খণ্ডে এই বিষয়টির বিস্তারিত ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ দেওয়া হয়েছে তাই এখানেই শেষ করলাম।

‘আলিফ-লাম-মিম’ সম্বন্ধে যত গবেষকেরা গবেষণা করে কিছু একটা লিখে গেছেন তার সামান্য কিছু নমুনা তুলে ধরার পর এবার অধম

লিখকের গবেষণার ফলটি লিখছি। আলিফ অর্থ হলো পুরুষশক্তি,

লাম হলো মিলন এবং মিম হলো নারীশক্তি। পুরুষ শক্তি এবং নারীশক্তির মিলনেই সৃষ্টিজগত প্রকাশিত ও বিকশিত হয়ে ছুটে চলছে। জিন, মানুষ, জীব-জন্তু, পাখি, মৎস্য ইত্যাদি সবই এই উভয় শক্তির মিলনের মাধ্যমে দিয়ে প্রকাশিত ও বিকশিত হয়ে ছুটে চলছে। এমনকি উদ্ভিদ বিজ্ঞানীরাও বলে থাকেন যে, নর-নারী শক্তির মিলন ছাড়া উদ্ভিদের প্রকাশ ও বিকাশটি অসম্ভব। অধম লিখক নিজের চোখে দেখেছি, কাঁকরোল নামক একটি তরকারিতে কৃষক পুরুষ-পরাগটি দিয়ে প্রতিটি নারী-পরাগে স্পর্শ করছে। প্রশ্ন করলাম : এ রকমটি কেন করা হচ্ছে? কৃষক বললেন : পুরুষ-পরাগের স্পর্শ ব্যতীত কাঁকরোল নামক তরকারিটি হওয়ার সম্ভাবনা খুব কম

থাকে। যদিও বা কিছুটা হতে থাকে, কিন্তু পরে একদম পচে গিয়ে ঠাস করে মাটিতে পড়ে যায়।

আবার, বস্তুজগতের প্রশ্নেও দেখতে পাই, পজিটিভ আর নেগেটিভের খেলা, যেটাকে অনেক গবেষকই দ্বন্দ্বিক দর্শন বলে থাকেন। বিবর্তনবাদের মধ্য দিয়ে

নূতনের সমাহার আমরা দেখতে পাই, কিন্তু উহা কি উভয় শক্তির ফলেই হচ্ছে, নাকি দ্বাঙ্গিক দর্শনের কিছু একটা আছে, অধম লিখকের জ্ঞানা নাই। তবে ‘জালিকাল কেতাব’ তথা ওইটাই কেতাব যাহা চলমান গতিতে ছুটে চলছে। কেতাবটি এখানে আল্লাহর সেফাত তথা গুণাবলি। কেতাব কখনও আল্লাহর জ্ঞাত নয়; যদিও আল্লাহর জ্ঞাত-রূপটি সমগ্র সৃষ্টিরাজ্যের মাত্র তিনটি স্থানে দেখতে পাই : একটি লা-মোকাম, অন্যটি জিনের অন্তর এবং অপরটি মানুষের অন্তর। তাই আল্লাহ জিন এবং মানুষের শাহারগের নিকটেই অবস্থান করেন। আল্লাহর এই অবস্থানটি সেফাত-রূপে নয়, বরং জ্ঞাত-রূপে অবস্থান। কারণ সৃষ্টির আর কোনো জীবের সঙ্গে ‘শাহারগের নিকটেই আছি’ কথাটি পাওয়া যায় না।

আবার যদি ‘আলিফ-লাম-মিম’ দিয়ে ‘আলে মিম’ তথা মোহাম্মদের বংশধরদের বোঝায়, তা হলে ইহা নুরের বংশ। এই বংশ বলতে দেহধারী নবির বংশটি যদি কেউ বোঝাতে চায়, তা হলে ইহা নিছক মেজাজি বংশ। মোহাম্মদের নুরের বংশের পরিচয়টি আমরা সীমিত আকারে দেখতে পাই। দেহধারী আবু লাহাব যদিও রক্তের বংশধর, কিন্তু আমরা ভুলেও আবু লাহাবকে নবিবংশের বলে মেনে নেই না। একটি রুটিকে দুই টুকরো করলে দুই ভাগ হয় সত্যি, কিন্তু মূলে একই রুটি। আল্লাহর জ্ঞাতনুর নিয়ে মহানবির অবস্থান। কারণ

লা-মোকামে সৃষ্টিরাজ্যের কাউকে প্রবেশ করার অধিকারটি দেওয়া হয় নি। এমনকি মহাশক্তিশালী রুহল আমিন নামক জিবরাইল ফেরেশতাটিও যাবার অনুমতি পান নি। জিবরাইল ফেরেশতা সিদরাতুল মুনতাহা তথা সৃষ্টি শেষ সীমায় গিয়ে থেমে যান, কিন্তু মহানবি লা-মোকামে প্রবেশ করলেন। এই প্রবেশটাই বুঝিয়ে দেয় যে মহানবি আল্লাহর জাতনুরে তৈরি। মাহবুবে এলাহি নিজাম উদ্দিন আউলিয়ার প্রধান খলিফা হজরত আমির খসরুর লা-মোকামে যাবার ঘোষণাটি জ্ঞানতে পারি। আল্লাহর সঙ্গে মহানবির মিলনটি হয়েছে দুই ধনুকের ব্যবধানে অথবা আরও নিকটে। একটি ধনুক দেখতে একটি বৃত্তের অর্ধেকের মতো, দুইটি ধনুক দুইটি অর্ধবৃত্ত। দুইটি অর্ধবৃত্ত সমান-সমান একটি বৃত্ত। এই বৃত্তটি সম্পূর্ণ একত্র করার জন্য বলা হয়েছে, ‘আও আদনা’, তথা আরও নিকটে। দুইটি সেমি সার্কল সমান সমান একটি সার্কল। সুতরাং অপ্রকাশিত রূপটির নাম আল্লাহ এবং প্রকাশিত রূপটির নাম নুরে মোহাম্মদ। সুতরাং হজরত আবদুল্লাহ আলাইহেস সালাতুস সালাম এবং হজরত আমেনা আলাইহেস সালাতুস সালামের মিলনে যে মহানবির আগমনটি ঘটেছে উহা আল্লাহর জাতের একটি মেজাজি রূপ। তাই আমরা দেখতে পাই যে, বিশ্বের বড় বড় আল্লাহর ওলিরা বলে থাকেন : ‘দোনো হিকা শেকেল এক হ্যায়, কিস কো

খোদা কাহ?’ তথা ‘দুইজনেরই চেহারা-সুরত একই, তা হলে

কাকে খোদা বলবো?’ বাউল সম্রাট লালন ফকির ভো আরও এক ধাপ এগিয়ে নেমে বলেছেন : ‘যিনি মুরশিদ তিনিই রসুল খোদাও তিনি হন।’ (হবহ উদ্ধৃত নয়)।

আফসোস! আরবি ভাষা জানা আলেম-উলামারা (সবাই নন এবং আহলে সুন্নাতুল জামাতের অনুসারী আলেম-উলামারা নন) এত লেখাপড়া করেও অশ্বভিষ্যটি প্রসব করেন আর বাউল সম্রাট লালন ফকির ধ্যান-সাধনার মাধ্যমে তথা মোরাকাবা-মোশাহেদার মাধ্যমে সত্যকে পরিষ্কার বুঝতে পারলেন।

আল্লাহ এবং মহানবি যে এক ও অভিন্ন নুর সেই বিষয়টি কোরান-এর ৪ নম্বর সূরা নেসার ১৫০ আয়াতে পরিষ্কার দেখতে পাই। ‘ইন্নালাজিনা’ : নিশ্চয়ই যাহারা, ‘ইউক্ফরুনা’ : কুফরি করে, ‘বিল্লাহে’ : আল্লাহর সহিত, ‘ওয়া রসুলিহি’ : এবং রসুলদের সাথে, ‘ওয়া ইউরিদুনা’ এবং যাহারা এরাদা করে, ‘আইউফারিকু’ : ভাগ করিতে চায়, ‘বাইনাল্লাহে’ : আল্লাহর মধ্যে, ‘ওয়া রাসুলেহি’ : এবং রসুলদের মধ্যে..... ‘উলাইকা’ : উহারাই, ‘হমুল কাফেরুনা’ : হইল কাফের, ‘হাক্কান’ : পরিপূর্ণ তথা ১০০%।

(নিশ্চয়ই যাহারা কুফরি করে আল্লাহর সহিত এবং রসুলদের সাথে এবং যাহারা এরাদা করে ভাগ করিতে চায় আল্লাহর মধ্যে এবং রসুলদের মধ্যে উহারাই হইল পরিপূর্ণ তথা ১০০% কাফের)। (একদম হবহ অনুবাদ, যাহা সবাই করেন না)।

কোরান-এর ৪ নম্বর সূরা নেসার ১৫০ নম্বর আয়াতটিকে একমাত্র আহলে সুন্নাতুল জামাতের

অনুসারীরা ছাড়া হবহ অনুবাদটি করেন না। দলের তথা ফেরকার সাইনবোর্ডটি কাঁধে নিয়ে এই রকম হবহ অনুবাদ করতে গেলে খলি হতে আসল বিড়ালটি বেরিয়ে যাবার বিপদজনক অবস্থাটি দাঁড়িয়ে যেতে পারে। এই আয়াতে পরিষ্কারভাবে বলে দেওয়া হয়েছে, যারা কেবল মনে মনে এইটুকু ইচ্ছা পোষণ করলো যে, আল্লাহ আলাদা এবং রসূলেরা আলাদা, তারাই কাফের। কাফের বলেই শেষ করা হয় নি, বরং কাফেরের শেষে একটি বিশেষণ দেওয়া হয়েছে, তথা ‘হাক্কান’ শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে, তথা ১০০% কাফের তথা একদম খাঁটি কাফের তথা পরিপূর্ণ কাফের এবং এই রকম কাফের নামধারীদের উপাসনাগুলো করা আর না করা সমান কথা, কারণ সেটা গাছের ভিত্তি তথা মূল শেকড় কেটে দিয়ে গাছের মাথায় পানি ঢালার মতো।

আজ পৃথিবীর বুকে ৫৭টি মুসলিম দেশের চেহারা-সুরত, নকশা-পড়চা, দাগ নম্বর-খতিয়ানগুলো দেখলেই বোঝা যায় যে, কোন পতনের বিন্ধুতে দাঁড়িয়ে পরাশক্তিগুলোর ধাবমান কুণ্ডা হয়ে গেছে। সব বাব্বাই একই আলো, তবে বাব্বের রঙ যদি লাল-নীল-সবুজ-বেগুনি-মার্কারি ইত্যাদি হয় তা হলে বাব্বের রঙেই আলোটি প্রকাশিত হয়। লাল বাব্ব লাল আলো, নীল বাব্ব নীল আলো, হলুদ বাব্ব হলুদ আলো, মার্কারি বাব্ব মার্কারির আলো, আবার আধুনিক এনার্জি সেভিং

লাইটের আলো ইত্যাদি অনেক রঙের আলো দেখতে পাই— আসলে মূলে একই আলো।

অধিকাংশ গবেষক মনের অজান্তে বিরাট একটি ভুল করে বসেন আর সেই ভুলটি হলো রুহের মাগফেরাত চাওয়া। রুহ মারা যায় না, কারণ রুহ 'জন্মগ্রহণ করে না এবং জন্ম দেয়ও না।' রুহ ঘুমায় না, খাদ্য-পানি গ্রহণ করে না, ক্লান্ত হয় না, যৌনক্রিয়া করে না— তাই রুহের মাগফেরাত চাওয়াটা যে কত বড় এবং মারাত্মক ভুল ইহা হয়তো জেনেও না জানার ভান করে অথবা রুহের রহস্য বিষয়টি একেবারেই জানে না। যেখানে আদমকে রুহ ফুৎকার করা হলো সেখানে জানোয়ারের কাছে তথা হায়ওয়ানের কাছে রুহ কেমন করে ফুৎকার করা হলো ভেবে অবাক হই।

নার্টোরের এক পীর সাহেব দুই খণ্ডে রুহ আর নফসের কথাটি লিখতে গিয়ে জানোয়ারের রুহ তথা রুহে হায়ওয়ানির ব্যাখ্যাটিও মাসাল্লাহ লিখে ফেলেছেন। এদের কাছে ভক্ত মুরিদেরা কী শিখবেন, কী জানবেন? কারণ উনি নিজেই তো রুহ বিষয়টিতে একেবারেই অন্ধ। তাই এই অন্ধ পীর সাহেব যখন অন্ধ মুরিদদেরকে পথ দেখাতে শুরু করবেন তখন গর্তে পড়ে যাবার প্রচুর সম্ভাবনা থেকে যায় এবং আত্মপরিচয়ের হাত-পা ভেঙে মরে যাবার সম্ভাবনাটি থেকে যায়, নতুবা মর্গে নিয়ে সুরতহাল তথা পোস্টমর্টেম করতে হয়। হায় রে পীর সাহেব, আর হায় রে মুরিদান! এ জন্যই বোধ হয় এই রকম পীরের চেহারা সুরত ও লিখনি পড়ে অনেকেই মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং তবলিগের গাটি নিয়ে আরামসে

তবলিগ করে বেড়ায়। পাঠক, বুকে হাত রেখে বলুন তো, কাদেরকে দোষ দেবেন?

মরার স্বাদ গ্রহণ করে নফস। মোটা কথায় নফস মারা যায়। যে নফস মারা যায় সেই নফসের জন্য মাগফেরাত চাইতে হয়। ডাক্তারের কাছেই রোগী যায়, কোনো সুস্থ মানুষ নয়। বাদী-বিবাদীই উকিলের কাছে যায়, আর যিনি বাদীও নন, বিবাদীও নন তার জন্য উকিলের প্রয়োজন নাই। প্রয়োজনের আধিক্য যে রকম প্রয়োজনীয় সভ্যতার বিকাশ ঘটায়, সেই রকম রোগীর ভালো চিকিৎসার প্রশ্নে প্রতিনিয়ত আধুনিক যন্ত্রপাতি আবিষ্কার হচ্ছে। এই সমস্ত কথা, এই সমস্ত শাস্ত্র (বিস্তারিত) প্যাচাল সবই একমাত্র নফসের জন্য। রুহ এইসব বিশাল ঝামেলার ধারে কাছেও নাই। সুতরাং নফসের জন্য মাগফেরাতটি না চেয়ে রুহের জন্য মাগফেরাত চাইবার কথাটি যখন বড় বড় ইসলাম গবেষকেরা বলে বেড়ান তখন এতিমের মতো শুধু ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকি আর ভাবি : কোথায় নফস আর কোথায় রুহ! কোথায় আগরতলা আর কোথায় চকির তলা! কোথায় রানী ভবানী আর কোথায় বিছানায় মৃত্যু! কোথায় গুপ্ত অস্ত্রের জোড়া আর কোথায় নারিকেলের জোড়া! অধম লিখক ভালো করেই জানে যে এইসব শ্রদ্ধেয় ইসলাম গবেষকেরা জ্ঞাত সাপের ফণা তোলে : জ্ঞাত সাপের চাষকারী খামারের মালিক তোতা মিয়া অবশেষে জ্ঞাত সাপের কামড়েই মারা যান।

কোরান-এ সালাতের উল্লেখ : ২

কোরান-এর ২ নম্বর সূরা বাকারার ৪৩ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে : এবং সালাত কায়েম করো এবং জাকাত আদায় করো। (ওয়া আকিমুস সালাতা ওয়া আতুজ্জ জাকাতা)। এবং তোমরা রুকু করো রুকুকারীদের সাথে। (ওয়ারকাউ মাআর রাকেঈনা)।

ব্যাখ্যা

‘এবং সালাত কায়েম করো এবং জাকাত আদায় করো’— এই আয়াতটির আগে আল্লাহ কিব্বা আমাদেরকে সাবধান করে দিয়েছেন এই বলে যে, তোমরা সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশিয়ে একাকার করে দিয়ো না। সত্যকে সত্যের স্থানে রেখে দিয়ো এবং মিথ্যাকে মিথ্যার স্থানে। এই আদেশটি পালনে পিছপা হয়ো না, তথা সত্য এবং মিথ্যার পার্থক্য করার প্রশ্নে সত্যকে কখনো গোপন করতে য়েয়ো না।

এখানে একটি প্রশ্ন থাকে যে, এই সত্যটির বেলাতেও ম্লেজাজি সত্য এবং হাকিকি সত্যের প্রশ্নটি আসে। কেন আসে? একজন মৃত্যুপথযাত্রী ক্যানসার রোগীকে ম্লেজাজি সত্যটিও বলা যায় না। কারণ, বলে দিলে একদম ভেঙে পড়বে এবং মৃত্যু ত্বরান্বিত হবে অথবা আত্মহত্যার দিকে এগিয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকতে পারে। জীবন বাঁচানোর প্রশ্নে হারাম খাদ্যকেও গ্রহণ করা যায়। ইহা ইসলামেরই একটি উপদেশ। এ জন্যই ম্লেজাজি সত্যটির প্রশ্নে সত্যটি প্রকাশ করা যেমন প্রায় ক্লেদ্রে বাঞ্ছনীয়, আবার কোনো কোনো বিশেষ ক্লেদ্রে বাঞ্ছনীয় নয়।

বুখারি শরিফ-এর ৯৫ নম্বর হাদিসে হজরত আবু হরায়রা (রা.) যে বলেছেন : আমি (আবু হরায়রা) ম্লেজাজি সত্যের যতটুকু আমার জানা আছে সবটুকুই প্রকাশ করে গেলাম, কিব্বা হাকিকি সত্যের প্রশ্নে যদি কিছু একটা বলতে যাই তো আমাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে তথা আরবি প্রবাদবাক্যে : কাটা যাইবে আমার

এই গলা। হজরত ইবনে আব্বাস
(রা.), হজরত হজায়ফা (রা.), হজরত আবুজর
খিফারি (রা.)— কেহই হাকিকি সত্যের কথাটি বলে
যান নি। সুতরাং সত্য বলতে কী বুঝায়?
সত্য কত প্রকার ও কী কী? বাহিরের সত্য কয় প্রকার
এবং ভেতরের সত্যটিই বা কয় প্রকার?

আল্লাহর আবদুহ, যাকে আমরা খিজির বলে থাকি,
তিনি কিছু নবি নহেন, বরং মুসা নুবি (আ.) তাঁকে
মুরশিদরূপে, শিক্ষালাভ করার জন্য, আল্লাহ কর্তৃক দুই
সমুদ্রের মিলনক্ষেত্রের নিকট হতে পেয়েছিলেন। অবশ্য
প্রশ্ন আসতে পারে, আল্লাহর ওলি খিজির কী করে
জাঁদরেল নবি মুসা (আ.)-র মুরশিদ হতে পারেন,
যেখানে মুসা নবি (আ.)-র নামটি কোরান-এ
সবচাইতে বেশিবার উচ্চারিত হয়েছে : অধম লিখকের
জানা মতে ১৩৫ বার (ভুলও হতে পারে)। সেই হজরত
মুসা কালিমউল্লাহর (আ.) মুরশিদ হজরত খিজির
জ্ঞানদান করার প্রশ্নে একটি শর্ত জুড়ে দিয়েছিলেন, আর
সেই শর্তটি ছিলো : তিনটি ঘটনার বিষয়ে একটি প্রশ্নও
করা যাবে না, বরং ধৈর্যধারণ করে দেখে যেতে হবে।

আল্লাহর ওলি হজরত খিজির যখন দ্বিতীয় ঘটনাটির
অবতারণা করলেন এবং সেই ঘটনাটি ছিলো : কিছু
বাচ্চা ছেলেরা মিলেমিশে খেলা করছিল। আল্লাহর ওলি
খিজির সেই খেলা করা বাচ্চাদের থেকে একটি

বাদ্যাকে আছাড় মেরে হত্যা করে ফেললেন— এ দৃশ্য দেখে মুসা নবির মনে নানান রকম প্রশ্নের উদ্বেক হলো। মুসা নবি এই প্রশ্নগুলোর হিশাব মিলাতে প্রাণপণ চেষ্টা করেও হিশাব মেলাতে পারলেন না এবং বিরাট এবং তিষ্ঠ ধৈর্যধারণটি করতে না পেরে প্রশ্ন করে ফেললেন। সুতরাং আল্লাহর ওলিদের অনেক রকম উল্টাপাল্টা ঘটনা দেখে ধৈর্যধারণের প্রশ্ন তো অনেক পরে, বরং ওলি না বলে একদম ভণ্ড, একদম যা-ইচ্ছা-তাই বলে মুখ ফিরিয়ে নেবার ঘটনাপ্রলো জ্ঞানতে পারি। সুতরাং কোন সত্যটি প্রকাশ করার উপযুক্ত আর কোনটি অনুপযুক্ত উহা মাপবার যন্ত্রটি অধম লিখকের জ্ঞানা নাই।

‘অধম লিখকের জ্ঞানা নাই’— এই কথাটির মধ্যেও যদি সত্যের একদম উলঙ্গ দৃশ্যগুলো বলতে যাই, লিখতে যাই, তা হলে বিরূপ মন্তব্যের শিকার হতে হবে। কোরান অতি সংক্ষেপে বলছে : ‘তোমরা সত্য গোপন করো না এবং সত্যের সঙ্গে মিথ্যাকে মিশিয়ে দিয়ো না।’ সত্য-মিথ্যার বর্ণনাতে ভাষার বিভিন্নতা থাকতে পারে, অভিজ্ঞতার স্বল্পতা থাকতে পারে, কিন্তু মূল বিষয়টি একটিই, আর উহাই হলো : চাউল-গমের সঙ্গে পাথরের কথা মেশানোর মতো সত্যের সঙ্গে মিথ্যাকে মিশিয়ে দিয়ো না। এইসব বাজে অভ্যাস হতে যদি মুক্তি পেতে চাও তা হলে সালাত কায়েম করো তথা আল্লাহর সঙ্গে কেমন করে, কী উপায়ে, কার মাধ্যমে যোগাযোগ করা যায় সেই প্রচেষ্টাটি অবিরামভাবে করে যাও।

এখানে মনে রাখতে হবে যে, হাকিকি সালাতটি কায়েম হয়ে গেলেই জাকাত দেবার উপযুক্ততা অর্জন

করতে পারে, নতুবা অসম্ভব। আবার পরক্ৰমে ম্বেজাজি সালাতের প্রশ্নে ম্বেজাজি জাকাতটি দেবার কথাটিও বোঝানো হয়েছে। এই সালাত এবং জাকাতের প্রচলনটি মহানবির সময় হতে শুরু হয়েছে বলে যারা প্রচার করেন তারা বোকার স্বর্গে বাস করেন, বরং প্রথম নবি আদম শফিউল্লাহ (আ.) হতে মহানবি পর্যন্ত সালাত কায়েম এবং জাকাত আদায়ের কথাটি আমরা দেখতে পাই। আমরা কোরান হতে এটুকু জানতে পারি যে, যাদের হাকিকি সালাতটি কায়েম হয়ে গেছে তাদের কপালে একটি সালাত কায়েমের চিহ্ন অবশ্যই ফুটে উঠবে। এই চিহ্নটিকে আরবি ভাষায় ‘সিমা’ বলা হয়। আনুষ্ঠানিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজে ম্বেজাজি মসজিদের ফ্লোরে কপালে ঘর্ষণ-খাওয়া কালো কহরগুলোকে যদি কেহ সালাত কায়েমের চিহ্নটি তথা সিমাটি ফুটে উঠেছে বলতে চায়, তা হলেও অধম লিখকের বলার কিছু নাই, কারণ যে যতটুকু বোঝে সে ততটুকু বলে।

জাকাত আর সালাত কায়েম করার কথাটি বলেই আয়াতটি শেষ করা হয় নি, বরং ‘এবং’ শব্দটি যোগ করে বলা হলো : ‘তোমরা রুকু করো রুকুকারীদের সাথে।’ আরবি ভাষায় : ‘ওয়ারকাউ মাত্মার রাকেঈনা।’ ‘রুকু করো রুকুকারীদের সাথে’ কথাটির মধ্যেও একটি ম্বেজাজি রুকু এবং অপরটি হাকিকি রুকু রয়েছে। মহানবির আমল হতে ওয়াক্তিয়া সালাতের

রুকু করা এবং রুকুকারীদের সাথী হবার কথাটি যদি ধরে নিই, তা হলে এই আনুষ্ঠানিক পাঁচ ওয়াস্ত সাতাত মহানবি মেরাজে গমন করে উম্মতদের জন্য তোহফারূপে উপহার পেয়েছিলেন। তা হলে অন্যান্য নবীদের অনুসারীরা যে রুকু করেছেন, সেই রুকুগুলো কেমন? এবং সেই রুকুগুলোর ধরন-ধারনটাই বা কেমন ছিলো? ইহা অধম লিখকের জ্ঞানা নাই।

কোরান-এ সাতাতের উল্লেখ : ৩

কোরান-এর ২ নম্বর সূরা বাকারার ৪৫ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে এবং তোমরা সবার (ঐশ্বর্য) এবং সাতাতের দ্বারা সাহায্য প্রার্থনা করো। (ওয়াস্তাতায়িনু বিস সাবরে ওয়াস্ত সাতাতে) এবং নিশ্চয়ই উহা আল্লাহতে ভীতগণ ব্যতীত অন্যদের জন্য অবশ্যই বড় কঠিন (ওয়া ইন্নাহা লাকাবিরাতুন ইল্লা আনাল খাশেঈনা)।

ব্যাখ্যা

এবার আমরা একই সূরার এই আয়াতের ব্যাখ্যায় সামান্য কিছু বলতে চাই। এখানে সাহায্য চাইতে বলা হয়েছে। সাহায্য চাওয়াকে আরবি ভাষায় 'নাস্তাইন' বলা হয়। কানার সাহায্য চাইতে বলা হয়েছে? বলা হয়েছে : মস্তানের সাহায্য চাও। আল্লাহর যতগুলো অধিক প্রিয় নাম আছে তার মধ্যে অধম লিখকের মতে প্রথমটি হলো 'কাহহার', দ্বিতীয়টি হলো 'জুলজালাল' এবং তৃতীয়টি হলো 'মস্তান'। ইহারও একটু ব্যাখ্যার প্রয়োজন।

ধ্বংসের মাঝেই গড়ার স্বপ্নটি লুকিয়ে থাকে, কিন্তু আমার মনে হয় এই অর্থে ইহা ব্যবহার না করে প্রতি সেকেন্ডে কোটি কোটি ঘটনা ঘটিয়ে উহাকে ধ্বংস করে দিবে যে নব-নবরূপে নিত্য চলমান গতিতে এগিয়ে চলছেন সেই চলার নামই জুলজালাল। তাই

জুলজালালের পরেই কারামতওয়ালা শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। কারণ প্রতি সেকেন্ডে কোটি কোটি ঘটনার উদ্ভব ঘটিয়ে সেই মুহূর্তেই সেই কোটি কোটি ঘটনাপ্রলোকে ধ্বংস করে দিয়ে এই ধ্বংস আর গড়ার প্রতিটি মুহূর্তের চলমান গতি যিনি ঘটাচ্ছেন তিনি নিঃসন্দেহে কারামতওয়ালা তথা ইকরাম। তাই তিনি জুলজালালুল ইকরাম। প্রতিনিয়ত ধ্বংস, প্রতিনিয়ত গড়ার খেলাটি খেলে অসীম গতিতে অসীমভাবে ছুটে চলছেন সুবহান আল্লাহ! আল্লাহ জাল্লাশানাহর এই রহস্যময় ব্যাখ্যাগুলো লিখতে গিয়ে চমকে যেতে হয়।

এখানে মস্তানের সাহায্যটি চাওয়া হয়েছে। খান্নাসরুপী শয়তানের বন্ধনের বলয় হতে যারা মুক্তিপথের সাহায্যকারী তাঁরাই গুরু, তাঁরাই পীর, তাঁরাই মুরশিদ। এই সাহায্য, এই খান্নাসরুপী বন্ধনের বৃত্ত হতে মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় যারা বিচলিত হয়ে পড়েন তাদেরকেই বলা হয় মুরিদ, ভক্ত ইত্যাদি। তাই সালাত— তা সেই সালাত ওয়াজিয়াই হোক আর দায়েমিই হোক— সেই সালাতের সঙ্গে আরেকটি কথা যুক্ত করে দেওয়া হয়েছে, সেই কথাটির নাম সবার তথা ধৈর্য। কারণ সত্যসাগরে অবগাহন করার প্রবল আকাঙ্ক্ষায় সালাতের মধ্যে তথা আল্লাহর সঙ্গে যোগাযোগ প্রচেষ্টার মধ্যে অবশ্যই ধৈর্যের প্রয়োজন। ধৈর্য বিহনে এই খান্নাসের বলয় হতে মুক্তিটি অসম্ভব। তাই এই সালাত প্রশিক্ষণের প্রচেষ্টায় যারা নিয়োজিত থাকেন তারা অবশ্যই বিনয়ী। আগুন যেমন কাঠ জ্বালিয়ে ফেলে দেয়, অহংকার আর উদ্ধত আচরণ মানবীয় গুণগুলোকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছাড়বার

করে দেয়। তাই বিনয়, আজিজি, নম্রতা যাদের মধ্যে নাই তাদের জন্য সুফিবাদ হারাম তথা খান্নাসের বলয় হতে মুক্তি পাবার সম্ভাবনাটি তাদের এই জনমে আর থাকে না।

কোরান-এ সালাতের উল্লেখ : ৪

কোরান-এর ২ নম্বর সূরা বাকারার ৮৩ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে : এবং যখন আমরা বনি ইস্রাইল হইতে অঙ্গীকার গ্রহণ করিলাম যে (ওয়া ইজ্জ আখাজ্জনা মিসাকা বানি ইস্রাইলা) তোমরা আল্লাহ ব্যতীত কাহারও এবাদত করিবে না (লা তাআবুদুনা ইল্লাল্লাহা) এবং পিতামাতার সাথে এহসান (ভালো ব্যবহার) করো। (ওয়া বিল ওয়ালেদাইনে এহসানান) এবং নিকট আত্মীয় এবং ইয়াতীম এবং মিসকিনদের সাথেও (ওয়াজিলকুরবা ওয়াল ইয়াতামা ওয়াল মাসাকীনে) এবং মানুষদের সাথে সুন্দর ভাষায় কথা বলো (ওয়া কুলু লিল্লাসে হসনান) এবং সালাত কায়েম করো এবং জাকাত আদায় করো (ওয়া আকিমুস সালাতা ওয়া আতুজ্জ জাকাতা)। তারপর তোমাদের মধ্য হইতে কিছু লোক ব্যতীত সবাই মুখ ফিরাইয়া নিলে। (সুন্না তাওয়াল্লাইতুম ইল্লা কালিলান মিনকুম) এবং (প্রকৃতপক্ষে) তোমরা তো মুখ ফিরানোকারীই ছিলে (ওয়া আনতুম মুরেদুনা)।

ব্যাখ্যা

এই আয়াতেও সালাত কায়েম ও জাকাত আদায়ের কথাটি বলা হলো। সঙ্গে ‘এবং’ শব্দটি দিয়ে আরও কিছু কর্তব্য যোগ করে দেওয়া হলো। সালাত এবং জাকাত এবং বাবা-মায়ের প্রতি এহসানের দৃষ্টি তথা ভালো ব্যবহার তথা কর্তব্য পালন করার কথাটি বলা হলো। কিন্তু সর্বপ্রথমেই বলা হলো, আল্লাহ ছাড়া আর কারও এবদিত না করার। এবং যারা আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ তাদের এবং এতিম ও মিসকিনদের সাথে ভালো ব্যবহার করা তথা কোরান-এর বর্ণিত ব্যবহারিক পদ্ধতিগুলোকে অনুসরণ করা এবং তারপরেও আরেকটি উপদেশ দেওয়া হলো আর সেই উপদেশটি হলো, মানুষের সাথে সুন্দর ভাষায় কথা বলা তথা কর্কশ, রুঢ় আচরণ, অহঙ্কারি প্রদর্শন ইত্যাদি সম্পূর্ণরূপে পরিহার করতে বলা হলো। তারপর বলা হলো, সালাত কায়েম করার কথাটি এবং জাকাত আদায়ের কথাটি। তারপর বলা হলো এই রকম কাজগুলো তথা আদেশ-উপদেশগুলো মান্য করার মানুষ ত্রোমাদের মধ্যে কিছু লোক ছাড়া সবাই মুখ ফিরিয়ে নিলো। এখানে মুখ ফেরানোর অর্থটি হলো আনুষ্ঠানিকতার স্বীকৃতিটি হয়তো আছে, কিন্তু হাকিকি কর্তব্যের স্বীকৃতিটি খুব কম লোকেই পালন করে চলে। ইহা সব যুগেই সব কালেই কমবেশি দেখা গিয়েছে এবং দেখা যায় এবং দেখা যাবেও।

আয়াতটির প্রথমেই বলা হয়েছে— একবচনে আল্লাহ বলেন নি, বরং বহু বচনের রূপটি ধারণ করে বলেছেন যে, আমরা বনি ইস্রাইল তথা ইহুদিদের কাছ থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলাম তথা ইহুদিরা আমাদেরকে (আল্লাহ) কথা দিয়েছিলো আমাদের (আল্লাহ) দেওয়া আদেশ-উপদেশগুলো মেনে চলবে। কিন্তু ইহুদিরা অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছিলো। কথা দিয়ে কথা রাখে নি। এটা খুব বেশি একটা নূতন কথা নয়, কারণ ইসাযি-

মুসলমানেরাও একই রকম অস্বীকার ভঙ্গ করেছে তথা কথা দিয়ে কথা রাখে নি, যে রকম ইহুদি-মুসলমানেরা করেছিলো। তাই মহানবির অনুসারীদেরকেও পূর্ব ইতিহাসের একই রকম ঘটনার পুনরাবৃত্তি যাতে না ঘটে, যাতে ইহুদি-মুসলমানদের মতো, ইসাযি-মুসলমানদের মতো মহানবির অনুসারী মুসলমানেরাও একই রকম পথে না যায় সেই জন্য বার বার সতর্ক করে দেওয়া হলো। অবশ্য আমরা অবাক হই, সেই পূর্ব হতে অনেকেই সব বিষয়গুলো বুঝেও জেনেও অবহেলার ভয়াবহ পরিণামটি যে কী হতে পারে তা জেনেও

না বুঝবার, না জ্ঞানবার ভান করে গেছে যুগে যুগে এবং আজও এই আধুনিক বিজ্ঞানের যুগে।

কেন এ রকমটি হয়? কেন একই রকম ঘটনা বার বার ইতিহাসের পাতায় দেখতে পাই, অনেক রঙ ও রূপ নিয়ে ঘটে চলছে, ঘটে চলবেও? এর কি কোনো প্রতিবিধান নাই? এইসব বিষয়ের মানসিক রোগীদের কি কোনো চিকিৎসা নাই? এইসব ঘোর দুনিয়াদার মানুষদের দুনিয়া নামক মাদকদ্রব্যের নেশায় ডুবে থাকা হতে মুক্তি পাবার হাসপাতালগুলো কবে প্রতিষ্ঠিত হবে? কবে এদের চিকিৎসা চলবে? আনুষ্ঠানিক ধর্মপালনে ইহুদিদের তো খুবই একাগ্রতা প্রদর্শন করার ইতিহাস জ্ঞানতে পারি। তা হলে ইহুদিদের এত আনুষ্ঠানিক এবাদত-বন্দেগিগুলো কেন বেকার বলে ঘোষণা করা হলো? অবশ্য কিছু লোক ছাড়া। ইহুদিরা তো আনুষ্ঠানিকভাবে এক আল্লাহরই এবাদত করতো, তারপরেও কেন বলা হয় এক আল্লাহর এবাদত-বন্দেগি

হতে বিচ্যুতির কথাটি? ইহদিরা তো কোনো কল্পিত মূর্তি বানিয়ে সেই মূর্তির পূজা করতো না। আসলে প্রতিটি মানুষের নফসের সঙ্গে যে খান্নাসরূপী শয়তানটিকে আল্লাহ পরীক্ষা করার জন্য দিয়েছেন, সেই খান্নাসই দুনিয়ার লোভ-মোহতে ডুবিয়ে রাখে। একটি মানুষের নফসের সহিত খান্নাস যতদিন থাকবে ততদিন তার এবাদত-বন্দেগি আল্লাহর দরবারে পরিপূর্ণরূপে গৃহীত হয় না।

‘লা-তা বুদুনা ইল্লাল্লাহ’ তথা ‘না এবাদত করো না’ হবহ অর্থে দুইটি না যোগ করে বলা হচ্ছে, ‘ইল্লাল্লাহ’। এখানে ‘ইলাহ’ বলতে কর্তা, নেতা, অধিকারী নামক বহু ইলাহ-র কথা বলা হয়েছে। মাটি বা পাথরের বানানো ইলাহ-র কথা এখানে বলা হয় নি। যদিও মাটি ও পাথরে বানানো মূর্তিগুলো

মেক্কা জি ইলাহ আবার অনেক সময় এই মেক্কা জি ইলাহগুলো মোটেও মেক্কা জি ইলাহ নয় তাদেরই জন্য যারা সৃষ্টাকে অস্বীকার করে, যারা নাস্তিক, যারা কমিউনিষ্ট, যারা ধর্মই মানে না, যারা ধর্মের কথা শোনা তো দূরে থাক, যারা ধর্মের ধার কাছ দিয়ে ঘেঁষে না।

এশিয়া-ইউরোপের বহু কমিউনিষ্ট দেশে রাস্তার মোড়ে মোড়ে পাথরে-ব্রোঞ্জ বানানো বিশাল বিশাল মূর্তিগুলো দেখা যায়। অধম লিখক প্রশ্ন করেছিলেন, এই মূর্তিগুলো কেন আপনারা রেখেছেন? মুচকি হেসে আম্মাকে বললো : ভয় পাবেন না এই ভেবে যে আমরা মূর্তিপূজা করি। কারণ আপনি যে আল্লাহর পূজা করছেন সেই আল্লাহকে আমরা মানা তো দূরের কথা,

বরং বলে থাকি, মানুষের সবচাইতে বিস্ময়কর আবিষ্কারটি হলো, মানুষ আল্লাহ আবিষ্কার করতে পেরেছে। অনেকেই হয় তো ভাবতে চাইবেন ইহা ভগবান রজনীশের কথা। না, মোটেই না। তিনিও এদের কাছ থেকে ধার করে নিয়ে নূতন ভাষায় অলঙ্কার দিয়ে একটু সুন্দর করে বলেছেন। এখন চিন্তা করুন তো, যে-আল্লাহই অধম লিখকের পুঁজি, যে-আল্লাহর রহস্য জানার জন্য অধম লিখক সেইদিনের টাকায় লক্ষ লক্ষ টাকার বই ফ্রয় করেছি। আমার ব্যক্তিগত সংগ্রহে এত বই ছিলো যে বই সংগ্রহকারীদের মধ্যে আমাকে চতুর্থ স্থানটি দিয়েছিলো। কত বই সংগ্রহ করতে পারলে সমগ্র বাংলাদেশে সংগ্রহকারীদের মধ্যে চতুর্থ স্থানে নামটি দিতে পারে? দ্বিতীয়-তৃতীয় স্থানটি যাঁরা পেয়েছেন তাদের নাম ও ঠিকানা জানা থাকলেও বললাম না, কিন্তু প্রথম স্থানটি যিনি অর্জন করেছেন তাঁর নামটি অকপটে পাঠকদের জানিয়ে দিলাম। তাঁর নাম রুহুল আমিন নিজামী। চট্টগ্রামের মীরের সরাইয়ের অধিবাসী।

কেন এতগুলো পঁ্যাচাল পারলাম? এত লেখাপড়া করার পরও ওই কমিউনিষ্ট দেশের নাস্তিকেরা যে পথের মোড়ে মোড়ে মূর্তি দাঁড় করিয়েও মূর্তিপূজা তো দূরে থাক বরং আল্লাহকেই অস্বীকার করে, সে কথাটি শুনে কে না অবাক হবে? আসলে মূর্তি সামনে থাকলেই মূর্তিপূজা হয় না। দিলের ভিতরে, অন্তরের অভ্যন্তরে, নফসের সঙ্গে খান্নাস যে অনেক রকম লোভ আর মোহের মূর্তিগুলো পূজা করাচ্ছে এবং মনের অজান্তে

পূজা করে চলছি এটাই হলো আসল মূর্তিপূজা, এটাই হলো হাকিকি মূর্তিপূজা।

‘আউজুবিল্লাহে মিনাশ শায়তোয়ানের রাজিম’ তথা ‘পাথরের আঘাত-খাওয়া শয়তান হতে আশ্রয় চাই’ বাক্যটি এক হাজারবার মুখে পড়লেও শয়তান আপনাকে মোটেই ছেড়ে দেবে না। কারণ মুখের পড়াটি হলো মেজাজি আর তাড়িয়ে দেবার ধ্যানসাধনা তথা মোরাকাবাটি হলো হাকিকি।

অধম লিখক একজন হোমিও ডাক্তার। লজ্জা বা অহংকার ফেলে বলছি, আমাকে বাংলাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ হোমিওপ্যাথ বলা হতো। অভিজ্ঞতায় নারায়ণগঞ্জের নিতাইগঞ্জ নামক একটি বাজারের এক কোটিপতি দোকানদারকে সিগারেট খেতে মানা করেছিলাম। উনি একটার পর একটা সিগারেট খেতেন। ওনার নাম ছিলো রফিক। আমাকে মাম্মা বলে ডাকতেন। ওনাকে সিগারেট খেতে মানা করলাম। বললাম: ‘মাম্মা লাংস্ ক্যানসারও হতে পারে।’ উনি দাঁত খিচুনি দিয়ে আমাকে বললেন, ‘জীবনে যে সিগারেট খান নি, তার কেন লাংস্ ক্যানসার হয়?’ আমি কিছুক্ষণ নীরব থাকতে তৃপ্তির হাসি দিয়ে আরামে সিগারেট টেনে চললেন। তারপর বললাম, ‘মাম্মা, দুই ঘণ্টা দশটি মানুষ বৃষ্টিতে ভেজার পর দেখা গেল সাতজনের ঠাণ্ডা লেগেছে, কিন্তু তিনজনের লাগলো না কেন?’ বিষয়টি বুঝতে পেরে

তিনি বললেন, ‘মাম্মা রে, সিগারেট আমি খাই না, সিগারেটই আমাকে খেয়ে ফেলেছে।’ মাত্র তিন বছর পরে তার ছোট ভাইয়ের হাত ধরে জীর্ণ-শীর্ণ মাম্মা রফিক, গলার মধ্যে একবস্ত্রা তাবিজ-তুঙ্গা ঝুলছে, ডিসপেনসারিতে আসলেন এবং বসলেন। লাংস্ ক্যানসারে যে উনি আক্রান্ত এটা উনি জেনে গেছেন। কিন্তু শেষ অবস্থায় যে অবস্থান করছেন সেটা হয়তো উনি জানেন না। আমি প্রচণ্ড মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে অভিনয়ের ভঙ্গিতে বললাম : ‘মাম্মা আপনার কিছুই হয় নি। যে ডাক্তারেরা বলেছে ওরা এখনও ডাক্তারই হতে পারে নি। ওই রকম ১০/১৫টা ডাক্তার পকেটে নিয়ে আপনার মাম্মা চলে।’— ইত্যাদি ইত্যাদি। মাম্মা ভীষণ খুশি। চোখে মুখে জীবনের আলো ফুটে উঠলো। ওষুধ চাইলো। বললাম, ‘ডাক্তারেরা যে ওষুধ দিয়েছেন তা ২১ দিন

খাবার পর আমি সব ওষুধ আপনার ছোট ভাইকে দিয়ে পাঠিয়ে দেব।’ ১৯ দিনের মাথায় মৃত্যুশয্যায় মৃত্যুর একটু আগে ‘জাহাঙ্গীর, জাহাঙ্গীর’ বলে কেবল ডাকলেন। এবং শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার আগে আমার নামটি কেবল ছিলো। খুব দুঃখ পেয়েছিলাম, মর্মান্বিত হয়েছিলাম। স্মৃতিতে হয়তো লক্ষ লক্ষ রোগীর কথা কোনোদিনই মনে থাকবে না, কিন্তু এই বেদনাদায়ক স্মৃতিটি আজও আমি ভুলতে পারি নি।

সুতরাং যারা মাদক দ্রব্যের নেশার মধ্যে ডুবে আছে বা থাকে তাদেরকে উপদেশ দেওয়া আর না দেওয়া সমান, বরং বকুনি ও মার খাওয়ার সম্ভাবনাটি থাকতে পারে। তাদেরকে সৌদি আরবের মতুযাদের মতো জোর করে নিয়ে নেশা হতে মুক্তি পাবার হাসপাতালে ভর্তি করতে হবে। যেমন সৌদির মতুযাদের কে নামাজ পড়লো না, কে রোজা রাখলো না এদেরকে ধরার জন্য সরকার কর্তৃক নিযুক্ত করা হয়। সুতরাং প্রতিটি মানুষের মনের মধ্যে কত রকম যে আশার মূর্তি ভেসে আছে সেইগুলোকেই ‘ইলাহ’ বলা হয় তথা মনের কর্তা বলা হয়। তাই এই মূর্তিগুলো তথা এই ‘ইলাহ’গুলো বহু তথা অনেক তথা ‘ইলাহা’। এই ইলাহগুলোকে ধ্যানসাধনা, মোরাকাবা-মোশাহেদার মাধ্যমে তাড়িয়ে দিলে তথা খান্নাসকে তাড়িয়ে দিলে আপন স্বরূপে আল্লাহ্ অন্তরটিকে তথা নফসটিকে গ্রাস করে ফেলেন। তখনই এক ইলাহ প্রতিষ্ঠিত হয়। উহাকেই ইল্লাল্লাহ বলা হয়। সেই ইল্লাল্লাহর জাগ্রত রূপটি যখন সাধকের ভিতরে প্রকাশিত ও বিকশিত হয়ে পড়ে সাধক তখন নির্বাক হয়ে যান। কিছু একটা উপদেশ যখন সাধক দিতে থাকেন তখন খান্নাসওয়ালা মানুষগুলো কখনও গ্রহণ করে, কখনও গ্রহণ করে না। এ এক আজব খেলা। এই আজব খেলার অঙ্কের নিয়মে আগামাথা পাওয়া যায় না। যদিও অঙ্কের নিয়মটি অবশ্যই আছে।

খান্নাসই লোভ আর মোহের গুরুতাকুর। এই খান্নাসই পবিত্র নফসটিকে কুমন্ত্রণা আর কুবুদ্ধি দিয়ে লোভ-মোহের বিষয়ে জর্জরিত করে ফেলে। এই খান্নাসওয়ালা মানুষগুলোকেই যিশুখ্রিস্ট মানুষের চেহারায়ে, মানুষের সুরতে, মানুষের নকশায় অসুর বলেছেন। আর খান্নাসমুক্ত নফসের অধিকারী মানুষগুলোকেই দেবতা বলা হয়েছে। সেমিটিক ধর্মগুলোতে নবি-রসূল আর ওলিদের অধিকাংশই পুরুষ। কিন্তু হিন্দুধর্মের তেত্রিশ

কোটি অবতার- মুনি-ঋষিদেরকে দেব-দেবী বলা হয়েছে। হিন্দুধর্মে রমণীদেরকেও অবতাররূপে আমরা দেখতে পাই, যা সেমিটিক ধর্মগুলোর মধ্যে দেখতে পাই না। আবার হিন্দু ধর্মে বৈষয়িক সম্পদ বণ্টন করে দিবার প্রথাটি এবং আরও কিছু জটিল বিষয় নারীদের বেলায় মোটেও দেখতে পাই না। অবতারের রূপে নারীকে পরম মর্যাদাটি হিন্দুধর্ম দিয়ে গেছে, আবার পরক্ষেপে নারীদের সামাজিক জীবনে সম্পদের অধিকার হতে বঞ্চিত করার দৃশ্যগুলো দুঃখজনক হলেও দেখতে হয়। পক্ষান্তরে সেমিটিক ধর্মগুলোর মধ্যে একমাত্র মহানবির ইসলামে নারী এবং পুরুষকে মোটেই সমান মর্যাদা দিয়ে যায় নি। অনেকেই সমান মর্যাদার ধূঁয়া তুলে তৃপ্তির ঢেঁকুর তুলতে চায়, কিন্তু আসলে নারীর মর্যাদা ১০০ ভাগের মধ্যে ৭৫ ভাগ এবং পুরুষের মর্যাদা মাত্র ২৫ ভাগ। আমরা নারীকে মহানবির ইসলামে নবি-রসুলরূপে দেখতে পাই না সত্যি, কিন্তু নারীর পদতলেই সন্তানদের বেহেশত কথাটি দেখতে পাই। মহানবির ইসলামে নারীকে যৌতুক দিয়ে বিবাহ করতে হয়। ইহা মধ্যপ্রাচ্যে যারা গিয়েছেন তারা সবাই কমবেশি জানেন। অথচ আমাদের মতো গরিব মুসলমান দেশগুলোতে যৌতুক প্রথাটি ঠিক তার উল্টো। মহানবিকে এক মহান সাহাবা প্রশ্ন করেছিলেন, সবচাইতে সম্মানীয় কে? সাহাবা চারবার প্রশ্ন

করেছিলেন, মহানবি তিনবার মা এবং পরে বাবার কথাটি বলেছিলেন।

যখন নিজেকে খান্নাসমুহু করতে পারেন তখনই সাধক বলে ফেলেন, ‘আনাল হক’ তথা ‘আমিই সত্য।’ তখনই জোনায়েদ বোগদাদি বলে ফেলেন, ‘লাইসা ফি জুব্বাতি সেওয়া আল্লাহতাআলা’ অর্থাৎ ‘এই জোবার মধ্যে আল্লাহ ছাড়া আর কিছু নেই।’ ইমামুল আউলিয়া বায়েজিদ বোস্তামি বলে ফেলেন, ‘আনা সুবহানি মা আজিমুশশানি’ তথা ‘আমিই সুবহানি সব শান আমারই।’ যুগে যুগে একই ধর্মের অনেক নবি-রসুলের আগমনের অনেক পরেও, অনেক নবি-রসুলের একই কথা প্রচার করা সত্ত্বেও, মানুষরূপী অসুরেরা অসুরই রয়ে গেল। এবং যারা আল্লাহ জাল্লা শানাহ-র পথে আসার আস্থান জানিয়েছিলেন তাঁরা অনেক রকম নির্মম নির্যাতনের শিকার হয়েছেন, ইহা অধম লিখকের কথা নয়, বরং ইহা ইতিহাসের একটি তিষ্ঠ রায়।

এখানে এই আয়াতের ব্যাখ্যা লিখতে গিয়ে সম্পূর্ণ একটি ভিন্ন বিষয়ের অবতারণা এ জন্যই করলাম যে অধিকাংশ মানুষ ভুল করে বসে, আর সেটা হলো পবিত্র রেজেক। ‘কুল মিন তাইয়েবাতে মা রাজাকনাকুম’ অর্থাৎ ‘পবিত্র ইহতে উপভোগ করো আমরা যে রেজেক তোমাদেরকে দিচ্ছি।’

মেজাজি পবিত্র রেজেকটি হলো— খাদ্যদ্রব্য এবং অন্যান্য বিষয়বস্তু যাহা আমরা গ্রহণ করি তাহা তিন

ভাগে ভাগ করা যায় : হারাম, হালাল এবং পবিত্র। যাহা ভোগ করতে মানা করা হয়েছে উহা হারাম, আর যাহা মানা করা হয় নি উহা হালাল। পবিত্র রেজেক বলতে এখানে আল্লাহর জাত-নুরে নুরময় করা বোঝানো হয়েছে। কারণ আল্লাহর ‘জাত’-নুর লা-মোকাম ছাড়া একমাত্র জিন ও মানুষের অন্তরের কাছেই ‘জাত’-রূপে অবস্থান করছেন। সুতরাং নফস যখন খান্নাসমুক্ত হয়ে আল্লাহর ‘জাত’-নুরে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠেন, আপন পীরের নির্দেশিত নিজের ধ্যানসাধনা ও মোরাকাবার মাধ্যমে, ইহাকেই বলা হয় পবিত্র রেজেক এবং ইহা আল্লাহ ‘আমি’-রূপ ধারণ না করে ‘আমরা’-রূপ ধারণ করে দান করেন।

একটি মহাপাপিষ্ঠ মানুষ যদি হালাল খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করে তাতে সে ওলি হয় না। আল্লাহর সাধারণ দানের মধ্যে হালাল-হারাম থাকতে পারে, কিন্তু ইহাতে কোনো বুজুর্গি বা শ্রেষ্ঠত্ব বা বৈশিষ্ট্য নাই। হালাল সাবান দিয়ে গোসল করলেই বুজুর্গি পাওয়া যায় না, তবু মেকাজ্জি অর্থে হালালকে হালালই বলতে হবে। এখানে একটি বিষয় লক্ষ্য করার মতো আর সেই বিষয়টি হলো, আল্লাহ কোরান-এ যতবার রেজেক দেবার কথাটি বলেছেন, ততবারই ‘আমি’ তথা একবচনে রেজেক বর্ণনের কথাটি বলা হয় নি, এখানে বহুবচন তথা ‘আমরা’-রূপ ধারণ করে আল্লাহ রেজেক বণ্টন করেন। অধম লিখকের পনের পারা কোরান-এর অনুবাদ করতে গিয়ে মোল্লা-মুরিদদের সাহায্য নেওয়াতে ‘আমরা’-কে আমি করে ফেলা হয়েছে। হয়তো ব্যস্ততার কারণে উহা লক্ষ্য করতে পারি নি, কিন্তু পরের সংস্করণে নিজে দেখেই করতে হবে।

কোরান-এ সালাতের উল্লেখ : ৫

কোরান-এর ২ নম্বর সূরা বাকারার ১১০ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে : এবং তোমরা সালাত কায়েম কর এবং জাকাত আদায় কর (ওয়া আকিমুস সালাতা ওয়া আতুজ্জ জাকাতা) এবং তোমাদের নফসের জন্য যাহা আশি হইতে পাঠাইবে উহাই অনেক ভালো। তোমরা

(উহা) আল্লাহর নিকট পাইবে। (ওয়াম্মা তুকাদ্দেমু লে আনফসিকুম মিন খাইরীন তাজ্জেদুহু এনদাল্লাহে)। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের কর্মের বিষয়ে নিজের চোখে দেখেন। (ইল্লাল্লাহু বেমা তাম্মালুনা বাসিরুন)।

ব্যাখ্যা

কোরান-এর সূরা বাকারার ১১০ নম্বর আয়াতটিতে আল্লাহ মারাত্মক একটি কথা আমাদেরকে জানিয়ে দিলেন আর সেই কথাটি হলো : বাকিতে কিছু পাবার কথা এখানে বলা হয় নি। বাকির নাম যে ফাঁকি এই আয়াতে সেটাও আমাদেরকে চোখে আঙুল দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন। তোমাদের নফসের জন্য যাহা কিছুই আগে থেকেই অর্জন করতে পারবে উহা তোমাদের জন্য খুবই ভালো। ভালো তখনই যখন আল্লাহর মনোনিতি বিষয়গুলো আল্লাহর নামে অর্জন করতে পারবে তথা পাঠিয়ে দিতে পারবে। এখানে নফসের অর্জন করাটাই আগে পাঠিয়ে দেওয়া বুঝানো হয়েছে। তাই উহার ফলাফল তথা ভালো-মন্দ— এবং বিশেষ করে এখানে ভালোটাই বলতে চাই— উহাই আল্লাহর নিকট পাবে। ইহা মরণের পরে পাওয়া বুঝানো হয় নি। কারণ মরণের পরে পাওয়াটাই একদম বাকি। এবং বাকির নাম ফাঁকি। এই মরণ মেরাজি মরণ, এই মরণ নফসের মেরাজি মরণ। কারণ মরণ দুই প্রকার : একটি মেরাজি মরণ, অপরটি হাকিকি মরণ। মেরাজি মরণ দেহত্যাগের মরণ, হাকিকি মরণ খান্নাসত্যাগের মরণ। তাই খান্নাসত্যাগের মরণকেই বলা হয়েছে, ‘মৃত কাবলা আনতা মৃত’ তথা ‘মরার আগে মরে যাও’ মেরাজি মরণের আগে হাকিকি মরণ বরণ করে নাও। তথা খান্নাসমুক্ত নফসটি কেমন করে অর্জন করা যায়, কেমন করে ধ্যানসাধনা, মোরাকাবার মাধ্যমে খান্নাসমুক্ত নফসের অধিকারী হওয়া যায় তথা মরার আগে মরে যাওয়া যায় তা শিখে নাও। তা হলেই আল্লাহর পুরস্কারটি পাবার কথাটি ঘোষণা করা হয়েছে।

খেয়াল করুন, নফস হতে খান্নাসত্যাগ করার কথাটি বলা হয়েছে। খেয়াল করুন, রুহ হতে খান্নাসত্যাগ করার কথাটি বলা হয় নি। অথচ রুহ আমার

শাহারগের নিকটেই আছেন। এখানে এসেই অনেকেই তালগোল পাকিয়ে নিজের ভুলে নিজেকে জড়িয়ে পড়েন। এবং ভুল ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে সহজ-সরল মানুষগুলোর পথগুলোকে আকাবাকা করে দেয়। খেয়াল করুন, নফসকে মরার আগে মরতে বলছে, তথা 'মৃত্যু কাবলা আনতা মৃত।' খেয়াল করুন, রুহকে মরার আগে মরার কথাটি বলা হয় নি। কেন বলা হয় নি? রুহ জন্মগ্রহণ করলে তো মারা যাবার প্রশ্ন আসে। নফস জন্মগ্রহণ করে, তাই মারা যাবার প্রশ্নটি আসে। নফস ঘুমায়, রুহ ঘুমায় না। নফস লোভ-মোহের ফাঁদে পড়ে যায়, আর রুহের বেলায় লোভ-মোহের ফাঁদের প্রশ্নই উঠে না। তাই কোরান-এ একটি বারও বলা হয় নি যে রুহ মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করে, বরং বলা হয়েছে নফস তথা প্রাণ তথা জীবাত্মা মৃত্যুর স্বাদটি গ্রহণ করে। পক্ষান্তরে এইসব বাটবামেলা আজ্ঞে-বাজ্ঞে সব রকম ফাং ফুং হতে রুহ সম্পূর্ণ মুক্ত। কারণ যদি খান্নাসমুক্ত নফসটি অর্জন করার অদম্য ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষা থাকে তা হলে তাকে সালাত কায়েম করতে হবে তথা আল্লাহর সঙ্গে যোগাযোগের প্রচেষ্টাটি চালিয়ে যেতে হবে তথা আল্লাহর সংযোগ প্রচেষ্টায় নিজেকে নিয়োজিত রাখতে হবে। এবং যেইমাত্র সালাতটি কায়েম হয়ে যাবে তথা যোগাযোগটি স্থাপিত হয়ে যাবে তখনই একটি নফস জাকাত দিতে পারে। এর আগে জাকাত দেওয়া একটি নফসের পক্ষে অসম্ভব। তবে হ্যাঁ, মেজাজি জাকাত তথা মালের জাকাত যে কেহ অনায়াসে দিতে পারবে। মালের জাকাত দেবার প্রশ্নে অনেকে সালাতের খুব বেশি একটা ধার ধারে না। অথচ সুন্দর মালের জাকাত দিয়ে যাচ্ছে! এই মালের জাকাতকেই মেজাজি জাকাত বলা হয়। আর হাকিকি জাকাত হলো, খান্নাসমুক্ত নফস যখন আল্লাহর রহস্যলোকের দর্শন পায় তখনই নিজেকে সম্পূর্ণরূপে জাকাত দেবার যোগ্যতা অর্জন করে।

এই হাকিকি জাকাতটি দেওয়া চারটিখানি কথা নয়।

ইহা কোনো

মামুলি বিষয় নয়। ইহা ক্যালকুলেটর মেশিনে মাথা

খাটিয়ে মালের জ্বাকাত দেওয়া নয়। ইসলামের কোনটা মেজাজি আর কোনটা হাকিকি ইহা না বুঝতে পারলেই যত রকম ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়। এই ফেরকাবাজি হতেই লাঠালাঠি, মারামারি, খুনাখুনি পর্যন্ত হতে দেখি এবং ইনশাল্লাহ আরও দেখতে হবে।

যেহেতু মানুষের নফসের সঙ্গে আল্লাহ রুহরূপে শাহারগের নিকটেই আছেন তাই সব কিছু প্রতিটি মুহূর্তে আল্লাহর দেখাটা খুব বেশি একটা আশ্চর্যের বিষয় নয়। আমরা আল্লাহকে সাত আসমানের উপরে তথা লা-মোকামে বসিয়ে রাখি, তাই কোরান-এর যত আজ্জেবাজ্জে তফসির, কোরান-এর ‘আলুজ্জালু মিরকাবালু’-মার্ক্য ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ দেখতে পাই।

মহানবি হেরাণ্ডহায় পনেরটি বছর কেন একাকী একদম নির্জনে ধ্যান-সাধনা তথা মোরাকাবা-মোশাহেদাটি করলেন? এই ধ্যানসাধনাটি মোটেও মহানবির জন্য নহে, বরং তাঁর উম্মতকে শিক্ষা দেবার জন্য। যদি কেহ মনে করে- এই ধ্যানসাধনা মহানবির জন্যই, তা হলে আমি অধম লিখক তাহাকে ১০০% কাফের বলে ফতোয়া দিতে চাই। মহানবি তাঁর উম্মতদেরকে চোখে আঙুল দিয়ে বুঝিয়ে দিয়ে গেলেন এই বলে যে : দ্যাখো, কোরান নগদই পেলাম, বাকিতে নয়; জিবরাইল আমিনের দেখাটি নগদই পেলাম, বাকিতে নয়; রেসালত, নবুয়ত, বেলায়েত এবং আবদিয়াত এই চারটি নগদই পেলাম, বাকিতে নয়।

নবি জাকারিয়ার প্রতিষ্ঠিত অনেকগুলো খানকার একটি রুমে তথা কক্ষে ওলি মা মরিয়ম ধ্যানসাধনা

করে যে অসময়ের ফল (আনসিজনাল ফ্রুট) পাইতেন
 উহা দেখে নবি জাকারিয়া নিজেই চমকে যেতেন। নবি
 জাকারিয়া (আ.) ওলি মা মরিয়মের ধ্যানসাধনার
 কঙ্কটির দোহাই দিয়ে আল্লাহর পাক দরবারে বৃদ্ধ
 বয়সে সন্তান চাইলেন এবং আল্লাহ তা দিলেন। এই
 কথাগুলোর মধ্যে অনেক রকম রহস্য লুকিয়ে আছে
 যাহা মোটেই কাগজ-কালিতে লেখা যায় না। যেমন
 বলতে পারেন নি আসহাবে সুফ্ফার জলিল কদরের
 সাহাবা হজরত আবু হরায়রা (রা.), যেমন বলে যেতে
 পারেন নি মহানবির চাচা ইবনে আব্বাস (রা.), যেমন
 বলে যেতে পারেন নি জলিল কদরের সাহাবা হজরত
 হজায়ফা (রা.), যেমন বলে যেতে পারেন নি জলিল
 কদরের সাহাবা হজরত আবু জর গিফারি (রা.) এবং
 আরও অনেকে। আল্লামা ইকবাল বলেছেন : তোমার
 এই দেহটিতে যা আছে, তা আছে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে।
 তোমার এই দেহটি মেরাজে যাবার বোরাক। তোমার
 এই দেহটি আল্লাহর সব রহস্যের মূল ভাণ্ডার এবং
 এটাই যদি খেয়াল করতে না পারো তা হলে কিছুই
 পাবার আশা করা যায় না। পশ্চিমা লেখকদের মধ্যে
 যারা মহানবির ভূয়সী প্রশংসা করে গেছেন তাদের মধ্যে
 জর্জ বার্নার্ড শ অন্যতম। সেই জর্জ বার্নার্ড শ-ই বলে
 গেছেন যে, যাদের আল্লাহ কেবলমাত্র আসমানেই থাকে

তারা বড়ই ভয়ঙ্কর, তাদের থেকে যত দূরে থাকতে
পারো ততই মঙ্গল

যারা মেজাজি মরণের পর আল্লাহর মেজাজি পুরস্কার
পাবার কথাটি বলে বেড়ান তাদেরকেও দোষ দিতে
নাই। কারণ কয়েকটি কেসামতের মুখোমুখি হবার
পরেই হাকিকি বিষয়গুলো ধরা দিতে থাকে। সুতরাং
সবার উপলব্ধি ও দর্শনের ব্যাপ্তি কখনই সমান হয় না।
তাই আমরা দেখতে পাই, আল্লাহর বড় বড় ওলিরা
কখনও বলেছেন : তকদিরের খেলা, কখনও বলেছেন :
আল্লাহর হাতে ছেড়ে দাও। কিন্তু মহানবি তাঁর নিজের
জন্য ধ্যানসাধনা করেছেন বলে যারা মনেপ্রাণে বিশ্বাস
করবে তাদেরকে আল্লাহর সব ওলিরাই বিনা বাক্যে
কাফের ফতোয়া দিয়েছেন। নবি হবার শর্তটি যে এলমে
গায়েব জানতে হবে সেটা কাটা কাফের আবু জাহেলও
জানতো। তাই হাতের ছোট পাথরের কণাগুলো মুষ্টিবদ্ধ
করে মহানবিকে বলেছিল, ‘আম্মার হাতের ভিতরে কী
আছে?’ মুষ্টিবদ্ধ করার অর্থই হলো এলমে গায়েব
জানার দলিল। এবং এলমে গায়েব জানাটি হলো নবি
হবার একটি শর্ত। আবু জাহেলের মতো কাফের নবি
হবার শর্তটি এলমে গায়েব জানতেই হবে বলে যেখানে
বিশ্বাস করতো, সেখানে ওহাবি ফেরকা, বাটালভি
ফেরকা এবং চক্রালভি ফেরকার অনুসারীদের

অবস্থানটি আবু জাহেলের চেয়েও যে নিচে, অন্ধের হিশাবে ইঁহা পরিষ্কার ধরা পড়ে যায়।

কোরান-এ সালাতের উল্লেখ : ৬

কোরান-এর ২ নম্বর সূরা বাকারার ১২৫ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে : এবং যখন আমরা ঘরটিকে (কাবাকে) মানুষদের জন্য ঘাঁটি (মিলনকেন্দ্র) এবং নিরাপত্তার স্থানরূপে নির্বাচন করিলাম (ওয়া ইজ্জ জাআলনাল বাইতা মাসাবাতান লিল্লাসে ওয়া আমনান) এবং মাকামে ইব্রাহিমকে মুসাল্লা (সালাতের স্থান) রূপে গ্রহণ করিতে বলিলাম (ওয়াত্তাখেজু মিন মাকামে ইব্রাহিমা মুসাল্লা) এবং আমরা ইব্রাহিম এবং ইসমাইল হইতে তওয়াফকারী এবং এতেকাফকারী এবং রুকু সেজদাকারীদের জন্য আমার ঘরটিকে পবিত্র রাখার জন্য অঙ্গীকার গ্রহণ করিলাম (ওয়া আহেদনা ইলা ইব্রাহিমা ওয়া ইসমাইলা আন তাহহেরা বাইতিয়া লিত্তায়েফিনা ওয়াল আকেফিনা ওয়ার রুক্কে ইসসুজুদে)।

ব্যাখ্যা

কোরান-এর এই আয়াতটি দ্বিগুণ প্রথমতঃ একটি বিষয় প্রমাণিত করা যায় যে, দুনিয়ার সমস্ত সাহিত্যকর্ম একত্রিত করলেও এই আয়াতটির ভাষা ও শৈলীর ধারে কাছেও যেমতে পারবে না। উর্বর মস্তিষ্কের অধিকারীরা এবং দুনিয়ার বৈষয়িক জ্ঞানের অধিকারীরা আমার এইরূপ মন্তব্যে হয়তো মুচকি হেসে যা-তা একটা কিছু বলতে চাইবে এবং এ

রকম কিছু একটা যে বলতে চাইবে ইঁহা বিদ্যাশিক্ষার কর্মফল হইতেই অভিজ্ঞতাটি অর্জন করেছি। ভূতের দেশে কিছুদিন বাস করলেই পেত্নীদের চালচলন জ্ঞানবিদ্যার রঙ-চঙগুলো পরিষ্কার বোঝা যায়। কেন এতগুলো কথা বললাম? নিশ্চয়ই এর পেছনে কোনো কারণ থাকতে পারে। আর সেই কারণটিই হলো, কোরান মেক্কাজি কাবার এবং হাকিকি কাবার সমন্বয়ে যে আয়াতটি নাজেল করেছেন তাকে মেক্কাজি অর্থেও গ্রহণ করা যায় আবার হাকিকি অর্থেও গ্রহণ করা যায়। তবে এই আয়াতের মূল বিষয়বস্তুটিতে হাকিকি কাবার কথাটিই বলা হয়েছে। কিন্তু মেক্কাজি কাবার অবস্থানটিকে অস্বীকার করলে কাবার মূর্তরূপটি আর থাকে না। মেক্কাজি কাবার মূর্তরূপটি আছে বলেই প্রতিবছর মেক্কাজি হজ্জের বিরাট আয়োজন করা হয়। এখান থেকেই আল্লাহর বিশেষ রহমতপ্রাপ্ত ব্যক্তির হাকিকি কাবার পরিচয়টি যে লুকিয়ে আছে উহা ধরতে পারে। অবশ্য শরিয়তের দৃষ্টিতে অধম লিখক মেক্কাজি কাবার মূল্যায়নটি বেশি করতে বাধ্য হচ্ছি। কারণ মূর্ত না থাকলে বিমূর্তের পরিচয় ধরা যায় না। মানবদেহ আছে বলেই নফসের পরিচয়টি বোঝা যায়। মোহরম্মের মাতম আছে বলেই কারবালার বিষাদময় ঘটনা এবং রসুলের আওলাদদের শহিদ হবার ঘটনা এবং বিশেষ করে শহিদে আজম ইমাম হোসেইন আলাইহেস সালাতুস সালামের ঘটনাটি প্রতিবছর মনে করিয়ে দেয়। প্রতিবছর মনটিকে বেদনায় ডুবিয়ে দেয়। যদি মোহরম্মের মাতমের ঘটনাটি না থাকতো তা হলে আওলাদে রসুলদের কারবালায় নির্মম শহিদ হবার ঘটনাগুলো কেবল ইতিহাসের পাতায় লেখা থাকতো অথবা ফিল্ম বানিয়ে ছবি দেখানো যেত। সুতরাং কোনো অবস্থাতেই মেক্কাজি কাবার মেক্কাজি হজ্জটিকে খাটো করে দেখার অবকাশ নাই।

অধম লিখক ধরে নিলাম, এই ব্যাখ্যাটি তথা এই কথাগুলো মেক্কাজি কাবার জন্যই বলা হয়েছে। সেই

কথাগুলো কী? হজরত হাসান বসরি বলেছেন : হজরত ইব্রাহিম (আ.) ও হজরত ইসমাইল (আ.)-কে আল্লাহ যে নির্দেশ দিয়েছিলেন সেই নির্দেশটি হলো, কাবা ঘরটিকে দুনিয়ার বস্তু ও আবর্জনা হতে পবিত্র রাখা। সাঈদ ইবনে জরির বলেছেন যে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেন : আন্ তাহেরান বাইতি অর্থাৎ ঘরটিকে পবিত্র রাখো। এই ‘পবিত্র রাখো’ কথাটির দ্বারা কোনো কোনো তফসিরকারী মূর্তি হইতে পবিত্র রাখার কথাটি বলেছেন। এখানে একটি প্রশ্ন থেকে যায় : ইহা কি মাটি-পাথরের মূর্তি, না লোভ-মোহের দ্বারা তৈরি বিমূর্ত মূর্তি? যদি কেউ বলেন, ইহা মাটি-পাথরের মূর্তি, তা হলে ঠিক আছে; আবার কেহ যদি বলেন, ইহা লোভ ও মোহের দ্বারা নির্মিত বিমূর্ত মূর্তি, ইহাও ঠিক আছে। এই ‘আন্ তাহেরান বাইতি’ যাহা হজরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, ইহার অনেক রকম ব্যাখ্যা দেখতে পাই। অনেকেই বলেছেন : মূর্তি, পাপকর্ম, পাপকথা, মিথ্যা এগুলো থেকে ঘরটিকে পবিত্র রাখতে হবে। আবার অনেকে এই কথাটির উপর ভিত্তি করে ব্যাখ্যা লিখেছেন যে, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো ইলাহর স্থান নাই এ রকম ব্যাখ্যাটিও করেছেন। কারণ আল্লাহর ঘরে অন্য ইলাহ অবস্থান করলে শেরেক হয়ে যায় তথা অংশীদারিত্বের কথাটি মেনে নেওয়া হয়। অনেকে বলেছেন, আল্লাহর ঘরে

কোনো মূর্তিরই থাকার স্থান হতে পারে না। সবচেয়ে যে বড় মূর্তিটি উহার নাম লোভ-মোহ তথা লাত্-মানাত।

হাকিকি কাবার কথাটি বলতে গেলে কাবাকে মানব দেহ এবং কলবের প্রতীক করা হয়েছে। মানব দেহটি নিরাপত্তাহীন। কারণ নফসের সঙ্গে খান্নাস আছে। খান্নাস থাকলেই মানব দেহটির নিরাপত্তাহীন হয়ে পড়ে। এই মানব দেহের ভিতরে যে কলব নামক গোশতের টিকরা আছে উহা তখনই সম্পূর্ণরূপে নিরাপত্তাহীন হয়ে পড়ে যখন খান্নাসরূপী শয়তানটি অবস্থান করে। যখন মানব দেহের এই কলব নামক গোশতের টিকরা হইতে খান্নাসটিকে ত্যাগিয়ে দেওয়া হয় তখন সমস্ত মানব দেহ নামক কাবাটি পবিত্র হয়ে যায় আর খান্নাস থাকলে মানব দেহটি অপবিত্র হয়ে যায়। এই খান্নাসরূপী শয়তানই মানব দেহের অভ্যন্তরে কলব নামক স্থানে অবস্থান করে লোভ-মোহ নামক অনেক মূর্তির পূজা করায় এবং ঐ মূর্তিপূজা কুরাটিকেই বলা হয় শেরেক করা। সুতরাং শেরেক ভিতরের বিষয়, বাহিরের

বিষয় নয়। খান্নাসমুক্ত মানব দেহটির অধিকারীরাই জগতগুরু, জগতপীর, জগত মুরশিদ, জগত সাই বাবা। হজরত ইব্রাহিম (আ.) এবং হজরত ইসমাইল (আ.) জন্ম হতেই আজন্ম খান্নাসমুক্ত। কারণ তাঁরা নবি, তাঁরা জগত নামক বৃত্তের কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান করেন। তাই ‘তাঁহার মোকাম’ তথা ইব্রাহিমের মোকাম তথা তাঁহার মর্যাদার স্তরের দিকে অগ্রসর হবার অনুশীলন করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সেই নির্দেশের মূল বিষয়টি হলো সালাত তথা যোগাযোগ তথা সংযোগ। মোকামে ইব্রাহিম-কে মুসাল্লারূপে গ্রহণ করো— এরূপ কথাটি না বলে ইব্রাহিমের মোকাম হতে মুসাল্লা গ্রহণ করতে

নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মুসাল্লা শব্দটির অর্থ হলো সালাতের অবস্থান

অথবা আসন, যে- আসন বা অবস্থান হতে সালাত নামক যোগাযোগের মাধ্যমে ধ্যানসাধনাটি করতে হয়। হজরত ইব্রাহিম (আ.)-এর উচ্চতম মর্যাদার সালাতের যে উচ্চতম স্থান উহাকে মুসাল্লারূপে সহসা কেহই গ্রহণ করে নিতে পারবে না। এ জন্যই ‘উহা হইতে আসন’ গ্রহণ করবার নির্দেশটি দেওয়া হয়েছে। এখন যার পক্ষে যতটুকু সম্ভব সেইরূপ মর্যাদা হতেই ততটুকু গ্রহণ করে নিতে পারবে। আরও একটি কথা থেকে যায় আর সেটা হলো, এই পথের পথিক হতে না চাইলে কাউকে খান্নাসমুক্ত করা যায় না। ‘তওয়াফকারী’ বলতে আত্মদর্শনের খান্নাসমুক্ত অনুশীলনকারী সাধকদেরকেই বোঝানো হয়েছে। তওয়াফ করতে করতে যখন খান্নাসমুক্ত হয়ে পড়েন তখন অনুশীলনকারী দেখতে পান যে তিনি জীবন্ত একটি কাবা।

সেজদায় পৌঁছুবার জন্য রুকু করার অর্থটি হলো খান্নাসকে কলব হতে মুক্ত করার বিভিন্ন প্রকার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া। অনেকটা উপমার ছলে বলছি, সৈনিকদের আদর্শ সৈনিক হবার জন্য যে রকম অনেক সহজ ও কঠিন অনুশীলন করে যেতে হয়, সেই রকম রুকু-সেজদার মাধ্যমে খান্নাসকে তাড়াবার অনুশীলন করতে হয়। তবেই হাকিকি কাবার পরিচয়টি লাভ

করা যায়। এই লাভ নগদ লাভ। এই লাভ বাকিতে নয়। কারণ বাকির নাম ফাঁকি। মেজাজি হাজিদের জন্য বাকিতে পাবার কথাটি খাটে, তবে ইহা ফাঁকি নয়; কারণ অনুশীলনের মর্যাদা অনুযায়ী দু'য়েকটি কেয়ামত দর্শনের পরই আত্মদর্শনটি হয়।

কোরান-এ সালাতের উল্লেখ : ৭

কোরান-এর ২ নম্বর সূরা বাকারার ১৫৩ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে : হে তোমরা যাহারা ইমান আনিয়াছ! আমাদের নিকট সাহায্যপ্রার্থী হও, সবার (ঐখ্য) এবং সালাতের সাথে (মাধ্যমে)। (ইয়া আইয়ুহাল লাজিনা আম্মানুসতান্নু বিস সাবরে ওয়াস সালাতে)। নিশ্চয়ই আল্লাহ সবারকারীদের (ঐখ্যশীলদের) সাথেই থাকেন (ইল্লাল্লাহা মাআস সাবেরিনা)।

ব্যাখ্যা

ছোট্ট তিনটি আয়াত। ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ অত্যন্ত গভীর। গভীরের চেয়েও অনেক বেশি গভীর। প্রথমেই আল্লাহ বলছেন : হে আম্মানুরা তথা হে ইমানদারেরা, তথা যারা ইমান এনেছে কেবল তাদেরকেই আল্লাহ বলছেন। এখানে মানবজাতিকে উল্লেখ করে বলা হয় নাই, তথা 'ইয়া আইউহান নাস' বলা হয় নাই। এখানে মুসলমানদের উদ্দেশ্য করে বলা হয় নি, তথা 'ইয়া আইউহাল মুসলেমুন' বলা হয় নি। এখানে মোমিনদের

উদ্দেশ্য করে বলা হয় নি, তথা ‘ইয়া আইউহাল মুমিনুন’ বলা হয় নি। এখানে আলবাব এবং আফসারদের উদ্দেশ্য করে বলা হয় নি, তথা জ্ঞানীলোক এবং চিন্তাশীলদের লক্ষ্য করে বলা হয় নি, বরং একমাত্র তাদেরকেই বলা হয়েছে যারা ইমান এনেছেন। কী বলা হয়েছে? কী আদেশটি দেওয়া হয়েছে? কী উপদেশটি রাখা হয়েছে? বলা হয়েছে, তোমরা আল্লাহর কাছে সাহায্য চাও। সেটা কী সাহায্য? সেটা কি বিত্ত-বৈভবের সাহায্য? সেটা কি বিলাসিতায় চমকানো তথাকথিত সভ্যতার আলোকে প্রতিষ্ঠিত হবার সাহায্য? তা হলে এখানে আল্লাহকে আল্লাহরূপে পাচ্ছি না, এখানে আল্লাহকে রবরূপে পাচ্ছি না, এখানে আল্লাহকে রহমান ও রহিমরূপে পাচ্ছি না, বরং আল্লাহকে একটি বিশেষরূপে পাচ্ছি আর সেই রূপটির নাম হলো : ‘মস্তান।’

খান্নাসমুক্ত নফসে রুহের উচ্ছাসিত রূপ যার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তাঁকেই ‘মস্তান’ বলা হয়; তাঁকেই আবার ‘ওয়াজহুল্লাহ’ বলা হয় তথা আল্লাহর চেহারা বলা হয়; তাঁকেই আবার ‘বান্দানেওয়াজ্জ’ বলা হয়, তথা যে বান্দার মধ্যে আল্লাহর নেওয়াজ্জ তথা রহমতটি ফুটে উঠেছে। বাংলা ভাষায় বলা হয় নরের রূপে নীরায়ণ তথা নরনারায়ণ। অন্যের গান্ধদাহ হবার প্রশ্নে বলছি না, বরং নিরপেক্ষ বিশ্লেষণ করে বলছি, যারা খান্নাসমুক্ত নফসের অধিকারী তাঁরাই মস্তান। এক কথায় এরাই আল্লাহর ওলি।

এই মস্তানি সাহায্য চাইতে বলেছে কোরান। কিন্তু তাদেরকে বলা হয়েছে? যারা ইমান এনেছে তাদেরকে

বলা হয়েছে। আর যাঁরা খান্নাসমুক্ত নফসের অধিকারী, তাঁরা তো নিঃসন্দেহে মোমিন। মোমিনের উপরও খুব কম ছোটখাট কিছু আদেশ-উপদেশ দেবার কথাটি কোরান-এ পাই। আমরা পরে মোমিনদের উপর যে ছোটখাট আদেশ-উপদেশগুলো দেওয়া হয়েছে সেইগুলো কোরান হতে তুলে ধরবো এবং ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করবো। তবে অল্প কথায় বলছি, মোমিনদেরকে যে আদেশ-উপদেশগুলো দেওয়া হয়েছে সেই উপদেশগুলো ছোটখাট উপদেশ। দুঃখ হয় যখন অনুবাদক ‘আমানু’-কে ‘মোমিন’ বলে অনুবাদ করেন। এই ‘আমানু’-কে ‘মোমিন’ বলে অনুবাদ যারা করে তাদের এই অনুবাদের শ্রী দেখে ইঞ্জিল এবং তাওরাত-এর অনুবাদগুলোর বিকৃত, বানোয়াট এবং মনগড়া অনুবাদগুলো ধর্মের আসল বিষয়গুলোকে কতখানি চাপা দিয়ে ফেলেছে তা বোঝা যায়। আমাদের বড়ই সৌভাগ্য যে কোরান-এর অনুবাদ পাই নি, বরং আল্লাহর নাজেলকৃত আরবি ভাষার কোরান-টিকে হবহ পেয়েছি।

এই মস্তানি সাহায্যটি ইমানদারদেরকে চাইতে বলছেন আল্লাহ তাঁর কোরানুল করিম-এ। সাহায্য চাইতে বলা হয়েছে খান্নাসমুক্ত নফসের অধিকারী হবার জন্য। কোরান বলছে, সবার এবং সালাতের মাধ্যমে সাহায্যটি চাইতে হবে। সবার অর্থ ধৈর্য আর সালাত অর্থ

নামাজ্জ তথা যোগাযোগ তথা আল্লাহ্র সঙ্গে সংযোগ প্রচেষ্টা।

প্রথমে সবার তারপর সালাতের কথাটি বলা হয়েছে। কিন্তু এই কথাটি বলা হয় নি যে, প্রথমে সালাত তারপরে সবার। এখানে ওয়াজিয়া সালাতের চেয়ে দায়েমি সালাতের কথাটির প্রতি বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে বলেই প্রথমে সবার তথা ধৈর্যধারণের কথাটি বলা হয়েছে। ওয়াজিয়া সালাতের মধ্য দিয়ে দায়েমি সালাতের দিকে অগ্রসর হতে হলে বিরাট ধৈর্যের প্রয়োজন তথা সবারের প্রয়োজন। কিন্তু শেষের আয়াতটি পড়ে চমকে যেতে হয়, অবাক হতে হয়, বিস্ময়ে অভিভূত হতে হয়, যখন দেখতে পাই আল্লাহ বলছেন, ‘ইন্নালাহা মা আস সাবেরিন’ তথা ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ সবারকারীদের সঙ্গে আছেন’ তথা যারা ধৈর্যধারণ করতে পারে তাদের সঙ্গেই আল্লাহ আছেন বলে ঘোষণাটি দেওয়া হয়েছে। মস্তানি সাহায্য চাইতে ইমানদারদেরকে বলা হয়েছে : সবার ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য চাও তথা ধৈর্য ও নামাজের মধ্য দিয়ে সাহায্যটি চাও। সাহায্যটি চাইবার প্রশ্নে এখানে আমরা দুটি শব্দ দেখতে পাই : একটি ‘সবার’, আরেকটি ‘সালাত’। কিন্তু পরিশেষে আল্লাহ এই কথাটি বললেন না যে, ইন্নালাহা মা আস সাবেরিন ওয়া মাল মুসাল্লিন অর্থাৎ নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে এবং নামাজীদের সঙ্গে আছেন তথা ওয়াম্মাল মুসাল্লিন শব্দটি তথা নামাজীদের সঙ্গে আছি, কথাটি বলা হয় নি। এবং পাঠকেরা অবাক হবেন এই কথাটি শুনে যে, সমগ্র কোরানুল মজিদ-এর একটি আয়াতেও বলা হয় নি যে, আল্লাহ নামাজীদের সঙ্গে আছেন। কেন বলা হয় নি? লোক-দেখানো নামাজ্জ এবং আল্লাহ্র সঙ্গে

যোগাযোগের নামাজের মধ্যে আকাশপাতাল পার্থক্য। লোক-দেখানো নামাজের জন্য পুরস্কার পাবার তো প্রশ্নই ওঠে না, বরং ওয়াইল নামক দোজ্জখে ফেলে দেবার কথাটিও জানতে পারি। আওলাদে রসূল, শহিদে আজম এবং ‘আম্মা হতে হসাইন এবং আম্মি হসাইন হতে’ তথা ‘হসাইনু মিন্নি ওয়া আনা মিনাল হসাইন’-সেই আওলাদে রসূল ইমাম হসাইনের তাঁবুতে কারবালার রণপ্রান্তরে নামাজ আদায় করার আজ্ঞানের সুমধুর আশ্বানটি জানানো হচ্ছে : আবার নরপিশাচ এজিদের ধাবমান মনুষ্যরূপী কুণ্ডাদের তাঁবুতেও আজ্ঞানের ধ্বনি শোনা যাচ্ছে। আওলাদে রসূল ইমাম হসাইনের তাঁবুতে মহানবির জলিল কদরের সাহাবারা নামাজ-রুকু-সেজদা দিচ্ছেন : আবার নরপিশাচ এজিদের ধাবমান মনুষ্যরূপী কুকুরেরা, যারা এজিদের কাছে ইসলামের আদর্শ ফেলে দিয়ে বিবেকের শেষ সঞ্চলটুকুও বিক্রি করে দিয়েছে, তারাও নামাজ পড়ছে। মানুষের সর্বশেষ সঞ্চলটি হলো তার বিবেক। এই শেষ সঞ্চল বিবেকটুকু যারা বিক্রি করে দেয় তারা তো পশুর চেয়েও খারাপ। পশুরাও এদেরকে ঘৃণা করে। দুই দিকেই আজ্ঞান, দুই দিকেই রুকু-সেজদা-নামাজ। তাই আল্লাহ কোরান-এর একটি আয়াতেও বলেন নি, ‘আম্মি নামাজিদের সঙ্গে আছি।’ তাই ‘ওয়া মাল মুসাল্লিন’ তথা ‘এবং নামাজিদের সঙ্গেও আছি’ এই কথাটি না

বলে বলা হয়েছে ‘ইন্নালাহা মা আস সাবেরিন’ তথা ‘নিশ্চয়ই আমি ধৈর্যশীলদের সঙ্গে আছি।’

আল্লাহর ওলিরা বছরের পর বছর ধরে ধ্যানসাধনা তথা মোরাকাবা-মোশাহেদার মাধ্যমে খান্নাসমুহ নফসের অধিকারী মোমিন হবার জন্য ধৈর্যধারণ করে থাকেন। সুতরাং ধৈর্যশীলদের সঙ্গেই আল্লাহ আছেন বা থাকেন কথাটি বলা হয়েছে।

কোরান-এ সালাতের উল্লেখ : ৮

কোরান-এর ২ নম্বর সূরা বাকারার ১৭৭ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে : ‘তোমাদের মুখমণ্ডলকে পূর্ব এবং পশ্চিম দিকে ফেরানোতে কোনো প্রকার পুণ্য নাই। (লাইসালবেররা আন তুয়াল্লু উজ্জুহাকুম কেবালান মাশরেকে ওয়াল মাগরেবে) বরং পুণ্য রহিয়াছে যে ব্যক্তি আল্লাহতে ইমান আনিয়াছেন এবং ইয়াওমিল আখেরে (পরকালের দিনের প্রতি) এবং ফেরেশতাগণের প্রতি কেতাব ও নবিগণের প্রতি ইমান আনে। (ওয়া লাকিনুনাল বেররা মান আমানা বিল্লাহে ওয়াল ইয়াওমিল আখেরে ওয়াল মালাইকাতে ওয়াল কেতাবে ওয়ান নাবিয়্যিনা)। এবং (আল্লাহর) ভালোবাসায় আত্মীয় এবং এতিম এবং মিসকিন এবং মুসাফির এবং সাহায্যপ্রার্থিকে এবং দাসমুক্তির জন্য সম্পদ দান করে (ওয়া আতাল মালা আলা ইব্বিহি জাভীল কুরবা ওয়াল ইয়াতামা ওয়াল মাসাকিনা ওয়াবিনাস্‌সাবীলে ওয়াস্‌সায়েলীনা ওয়া ফিররেকাবে)। এবং সালাত কায়েম করে এবং জাকাত আদায় করে (ওয়া আকামাস সালাতা ওয়া আতাজ্জাকাতা) এবং আদায়কৃত ওয়াদাকে পরিপূর্ণ করে যখন ওয়াদা করা হয়। (ওয়াল মুফনা বে আইদেহীম ইজা আহাদু)। এবং ধৈর্যধারণ করে দুঃখে কষ্টে এবং রোগে শোকে এবং যুদ্ধবিগ্রহের সময়ে। (ওয়াসসাবেরীনা ফীল বাসায়ে ওয়াদ দাররায়ে ওয়া হিনাল বাসে)। উহারাই তাহারা যাহারা সত্যবাদী,

(উলাইকাল লাজিনা সাদাক) এবং উহারাই তো হন মুঠাকিন (খোদাভীর), (ওয়া উলাইকা হমুল মুঠাকুনা)।

ব্যাখ্যা

এই আয়াতের প্রথমেই একটি গভীর রহস্যপূর্ণ কথা বলা হয়েছে। সেই কথাগুলোর অনেক রকম অর্থ হতে পারে এবং নিরপেক্ষতা কতটুকু বজায় থাকে তা-ও বলা কঠিন ব্যাপার। তবে যতটুকু বুঝবার শক্তি দান করা হয়েছে ততটুকুর বেশি ব্যাখ্যা দেওয়া কারো পক্ষেই সম্ভবপর নয়। আয়াতের প্রথমেই বলা হয়েছে, পূর্ব এবং পশ্চিম দিকে মুখ ফেরানোতে কোনো প্রকার লাভও নাই, লোকসানও নাই; তথা পুণ্যও নাই, পাপও নাই। এখানে একটি কথা থেকে যায় যে উত্তর এবং দক্ষিণে চেহারাগুলো ফেরানোতে কোনো ভালোও নাই, মন্দও নাই— কেন বলা হলো না? উত্তর-দক্ষিণ কী এমন দোষ করেছে যে উত্তর-দক্ষিণ বাদ দিয়ে পূর্ব ও পশ্চিমের কথা বলা হলো, তা-ও চেহারাগুলো পূর্ব-পশ্চিমে ফেরানোতে কোনো লাভও নাই, লোকসানও নাই—বলা হলো কেন? আর মুখমণ্ডলগুলো কেনই বা পূর্ব ও পশ্চিম দিকে ফেরানোর কথাটি বিশেষভাবে উল্লেখ করা হলো? কী এমন পুণ্য আছে এই পূর্ব ও পশ্চিম দিকে মুখমণ্ডল ফেরানোতে? কী এমন অবহেলার বিষয় হলো উত্তর-দক্ষিণ দিকটির নাম উল্লেখ না করে? এই পূর্ব-পশ্চিম বলতে আল্লাহ কী বুঝাতে চেয়েছেন? আবার উত্তর-দক্ষিণের কথাটি উল্লেখ না করেই বা কী এমন রহস্য লুকিয়ে রাখা হয়েছে? যদি ব্যাখ্যার খাতিরে বলতে চাই যে, মেজাজি কাবাটি পশ্চিম দিকে এবং মেজাজি বায়তুল মোকাদ্দাসটি পূর্ব দিকে হবার কারণেই কি বলা হলো? আমরা ভালো করেই জানি যে হাকিকি কাবার অবস্থানটি মানুষের বাঁ দিকে তথা উত্তর দিকে অবস্থান করে বা করছে। এই কথাগুলোর ব্যাখ্যা লিখতে গিয়ে বড়ই বাটবামেলার গোলক-ধাধায় পড়ে যেতে হয়; তবে মেজাজি কাবা পশ্চিম দিকে হওয়াতেই বলা হয়েছে যে, পূর্ব-পশ্চিমে মুখ ফেরালেই পুণ্য হয় না। তা হলে কী কী কাজ করলে পুণ্য অর্জন করা যায়? আর

সেই পুণ্য বলতেই বা কী বুঝায়? পুণ্যটিরও কি ম্বেজাজি এবং হাকিকি অর্থ আছে?

কোরান বলছে, যে-মানুষটি আল্লাহতে ইম্মান এনেছে তথা আল্লাহকে বিশ্বাস করেছে এবং পরকালের দিনের প্রতি যে বিশ্বাস করেছে— এখানে পরকাল বলতেই বা কী বুঝানো হয়েছে? মৃত্যু-ঘটনার পর নফসের যে জীবনটি শুরু হয় উহাকেই পরকাল বলে জানি। এবং ফেরেশতাদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে বলা হয়েছে। আমরা জানি, ফেরেশতাদের নফসও নাই, রুহও নাই, বরং ফেরেশতারা আল্লাহর সেফাতি নুরের তৈরি। তারপর কেতাব ও নবিগণের প্রতি ইম্মান আনতে বলা হয়েছে। এখানেই শর্তটিকে শেষ করে না দিয়ে আরও বলা হয়েছে যে, আল্লাহর ভালোবাসায় আত্মীয়-পরিজন এবং এতিম এবং মিসকিন এবং মুসাফির এবং যারা সাহায্য চায় তাদেরকে এবং দাসমুক্তির জন্য সম্পদ দান করে। তা হলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, আত্মীয়, এতিম, মিসকিন, মুসাফির, সাহায্যপ্রার্থী এবং দাসমুক্তির কাজগুলো যারা করেন তাবাই আল্লাহকে ভালোবাসেন। প্রথম পাচটি বিষয়ের উপর ইম্মান আনার কথাটি বলা হয়েছে, কিন্তু পরের ছয়টি বিষয় আল্লাহর ভালোবাসা পাবার জন্য করতে বলা হয়েছে। অধম লিখকের মনে হয়, প্রতিটি বিষয়ের সঙ্গেই ম্বেজাজি এবং হাকিকি দুইটি রূপকে জড়িয়ে একত্র করে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এরপরেই কোরান-এ বলা হয়েছে সালাত কায়েম করতে এবং জাকাত আদায় করতে। এবং আরও বলা হয়েছে যে, যদি ওয়াদা করে থাকে তা হলে সেই ওয়াদাটিও পূরণ করতে। এখানেও বিষয়টি শেষ করা হয় নি, বরং বলা হয়েছে, দুঃখ-কষ্টে, রোগ-শোকে এবং যুদ্ধ-বিগ্রহের সময়ে ধৈর্যধারণ করে মোকাবেলা করতে। এই এতগুলো কাজ তথা নির্দেশ যাহা আল্লাহ

কর্তৃক দেওয়া হয়েছে, উহা পালন করলেই দু'টি খেতাবে আল্লাহ ভূষিত করেন : প্রথম খেতাবটির নাম হলো সত্যবাদী তথা সাদেক এবং দ্বিতীয়টি হলো খোদাভীরু তথা মুঠাকিন। আয়াতের শেষ শব্দটি হলো মুঠাকিন। এই এতগুলো গুণের অধিকারী যে বা যারা তারাই মুঠাকিন এবং আল্লাহ মুঠাকিনের সঙ্গে আছেন বা থাকেন এই কথাটিও কোরান-এ আমরা দেখতে পাই। আল্লাহর দেওয়া এইসব কঠিন শর্তগুলো তখনই মান্য করা হয়, যখন প্রতিটি নফসের সঙ্গে যে শয়তানকে খান্নাসরূপে পরীক্ষা করার জন্য আল্লাহ কর্তৃক ইচ্ছাকৃতভাবে দেওয়া হয়েছে উহা হতে মুক্তিলাভ করা হয়।

এই এতগুলো কাজের নির্দেশ কোনো মানুষের পক্ষেই আন্তরিকভাবে করা মোটেই সম্ভবপর নয়, যে পর্যন্ত আপন নফস হতে খান্নাসটিকে তাড়িয়ে দেওয়া না হয়। গবেষণার দৃষ্টিভঙ্গিতে বলছি যে, আল্লাহর বিশেষ কতগুলো বিষয় আছে যার আদেশ-নিষেধগুলো বার বার বিভিন্ন সুরার আয়াতে দেখতে পাই।

আমরা এ-ও জানি যে, আল্লাহর প্রতিটি আদেশ-নিষেধ, প্রতিটি এবাদত-বন্দেগির ভাগ করা বিষয়গুলোতে মাত্র একটি আদেশ, একটি নির্দেশ, একটি আস্থান, একটি আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে আর সেটাই হলো নিজের নফসের সঙ্গে যে খান্নাসরূপী শয়তানটিকে কেবলমাত্র পরীক্ষা করার জন্য দেওয়া হয়েছে উহাকে তাড়িয়ে দেয়া, বিতাড়িত করা। এই

নফসের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা খান্নাসটিকে তাড়িয়ে দেবার জন্য বার বার আল্লাহ বলছেন : সালাত কায়েম করো, জাকাত দাও, রোজা রাখো, হুজতর করতে শেখো, হজ্জ করো, কোরবানি দাও ইত্যাদি। সব কথাগুলো যেন যত সঙ্গীত আছে সব যেমন সাতপাকে বাঁধা, তথা সা- রে- গা- মা- পা- ধা- নি- সা-র মধ্যে বেঁধে রাখা হয়েছে, সে রকম আল্লাহর সব আদেশ-নিষেধের শেষ কথাটি হলো নিজের নফসকে খান্নাসমুক্ত করা।

এই খান্নাসের আবার চারটি রূপ আছে। এই খান্নাসই চারটি ভিন্ন ভিন্ন রূপ-রঙ ধারণ করে দুনিয়ার জীবনটিকে লোভনীয়-শোভনীয় করে তুলছে। কত রকম যুক্তিতর্ক, কত রকম দার্শনিকদের দর্শন, কত রকম আইনের প্যাচ খেলা খেলছে একটি মাত্র খান্নাস চারটি রূপধারণ করে। অনেকটা বলা যায় যে, খান্নাসের এক অঙ্গে চারটি ভিন্ন ভিন্ন রূপের প্রত্যারণার ফাঁদ। এই প্রত্যারণার ফাঁদগুলো এতই শক্ত, এতই মজবুত, এতই যুক্তিসঙ্গত মনে হয় যে আর কোনো চিন্তাভাবনা, ধ্যান-ধারণা করার অবকাশ নাই। এই খান্নাসের বিরুদ্ধে নফসের অবস্থানটিকেই বলা হয় জেহাদ। এই জেহাদ মোটেও যুদ্ধ নয়, এই জেহাদ মানুষের বানানো অস্ত্রের জেহাদ নয়, ইহা ধ্যানসাধনার জেহাদ, ইহা রেয়াজতের জেহাদ, ইহা মোরাকাবা-মোশাহেদার জেহাদ। এই জেহাদে যারা শহিদ হয়ে যান তাঁদের আর মরণ নাই। এই জেহাদে যারা শহিদ হয়ে যান তাঁদেরকে মারা গেছেন বলে চিন্তা করতেও বারণ করা হয়েছে কোরান-এ। এই জেহাদে যারা শহিদ তাঁদের মৃত বলে যেমন বারণ করা হয়েছে, তেমনি মৃত বলে চিন্তা করতেও বারণ করা হয়েছে। এই জেহাদে যারা শহিদ হতে পারেন তাঁরাই আল্লাহর ওলি। এই জেহাদে যারা শহিদ হয়েছেন আল্লাহ তাঁদেরকে গোপনে রেজেক দিয়ে বাঁচিয়ে রাখেন (বাল এনদা রাবিহিম এয়ার জাকুন)।

মৃত কোনো রেজেকই গ্রহণ করতে পারে না, তাই মরা মানুষ কোনোদিন আল্লাহর রেজেক গ্রহণ করে নিতে পারে না, তাই যারা খান্নাসমুহ নফসের জন্য যুদ্ধ করে যায় তাঁরা শহিদ, তাঁরা কখনই মৃত নন। তাই কোরান-এ এই জাতীয় জেহাদের সঙ্গে একটি কঠিন শর্ত জুড়ে দিয়েছেন, আর সেই শর্তটির নাম হলো 'ফি সাবিলিল্লাহ'— একমাত্র আল্লাহর জন্য অথবা একমাত্র আল্লাহর মধ্যে।

দুনিয়ার জীবনে মানুষের মন ও মগজে কেবল বিষ্ঠ-বৈভবের চিত্রাটি প্রাধান্য পায়। নফস সুখের উপরে সুখ দেখতে চায়। অনেক সুখ পেয়েছে, তারপর আরও সুখ। আরও সুখ পাবার পরেও কোথা হতে যেন নূতন ভাইরাস আগমনের মতো নূতন নূতন সুখের স্বপ্ন দেখাতেই থাকে। কোনো নফস, কোনো প্রাণ, কোনো জীবন, কোনো মানুষ ভাবতেই চায় না যে এই দুনিয়ার সব সুখভোগ, মোহ, মায়া সব কিছু ফেলে দিয়ে একদিন মৃত্যু নামক ঘটনার মুখোমুখি হয়ে আল্লাহর রহস্যজগতে প্রবেশ করতেই হবে। আল্লাহর এই রহস্যজগতে সবারই প্রবেশ করতেই হবে— এ প্রবেশটি ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক। সুতরাং বৈষয়িক সুখভোগ, বৈষয়িক সাফল্য অর্জনের প্রতিযোগিতা, মারামারি, খুনাখুনি সব কিছু এই খান্নাসই নফসের সাথে থেকে অনেক রকম ভাইরাস আর ব্যাক্টেরিয়া জন্ম দিয়ে করিয়ে থাকে।

সুতরাং আল্লাহর প্রতিটি আদেশ-নিষেধের মধ্যে দুইটি রূপ দেখতে পাই : একটি বাহিরের রূপ যাকে মেজাজি বলা হয়, আর একটি ভেতরের রূপ, যাকে হাকিকি বলা হয়। আল্লাহর এই মেজাজি রূপটি অনেকেই

কমবেশি পালন করতে পারে, কিন্তু হাকিকি রূপের মাঝে অবগাহন করার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা নিয়ে যারা মোরাকাবা- মোশাহেদার জেহাদে অবিরাম যুদ্ধ করে চলছেন তথা সাধনা করে চলছেন তাঁরাই মুঠাকি। আর এই মুঠাকিদের সঙ্গেই আল্লাহ আছেন বা থাকেন বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

কোরান-এ সালাতের উল্লেখ : ৯

কোরান-এর ২ নম্বর সূরা বাকারার ২৩৮ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে : সালাতের জন্য যত্নবান হও, সালাতুল উসতা (মধ্যবর্তী সালাত) বিষয়ে এবং আল্লাহর জন্য দাঁড়াও অনুগত (বিনীত) ভাবে। (হাফেজু আলাস্ সালাওয়াতে ওয়াস্ সালাতীল উসতা, ওয়াকুন্নু লিল্লাহে কান্নেতীনা)।’

কোরান-এ সালাতের উল্লেখ : ১০

কোরান-এর ২ নম্বর সূরা বাকারার ২৩৯ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে : সুতরাং যদি তোমরা পদচারী অথবা আরোহী অবস্থায় (সালাত আদায় বিষয়ে) ভয় কর। (ফাইন খেফতুন্ ফারেজালান আওরুকাবানান)। সুতরাং তোমরা নিজেদেরকে যখন নিরাপদ মনে করিবে তখন আল্লাহ তোমাদেরকে যেভাবে শিক্ষা দিয়াছেন সেইভাবেই স্বরণ করিবে। (ফাইজা আম্মেনতুন্ ফাজকুরুল্লাহা কাম্মা আল্লামাকুম)। যাহা তোমরা জানিতে না। (মা লাম্ন তাকুনু তা আলামুন)।

কোরান-এ সালাতের উল্লেখ : ১১

কোরান-এর ৩ নম্বর সূরা আলে-ইমরানের ৩৯ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে : সুতরাং যখন তিনি (জাকারিয়া) মেহরাবের (কক্ষের) মধ্যে সালাতে দণ্ডায়মান ছিলেন, তখন ফেরেশতাগণ তাকে ডাকিয়া বলিলেন (ফানাদাত্‌হল মালাইকাতু ওয়াহয়া কায়েমুন ইউসাললী ফীল মেহেরাবে) নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাকে ইয়াহিয়ার সুসংবাদ দিতেছেন (যিনি হইবেন) আল্লাহর কালামের সত্যানয়নকারী এবং নেতা এবং জিতেন্দ্রিয়। (আন্নাল্লাহা ইউবাহশ্শেরুকা বেইয়াহইয়া মুসাদ্দেকান বেকালেমাতীন মিনাল্লাহে ওয়া সাইয়ে্যদান ওয়া হাসুরান)। এবং সালেহীনদের (সৎকর্মশীলদের) মধ্য হইতে নবি। (ওয়া নাবীয়্যান মিনাস্ সালেহীনা)।’

কোরান-এ সালাতের উল্লেখ : ১২

কোরান-এর ৩ নম্বর সূরা আলে-ইমরানের ৪৩ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে : হে মরিয়ম, তোমার রবের জন্য অবনত হও এবং সেজ্জদা কর এবং রুকুকারীদের সহিত রুকু কর। (ইয়ামারিয়ামুক নুতী লীরাব্বেকে ওয়াসজ্জুদী ওয়ারকাঈ মাআর্ রাকেঈনা)।’

কোরান-এ সালাতের উল্লেখ : ১৩

কোরান-এর ৪ নম্বর সূরা নেসার ৪৩ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে : হে তোমরা যাহারা ইমান আনিয়াছ। যখন তোমরা মোহগ্নস্ত থাক তখন সালাতের নিকটবর্তী হইও না এমনভাবে যাহা যে তোমরা যাহা বল তাহা বুঝিতে

পার। (ইয়া আইয়্যুহাল লাজিনা আমানু লা তাকরাবুস্ সালাতা ওয়া আনতুম সুকারা হাত্তা তা আলামু মা তাকুলুনা)। এবং তোমরা সফররত অবস্থা ব্যতীত অপবিত্র অবস্থায় ও পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত। (ওয়ালা জুনুবান ইল্লা আবেরিন সাবিলিন হাত্তা তাগ্তাসেলু)। এবং যদি তোমরা রোগগ্রস্ত হও অথবা সফররত অবস্থায় থাক অথবা কেহ নারী স্পর্শ (গমন) করিয়া থাকে (ওয়া ইনকুনতুম মারদা আও আলা সাফারীন আও জা-আ আইদুন মিনকুম মিনালগায়েতে আও লামাসতমুন নেসাতা) সুতরাং যদি পানি না পাওয়া যায়। সুতরাং তোমরা পবিত্র মাটি দিয়া তাইয়ামমুম্ম করিবে। (ফালামু তাজেদু মা-আন্ ফাতাইয়ামমামু সায়ীদান তাইয়েবান) সুতরাং তোমরা তোমাদের মুখমণ্ডলকে এবং হাতগুলোকে মাসেহ করিবে। (ফামসাহ বেউজুহেকুম ওয়া আইদীকুম)। নিশ্চয়ই আল্লাহ পাপমোচনকারী (এবং) অত্যন্ত ক্ষমাশীল (ইন্নালাহা কানা আফুওয়ান গাফুরান)।

কোরান-এ সালাতের উল্লেখ : ১৪

কোরান-এর ৪ নম্বর সূরা নেসার ৭৭ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে : তুমি কি তাহাদিগকে দেখে নাই যাহাদেরকে বলা হইয়াছিল, তোমাদের হাতকে সংযত কর এবং সালাত কায়েম কর এবং জাকাত আদায় কর। (আলামুতারা ইলাল্লাজিনা কিলালাহম কুফফু আইদিয়াকুম ওয়া আকিমুস সালাতা ওয়া আতজ্জ জাকাতা)। সুতরাং যখন তাহাদের উপর লড়াইকে লিখিয়া দেওয়া হইল তখন তাহাদের মধ্য হইতে একটি দল মানুষকে এমনভাবে ভয় করিতেছিল যেমনই আল্লাহকে ভয় করে অথবা তাহার চাইতেও অধিক ভয়। (ফালামুমা কুতীবা আলাইহীমুল কিতালু ইজা ফারীকুম মিনহুম ইয়াখশাওননি নাসা কাখাশিয়াতীল্লাহে আও আশাদ্দা খাশইয়াতান)। এবং

তাহারা বলিতেছিল, হে আমাদের রব! তুমি কেন আমাদের উপর লড়াই করাকে লিখিয়া দিলে? (ওলা কাল রাব্বানা লেমা কাতাবতা আলাইনাল কেতালি)। কেন তুমি আমাদেরকে আরও কিছুকাল (সময়) অবকাশ (সুযোগ) দিলে না? (লাওলা আখখারতানা ইলা আজালীন কারীবিন)। বল, দুনিয়ার ভোগ অল্পই এবং আখেরাত মুস্তাকিনদের জন্য কতই না উত্তম! (কুল মাতাউদুদুনিয়া কালীলুন, ওয়াল আখেরাতু খাইরুন লেমানিত্তাকা) এবং তোমাদের উপর সীমান্যতমও জুলুম করা হইবে না (ওয়ালা তুজ্লামুনা ফাতীলান)।’

কোরান-এ সালাতের উল্লেখ : ১৫

কোরান-এর ৪ নম্বর সূরা নেসার ১০১ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে : এবং যখন তোমরা পৃথিবীর (জগতের) মধ্যে ভ্রমণ করিবে সুতরাং তোমাদের উপর সালাত সংক্ষিপ্ত করাতে কোন গোনাহ হইবে না। (ওয়া ইজা দারাবতুম ফীল আর্দে ফালাইসা আলাইকুম জুনাহন আন তাক্সুরু মিনাস সালাতে)। যদি তোমরা কাফেরগণ কর্তৃক ফেৎনার আশংকা (ভয়) কর। (ইন খেফতুম আন ইয়াফতেনাকুমল্ লাজীনা কাফারু)। নিশ্চয়ই কাফেরগণ হয় তোমাদের জন্য প্রকাশ্য শত্রু। (ইন্নালা কাফেরীনা কানু লাকুম আদুভ্ভ্যাম মুবিনান)।

কোরান-এ সালাতের উল্লেখ : ১৬

কোরান-এর ৪ নম্বর সূরা নেসার ১০২ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে : এবং যখন তাহাদের (ইমানদারদের) মধ্যে অবস্থান করিবে এবং তাহাদের জন্য সালাত কায়েম করিবে (ওয়া ইজা কুন্তা ফীহিম ফাআকামতা

লাহমুস সালাতা)। সুতরাং তাহাদের মধ্য হইতে একটি দল যেন তোমাদের সাথে সশস্ত্র অবস্থায় দাঁড়ায়। (ফাল্‌তাকুম তায়েফাতুন মিন্‌হম্‌ মাআকা ওয়াল ইয়াখুজু আস্লে হাতাহম)। সুতরাং যখন তাহারা সেজদা শেষ করিবে সুতরাং তাহারা যেন তোমাদের পেছনে অবস্থান করে। (ফাইজা সাজাদু ফাল্‌ইয়াকুনু মিন্‌ ওয়ারায়েকুম)। এবং অপর দলটি, যাহারা সালাতে অংশগ্রহণ করে নাই তাহারা যেন তোমার সাথে সশস্ত্র এবং সতর্ক অবস্থায় সালাতে অংশগ্রহণ করে। (ওয়াল তাতে তায়েফাতুন উখরা লাম ইউসাল্লু মাআকা ওয়াল ইয়াখুজু হেজরাহম্‌ ওয়া আসলে হাতাহম)। এবং কাফেরগণ ইহা কামনা করে যে, তোমরা যেন তোমাদের অস্ত্রশস্ত্র এবং ধনসম্পদ বিষয়ে অসতর্ক হও, যাহাতে তাহারা তোমাদের উপর একযোগে আক্রমণ করিতে পারে। (ওয়াদ্দাললাজীনা কাফারু লাও তাগফুলুনা আন্‌ আস্লেহাতেকুম ওয়া আম্‌তেআতেকুম ফাইয়ামিলুনা আলাইকুম্‌ মাইলাতান ওয়াহেদাতান) এবং যদি তোমরা প্রাকৃতিক (বৃষ্টির) কারণে অথবা অসুস্থতার কারণে কষ্ট পাও, তোমাদের অস্ত্রশস্ত্রগুলো রাখিয়া দাও তাহা হইলে তোমাদের কোনো গোনাহ হইবে না। (ওয়াল জুনাহা আলাইকুম্‌ ইন্‌কানা বেকুম আজান মিন্‌মাতারীন আওকুন্তুম্‌ মারদা আন্তাদু আসলে হাতাকুম)। এবং নিশ্চয়ই তোমরা (শত্রু বিষয়ে)

সতর্কতা অবলম্বন করিবে (ওয়াখুজু হেজরাকুম)। নিশ্চয়ই আল্লাহ কাফেরদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক আজাব প্রস্তুত রাখিয়াছেন। (ইন্নালাহা আ-আদদা লীল কাফেরীনা আজাবান মোহিনান)।

কোরান-এ সালাতের উল্লেখ : ১৭

কোরান-এর ৪ নম্বর সূরা নেসার ১০৩ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে : সুতরাং যখন তোমরা আল্লাহকে গুইয়া, বসিয়া এবং দাঁড়াইয়া জিকির করিবে। (ফাইজা কাদাহতুমুস সালাতা ফাজকরুল্লাহা কেয়ামান ওয়া কউদান ওয়া আলা জুবুবুম)। সুতরাং যখন তোমরা (যুদ্ধবিগ্রহ হইতে) নিরাপদ থাকিবে তখন তোমরা সলীত কায়েম করিবে। (ফাইজাত মানানতুম ফাআকিমুসসালাতা)। নিশ্চয়ই নির্দিষ্ট সময়ে সলীত আদায় করা মোমিনদের উপর কর্তব্য। (ইন্না স সালাতা কানাত আলাল মোমিনীনা কেতাবান মাওকুতান)।

কোরান-এ সালাতের উল্লেখ : ১৮

কোরান-এর ৪ নম্বর সূরা নেসার ১৪২ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে : নিশ্চয়ই মোনাফেকেরা আল্লাহকে ধোঁকা দিতে চাহে অথচ তিনিই তাহাদেরকে এই ধোঁকাবাজির (শাস্তি) দিবেন। (ইন্না ল মোনাফেকীনা ইউখাদেউনাল্লাহা ওয়াহয়া খাদেউহম)। এবং যখন তাহারা সালাতের জন্য দাঁড়ায় অলস ভরে লোকদের দেখানোর জন্যই। (ওয়া ইজা কামু ইলাস সালাতে কামু কুসালা ইউরাউনান্নাসা) এবং তাহারা অল্প সংখ্যকই

আল্লাহর জিকির করে। (ওয়াল্লা ইয়াজ্জ কুরুনাল্লাহা ইল্লা কালীলান)।

কোরান-এ সালাতের উল্লেখ : ১৯

কোরান-এর ৪ নম্বর সূরা নেসার ১৬২ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে : কিন্তু তাহাদের মধ্য হইতে যাহারা জ্ঞানে পারদর্শী তাহারা এবং যাহারা ইম্মানদার এবং যাহারা তোমার প্রতি যাহা নাজেল করা হইয়াছে এবং তোমার পূর্ব হইতে যাহা নাজেল করা হইয়াছে সবগুলোর প্রতি ইম্মান আনে। (লাকিনীর রাসেখুনা ফীল এলম্মে মিন্হুম ওয়াল মোম্মেনুনা ইউম্মেনুনা বিম্মা উন্জীলা ইলাইকা ওয়াম্মা উন্জীলা মিন কাবলেকা) এবং যাহারা সালাত কায়েম করে এবং জাকাত আদায় করে এবং ইয়াওমুল আখেরের (শেষ বিচার দিনের) প্রতি এবং আল্লাহর প্রতি ইম্মান আনয়ন করে। (ওয়াল মুকিমিনাস্ সালাতা ওয়াল মুতুনাজ্জ জাকাতা ওয়াল মুম্মেনুনা বিল্লাহে ওয়াল ইয়াওমিল আখেরে)। উহাদের জন্য আমরা অচিরেই সর্বোচ্চ বিনিময় প্রদান করিব। (উলাইকা সানুতীহিম আজরান আজীমান্)।

কোরান-এ সালাতের উল্লেখ : ২০

কোরান-এর ৫ নম্বর সূরা মায়েদার ৬ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে : হে তোমরা যাহারা ইম্মান আনিয়াছ! তোমরা যখন সালাত কায়েম করিতে উঠিয়া দাঁড়াইবে

সুতরাং যখন তোমরা তোমাদের মুখমণ্ডল এবং হাতসমূহকে কনুইসহ ধোঁত করিবে। (ইয়া আইয়ুহাল লাজীনা আমানু ইজা কুমতুম ইলাস্ সালাতে ফাগ্‌সেলু উজ্জুহাকুম ওয়া আইদিয়াকুম ইলাল মারাকে) এবং তোমাদের মাথাকে মাসেহ করো এবং টাখনুসহ পাণ্ডলোকেও। (ওয়ামসাহ বেরুউসেকুম ইয়া আরজুলাকুম ইলাল কাবাইনে)। এবং যদি তোমরা অপবিত্র হও, তাহা হইলে পবিত্র হইয়া নাও। (ওয়া ইনকুনতুম জুবান ফাত্তাহ্‌হা)। এবং যদি তোমরা অসুস্থ হও অথবা সফরে থাক অথবা তোমাদের মধ্য হইতে কেউ যদি পায়খানা-প্রস্রাবের স্থান হইতে আসে অথবা নারীকে স্পর্শ (মিলন) করে অতঃপর পানি না পাইবে (ওয়া ইন কুনতুম মারদা আও আলা সাফারিন আও জাআ আহাদুন মিনকুম মিনাল গায়েতে আও লামাস্তুমুন নেসাআ ফালাম তাজেদু মাআন) সুতরাং তোমরা তাইয়াম্মুম কর পবিত্র মাটি দ্বারা, অতঃপর তোমরা মাসেহ কর তোমাদের মুখমণ্ডলকে এবং হাতসমূহকে উহা দ্বারা। (ফাতাইয়াম্মামু সাযিদান তাইয়েবান ফামসাহ বেউজ্জুহেকুম ওয়া আইদিকুম মিন্‌হ)। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তোমাদের উপর কষ্ট নির্বাচন (চাপাইয়া দিতে) করিতে ইচ্ছা করেন না। (মা ইউরীদুল্লাহ লেইয়াজ্ আলা আলাইকুম মিন্‌ হারাজীন) বরং তিনি তোমাদেরকে পবিত্র করিতে ইচ্ছা

করেন এবং তোমাদের উপর তাহার নিয়ামতকে পরিপূর্ণ করিতে চাহেন। সম্ভবত তোমরা শোকর-গুজার হইতে পার। (ওয়ালাকীন ইউরীদু লেইউ তাহেরাকুম ওয়া লেইউতেম্মা নেয়েমাতাহ আলাইকুম লা আললা কুম তাশ্‌কুরনা)।

কোরান-এ সালাতের উল্লেখ : ২১

কোরান-এর ৫ নম্বর সূরা মায়েদার ১২ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে : এবং আল্লাহ বলিলেন যে, নিশ্চয়ই আমি তোমাদের সার্থেই আছি (ওয়া কালাল্লাহ ইন্নি মাআকুম)। যদি তোমরা সালাত কায়েম কর এবং জাকাত আদায় কর এবং আমার রসুলগণের প্রতি ইমান আন এবং তাহাদের সম্মান কর এবং আল্লাহকে কর্জে হাসানা (উত্তম খণ) প্রদান কর। (লা ইন্ আকামতুমস সালাতা ওয়া আতাইতুমুজ জাকাতা ওয়া আমনিতুম বেরুসুলী ওয়া আজ্জারতুমুইম ওয়া আকরাদতুমুল্লাহ কারদান হাসানান)। তাহা হইলে আমি তোমাদের পাপসমূহ মিটাইয়া দিব এবং অবশ্যই আমরা তোমাদেরকে জাহান্নামে দাখিল (প্রবেশ) করাইব। (লা উকাফ্‌ফেরান্না আনকুম সাইয়েআতেকুম ওয়ালা উদখেলান্নাকুম জাহান্নাতীন)।

কোরান-এ সালাতের উল্লেখ : ২২

কোরান-এর ৫ নম্বর সূরা মায়েদার ৫৫ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে : নিশ্চয়ই তোমাদের বন্ধু হইলেন আল্লাহ এবং তাহার রসুল এবং যাহারা ইমান আনয়ন করে, যাহারা সালাত কায়েম করে এবং জাকাত আদায় করে এবং তাহারাই হইল রুকুকারী। (ইন্নামা ওয়ালী ইয়্যুকুমুল্লাহ ওয়া রাসুলুহ ওয়াল্লাজীনা

আমানুল্লাজীনা ইউকিমুনাম্ সালাতা ওয়া
ইউতুনাজ্জাকাতা ওয়া হম্ রাকেউনা)।

কোরান-এ সালাতের উল্লেখ : ২৩

কোরান-এর ৫ নম্বর সূরা মায়েরদার ৫৮ নম্বর
আয়াতে বলা হয়েছে : এবং যখন তোমরা সালাতের
জন্য আহ্বান কর তখন তাহারা উহাকে ঠাট্টা ও খেল-
তামাশা মনে করে। (ওয়া ইজা নাদাইতুম ইলাসসালাতে
ইততাখাজুহা হজুওয়্যান ওয়া লায়েবান)। উহা এই জন্য
যে, নিশ্চয়ই তাহারা হইল নির্বোধ কাওম (জাতি)।
(জালীকা বেআন্নাহম কাওমুন লাইয়াকেলুনা)।

কোরান-এ সালাতের উল্লেখ : ২৪

কোরান-এর ৫ নম্বর সূরা মায়েরদার ৯১ নম্বর
আয়াতে বলা হয়েছে : নিশ্চয়ই শয়তান তোমাদের
পরস্পরের মধ্যে মদ এবং জুয়ার মাধ্যমে শত্রুতা এবং
হিংসা-বিদ্বেষ ছড়াইতে ইচ্ছা করে। (ইন্নাম্মা ইউরীদুশ্
শায়তানু আনুইউকেআ বাইনাকুমুল আদাওয়াতা ওয়াল
বাগ্দাআ ফীল খাম্মরে ওয়াল মাইসীরে)। এবং আল্লাহর
জিকির এবং সালাত (যোগাযোগ) হইতে তোমাদেরকে
বিরত রাখিতে চাহে। (ওয়া ইয়াসুদ্দাকুম আন
জিকরীল্লাহে ওয়া আনিসসালাতে)। সুতরাং তবুও কি
তোমরা নিবৃত্ত হইবে না? (ফাহাল আনতুম মুনতাহনা)।

কোরান-এ সালাতের উল্লেখ : ২৫

কোরান-এর ৫ নম্বর সূরা মায়েদার ১০৬ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে : হে তোমরা যারা ইমান আনয়ন করিয়াছ! যখন তোমাদের কাহারও মৃত্যুর সময় উপস্থিত হয় তখন তোমাদের মধ্য হইতে দুইজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিকে অসিয়তের সময় সাক্ষী করিয়া লইবে। (ইয়া আইয়্যুহাল্লাজীনা আম্মানু শাহাদাতু বাইনেকুম ইজা হাদারা মাওতু হীনাল ওয়াসীয়াতে ইস্নানে জাওয়া আদলীন্ মিনকুম) অথবা তোমাদের সফরে কাহারও যদি মৃত্যুর বিপদ সময় উপস্থিত হয়, তখনও দুইজনকে সাক্ষী করিয়া লইবে। (আও আখারানে মিন গাইরেকুম ইন আনতুম দারাবতুম ফীল আরদে ফাআসাভাতকুম মুসিবাতুল মাওতে)। যদি তাহাদের (সাক্ষীদের) সম্পর্কে সন্দেহ হয় তাহা হইলে সালাতের (যোগাযোগের) পর তাহাদের দুইজনকে আল্লাহর নামে শপথ করাইবে..... (তাহবেসূনা হম্মা মিন্বাআদীস সালাতে.....)।

কোরান-এ সালাতের উল্লেখ : ২৬

কোরান-এর ৬ নম্বর সূরা আনআম্মের ৭২ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে : এবং তোমরা সালাত কায়েম কর এবং তাঁহাকে (আল্লাহকে) ভয় কর এবং তিনিই তো সেই সত্তা যাহার দিকে তোমাদেরকে হাশর (একত্র) করা হইবে। (ওয়া আন আকিমুসসালাতা ওয়াত্তাকুহ ওয়া হওয়াল লাজী ইলাইহে তুহ শারুনা)।

কোরান-এ সালাতের উল্লেখ : ২৭

কোরান-এর ৬ নম্বর সূরা আনআম্মের ৯২ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে : এবং যাহারা আখেরাতের প্রতি ইম্মান আনয়ন করিয়াছে তাহারা ইহার (কিতাবের) প্রতিও ইম্মান রাখে এবং তাহারা তাহাদের সালাতকে সংরক্ষণ করে। (ওয়াল্ লাজিনা ইউম্মেনুনা বিল্ আখেরাতে ইউম্মেনুনা বিহী ওয়াহম্ম আলা সালাতেহীম ইউহাফেজুনা)।

কোরান-এ সালাতের উল্লেখ : ২৮

কোরান-এর ৬ নম্বর সূরা আনআম্মের ১৬২ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে : বল, নিশ্চয়ই আমার সালাত এবং আমার পুণ্যকর্ম এবং আমার জীবন এবং আমার মৃত্যু আল্লাহর জন্য যিনি রাব্বুল আলামিন। (কুল, ইন্না সালাতি ওয়া নুসুকী ওয়া মাহ্‌ইয়াইয়া ওয়া মামাতী লীল্লাহে রাব্বিল আলামীনা)।

কোরান-এ সালাতের উল্লেখ : ২৯

কোরান-এর ৭ নম্বর সূরা আরাকফের ২৯ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে : এবং তোমরা তোমাদের মুখমণ্ডলকে প্রত্যেক সেজদার স্থানে (মসজিদে) প্রতিষ্ঠিত কর, এবং তাহার জন্য দীনকে একনিষ্ঠ করিতে তাহাকে ডাক। (ওয়া আকীমু উজুহাকুম ইন্দা কুললে মাসজেদীন ওয়াদুউহ মুখলেসীনা লাহদদীনা)।

কোরান-এ সালাতের উল্লেখ : ৩০

কোরান-এর ৭ নম্বর সূরা আরাফের ৩১ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে : হে আদম সন্তানগণ! তোমরা প্রত্যেক সেজদার স্থানে সুন্দর পোশাক গ্রহণ কর। (ইয়া বানি আদাম্মা খুজু জীনাতা কুম ইন্দা কুললে মাসজেদীন)। এবং খাও এবং পান কর এবং তোমরা অপচয় করিও না। নিশ্চয়ই (আল্লাহ) অপচয়কারীদেরকে ভালোবাসেন না। (ওয়াকুলু ওয়াশরাবু ওয়ালা তুসরেফু, ইন্নাহ লাইউহেবুল মুসরেফীনা)।

কোরান-এ সালাতের উল্লেখ : ৩১

কোরান-এর ৭ নম্বর সূরা আরাফের ১৭০ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে : এবং যাহারা কিতাবকে সত্যভাবে ধারণ করিয়াছে এবং সালাত কায়েম করিয়াছে, নিশ্চয়ই আমরা নেক্কারদের বিনিময় নষ্ট করি না। (ওয়াল লাজীনা ইউম্মাসসেকুনা বিল কিতাবে ওয়া আকাম্মুসসালাতা ইন্না লানুদীউ আজরাল মুসলেহীনা)।

কোরান-এ সালাতের উল্লেখ : ৩২

কোরান-এর ৭ নম্বর সূরা আরাফের ২০৬ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে : নিশ্চয়ই যাহারা তোমার রবের নিকটে রহিয়াছে তাহারা তাঁহার (রবের) বান্দা হইবার বিষয়ে অহংকার করে না। এবং তাহারা তাঁহার তসবিহ পাঠ করে এবং তাঁহার সমীপে সেজদারত অবস্থায়

থাকে। (ইন্নালাজিনা ইন্দা রাব্বেকা লা ইয়াস তাক্বেরুনা আন্ ইবাদাতীহী ওয়া ইউসাব্বেহনাহ ওয়ালাহ ইয়াস্জুদুনা)।

কোরান-এ সালাতের উল্লেখ : ৩৩

কোরান-এর ৮ নম্বর সূরা আনফালের ৩ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে : যাহারা সালাত কায়েম করে এবং তাহাদেরকে যাহা আমরা রেজেক হিসাবে দান করিয়াছি তাহা হইতে ব্যয় করে। (আল্লাজিনা ইউকিম্বুনাস সালাতা ওয়া মিম্মা রাজাক্নাহম ইউনফেকুনা)।

কোরান-এ সালাতের উল্লেখ : ৩৪

কোরান-এর ৯ নম্বর সূরা তওবার ৫ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে : অতঃপর যদি তাহারা (মুশরিকরা) তওবা করে এবং সালাত কায়েম করে এবং জাকাত আদায় করে। সুতরাং তাহাদেরকে তাহাদের পথে চলিতে দাও। নিশ্চয়ই আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল (এবং) দয়ালু। (ফাইন্তাবু ওয়া আকাম্বুস সালাতা ওয়া আতুজ্জাকাতা ফাখাললু সাবিলাহম, ইন্নালাহা গাফুরুর রাহীমুন)।

কোরান-এ সালাতের উল্লেখ : ৩৫

কোরান-এর ৯ নম্বর সূরা তওবার ১১ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে : অতঃপর যদি তাহারা তওবা করে এবং সালাত কায়েম করে এবং জাকাত আদায় করে তাহা হইলে তাহারা তোমাদের দীনি ভাই। (ফাইন্তাবু ওয়া

আকামুস সালাতা ওয়া আতুজ্জাকাতা ফাইখুওয়ানুকুম ফীদীনে)।

কোরান-এ সালাতের উল্লেখ : ৩৬

কোরান-এর ৯ নম্বর সূরা তওবার ১৮ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে : আল্লাহর মিসজিদ তো সেই ব্যক্তিই নির্মাণ করিবে যে আল্লাহর উপর এবং ইয়াওমুল আখেরাতের উপর ইমান আনিবে এবং যে সালাত কায়েম করিবে এবং যে জাকাত আদায় করিবে এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাহাকেও ভয় করিবে না। (ইন্নাহ্মা ইয়ামুরু মাসাজ্জেদাল্লাহে মান্ আম্মানা বিল্লাহে ওয়াল ইয়াওমিল আখেরে ওয়া আকামুস সালাতা ওয়া আতুজ্জাকাতা ওয়া লাম ইয়াখশা ইল্লাল্লাহা)।

কোরান-এ সালাতের উল্লেখ : ৩৭

কোরান-এর ৯ নম্বর সূরা তওবার ৭১ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে : এবং মোমিন পুরুষ এবং মোমিন নারী তাহারা পরস্পর একে অন্যের বন্ধু (ওয়াল মোমেনুন ওয়াল মোমেনাতু বাআদুহম আউলীয়াউ বাদীন)। তাহারা সং কাজের নির্দেশ দেয় এবং অসং কাজ হইতে নিষেধ করে। এবং সালাত কায়েম করে এবং জাকাত আদায় করে এবং আল্লাহ ও রসুলের আনুগত্য করে। (ইয়ামুরুনা বিল মারুফে ওয়ান ইয়াহাওনা আনিল মুনকারে ওয়া ইউকীমুনাস সালাতা ওয়া ইউতুনাজ্জাকাতা ওয়া ইউতী উল্লাল্লাহা ওয়া রাসুলাহ)।

কোরান-এ সালাতের উল্লেখ : ৩৮

কোরান-এর ১১ নম্বর সূরা হুদের ১১৪ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে : এবং তুমি দিনের দুই প্রান্তে ও রাতের কিছু অংশের পর সালাত কায়েম করিও (ওয়া আকিমিসসালাতা তারাফীন্ নাহারে ওয়া

জুলাফান মিনাল্ লাইলে) নিশ্চয়ই নেক আমলসমূহ গোনাহসমূহকে মিটাইয়া দেয়।

উহা তো জিকিরকারীদের জন্য একটি জিকির। (ইন্নালা হাসানাতে ইউজ্জেবনাস্ সাইয়েয়াতে জালিকা জেক্‌রা লিজ্‌জাকেরীন)।

কোরান-এ সালাতের উল্লেখ : ৩৯

কোরান-এর ১৫ নম্বর সূরা হিজরের ৯৮ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে : সুতরাং তুমি তোমার রবের তসবিহ ও প্রশংসা পাঠ কর এবং সেজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হও। (ফাসাব্বেহ বেহাম্‌দে রাব্বিকা ওয়া কুন মিনাস সাজেদীনা)।

কোরান-এ সালাতের উল্লেখ : ৪০

কোরান-এর ১৭ নম্বর সূরা বনি ইসরাইলের ৭৮ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে : সালাত কায়েম কর সূর্য ঢলিয়া পড়ার কারণে রাতের অন্ধকারের দিকে এবং ফজরের কোরান! নিশ্চয়ই ফজরের কোরান হয় সাক্ষী স্বরূপ। (আকিমিস সালাতা লেদুলুকিশ্‌শামসে ইলা গাসাকিল লাইলে ওয়া কোরআনাল ফাজরে ইন্না কোরআনাল ফাজরে কানা মাহ্‌দান)।

কোরান-এ সালাতের উল্লেখ : ৪১

কোরান-এর ১৭ নম্বর সূরা বনি ইসরাইলের ৭৯ নম্বর আয়াতে বলা

হয়েছে : এবং রাতের অংশে তাহাজ্জুদ (সাধন প্রচেষ্টা) কর, ইহা তোমার জন্য অতিরিক্ত বিষয়। হয়তো তোমার রব তোমাকে প্রশংসিত স্থানে প্রতিষ্ঠিত করিবেন। (ওয়া মিনাল লাইলে ফাতাহাজ্জাদ্বিহী নাফেলাতাল্লাকা আসা আন ইয়াবাতাসাকা রাব্বুকা মাকামান্ মাহমুদান্)।

কোরান-এ সালাতের উল্লেখ : ৪২

কোরান-এর ১৭ নম্বর সূরা বনি ইসরাইলের ১১০ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে : বল, তোমরা আল্লাহকে ডাক অথবা রহমানকে ডাক, যে নামেই ডাক না কেন, সব সুন্দর নামই তো তাহার। (কুলিদ্ উল্লাহা আভেদু'র রাহমানা আইইয়ামান তাদু' ফালাহল আসমাউল হুস্না)। এবং তুমি তোমার সালাতকে প্রকাশ করিও না এবং গোপনও করিও না, বরং এই দুইয়ের মধ্যবর্তী পথ অবলম্বন করিও। (ওয়াল্লা তাহহার বেসালাতেকা ওয়াল্লা তুখাফেদবেহা ওয়াবতাগে বাইনা জালীকা সাবিলান্)।

কোরান-এ সালাতের উল্লেখ : ৪৩

কোরান-এর ১৯ নম্বর সূরা মরিয়মের ৩১ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে : এবং যেখানেই আমি থাকি না কেন, আমাকে বরকতময় করিয়াছেন। আমাকে আদেশ করিয়াছেন যতদিন বাচিয়া থাকি ততদিন সালাত ও জাকাত আদায় করিতে। (ওয়া জাআলানী মুবারাকান আইনা মা কুনতু ওয়া আওসানী বিসসালাতি ওয়াযাকাতী মাঈমতু হইয়্যাও)।

কোরান-এ সালাতের উল্লেখ : ৪৪

কোরান-এর ১৯ নম্বর সূরা মরিয়মের ৫৫ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে: তিনি (ইসা) তাঁর পরিবারকে নামাজ ও জাকাত আদায়ের আদেশ করিতেন আর স্বীয় রবের কাছে ছিলেন প্রিয়পাত্র। (ওয়া কানা ইয়ামুরু আহলাহু বিস্-সালাতি ওয়াযযাকাতি ওয়াকানা ইন্দা রাব্বিহী মারদ্বিয়া)।

কোরান-এ সালাতের উল্লেখ : ৪৫

কোরান-এর ২০ নম্বর সূরা তা-হার ১৪ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে : আমিই আল্লাহ, আমি ছাড়া কোন ইলাহ নাই। সুতরাং আমার এবাদত কর এবং সালাত কায়েম কর জিকিরের জন্য। (ইন্নানী আনাল্লাহু লাইলাহা ইল্লা আনা ফাবুদনী ওয়া আকিমিস্ সালাতা লিযিকরী)।

কোরান-এ সালাতের উল্লেখ : ৪৬

কোরান-এর ২০ নম্বর সূরা তা-হার ১৩০ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে : এবং রাতের মধ্যে এবং দিনের শেষ সন্মায় তসবিহ পড়ুন। (ওয়া মিন্ আনাযি লাইলি ফাসাব্বিহ ওয়া আতুরাফান নাহারি)।

ব্যাখ্যা

কোরান-এর প্রতিটি আরবি শব্দের যথাসাধ্য হুবহু অনুবাদ করতে গিয়ে অনেক কোরান তফসির এবং

অনেক আরবি লোগাত্ ও কোরান-এর লোগাতসমূহ বার বার ভালো করে একদম নিরপেক্ষ মন নিয়ে পড়ার জন্য একটু কষ্ট করতে হয় বৈকি! প্রতিটি শব্দের হবহ অনুবাদ করতে গিয়ে যদি বুঝতে না পারি তো সোজা বলে দেই যে এ আয়াতের অর্থটি আমাদের জ্ঞানা নাই। যার দরুন কোরআনুল মাজীদ নাম দিয়ে মাত্র ১৬ পারা হবহ অনুবাদ করে পুস্তক আকারে প্রকাশ করেছি এবং এই ১৬ পারার হবহ অনুবাদ করতে গিয়ে আমাদের অনেকবার এই কথাটি লিখতে হয়েছে যে, এই আয়াতের মর্মার্থটি অধম লিখকের জ্ঞানা নাই। হবহ এই জন্য রাখলাম যে আমার ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কেউ না কেউ এই আয়াতের মর্মার্থটি উদ্ধার করতে পারবে। সুসংবাদ এইটুকু যে এই ১৬ পারার অনুবাদের পুস্তকটি পাঠকদের কাছে প্রশংসাই পেয়েছে। এবং গ্রহণযোগ্যতার প্রশ্নে দিন দিনই পাঠকের সংখ্যা বেড়ে চলছে। পাঠক মনে করে যে সবাই যখন বুঝতে পেরেছে তখন এই অনুবাদক অকপটে অনেকবার স্বীকার করে নিয়েছে যে এই আয়াতের মর্মার্থটি আমার জ্ঞানা নাই। এই ‘জ্ঞানা নাই’ দুইটি শব্দ যে পাঠকের কাছে এতই প্রিয় হয়ে উঠবে তা অধম লিখকের জ্ঞানা ছিল না।

কোরান-এ সালাতের উল্লেখ : ৪৭

কোরান-এর ২০ নম্বর সূরা ত্বা-হার ১৩২ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে : এবং আদেশ করুন আপনার আহালদের (পরিবার পরিজন)-কে সালাতের সহিত

এবং অটল থাকুন উহার উপরে (ওয়া মুর আহলাকা বিস্ফালাতি ওয়সিতাবির আলাইহা)।

কোরান-এ সালাতের উল্লেখ : ৪৮

কোরান-এর ২১ নম্বর সূরা আশ্বিয়ার ৭৩ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে : এবং আমরা ওহি করিলাম তাহাদের উপরে খয়রাতের মধ্যে (দানের মধ্যে), নামাজ কায়েম করিতে এবং জাকাত আদায় করিতে এবং তাহারা আমাদের [এখানে একবচন তথা 'আমি' শব্দটি ব্যবহার করা হয় নি] ইবাদত করিত। (ওয়া আওহাইনা ইলাইহিম ফিলাল খাইরাতি ওয়া ইকামাস সালাতি ওয়া ইতায়ায্ যাকাতি ওয়া কানুলানা আবেদীন)।

কোরান-এ সালাতের উল্লেখ : ৪৯

কোরান-এর ২২ নম্বর সূরা হজের ২৬ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে : এবং পবিত্র রাখো আমার ঘরকে তওয়াফকারীদের জন্য এবং কেয়ামকারীদের এবং রুকু-সেজদাকারীদের। (ওয়া ত্বাহির বাইতিয়া লিভায়িফীনা ওয়াল কাযিমীনা ওয়ার রুক্বাইস সুজুদ)।

কোরান-এ সালাতের উল্লেখ : ৫০

কোরান-এর ২২ নম্বর সূরা হজের ৩৫ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে : এবং সালাত কায়েম করে এবং যে রেজেক আমরা দান করিয়াছি [আল্লাহ একবচন ব্যবহার করেন নি] তাহা হইতে ব্যয় করে। (ওয়াল মুকীমিস সালাতি ওয়া মিম্মা রাযাক্নাহম ইয়ুনফিকুন)।

কোরান-এ সালাতের উল্লেখ : ৫১

কোরান-এর ২২ নম্বর সূরা হজ্জের ৪১ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে : যাহাদেরকে আমরা জমিনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি, সালাত কায়েম করিতে এবং জাকাত প্রদান করিতে। (আল্-লাজিনা ইম্ম মাক্কানাহম ফিল আরদ্দি আকামুস্ সালাতা ওয়া আতুয্যাকাতা)।

ব্যাখ্যা

সালাত কায়েম তথা নামাজ্জ কায়েম করার প্রশ্নে কোরান-এ যে ৮২ বার উল্লেখ করা হয়েছে উহাই কোথাও অতি সংক্ষেপে একটি পূর্ণ আয়াতের কিছু অংশ কাটছাঁট করে দেখিয়েছি, আবার কোথাও পূর্ণ আয়াতটিকে অনুবাদ করেছি। পাঠক যাতে অবাক না হন তারই জন্য এই কথাগুলো বললাম। আমার প্রধান উদ্দেশ্যটি হলো নামাজ্জের কথাটি যে কোরান-এ ৮২ বার বলা হয়েছে উহাই অতি সংক্ষেপে তুলে ধরা।

কোরান-এ সালাতের উল্লেখ : ৫২

কোরান-এর ২২ নম্বর সূরা হজ্জের ৭৭ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে : হে আম্মানুগণ, তোমরা রুকু করো, সেজদা করো, এবং তোমাদের রবের এবাদত করো, এবং সৎকর্ম করো যাতে সফলকাম হইতে পারো। (ইয়া আইউহাল্লাযীনা আম্মানুরকাউ ওয়াস্জুদু ওয়াবুদু রাব্বাকুম ওয়াফ্ আলুল খাইরা লাআল্লাকুম তুফ্লিহন)।

কোরান-এ সালাতের উল্লেখ : ৫৩

কোরান-এর ২২ নম্বর সূরা হজ্জের ৭৮ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে : সুতরাং সালাত কায়েম করো এবং জাকাত দাও এবং আল্লাহকে শক্ত করে ধরো, তিনি তো তোমাদের মাওলা, তিনি কতোই উত্তম মাওলা এবং উত্তম সাহায্যকারী। (ফাআকীমুস্ সালাতা ওয়া আতুয্ যাকাতা ওয়া তাসিমু বিল্লাহি হওয়া মাওলাকুম ফানিমাল মাওলা ওয়া নিমান নাসির)।

কোরান-এ সালাতের উল্লেখ : ৫৪

কোরান-এর ২৩ নম্বর সূরা মুমিনূনের ১-২ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে : অবশ্যই মোমিনেরা সফল হইয়াছে, যাহারা তাহাদের সালাতের মধ্যে বিনয়ী। (ক্বাদ আফলাহাল মুমিনুন আল্লাখীনাহম ফী সালাতিহিম খাশিউন)।

ব্যাখ্যা

এই সূরাটিতে প্রথমেই মোমিন হবার তথা শর্ত মোমিনদের পরিচয়টি দেওয়া হয়েছে। সাবধান! ভুল করে যেন আম্মানুদেরকে মোমিনদের সাথে মিলিয়ে না ফেলেন। তা হলে ডাইলে-চাউলে খিচুড়ি হয়ে যাবে।

প্রথমেই মোমিন শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে, কারণ আল্লাহ মোমিনদের সঙ্গে আছেন অথবা থাকেন। সমগ্র কোরান-এ আল্লাহ যে চারজনের সঙ্গে থাকেন সেই চারজনের একজন হলেন মোমিন। সুতরাং মোমিনের দরজা মুক্তির দরজা। মোমিন জান্নাতুল ফেরদৌসে

অবস্থান করা অধিবাসী। মোমিনদের বিশেষ কয়টি চারিত্রিক গুণাবলি তুলে ধরা হয়েছে। যেমন : সালাত কায়েম্‌তে তাঁরা বিনয়ী। আজ্‌জবাজ্‌জ কথা তথা অসার ফ্রিয়াকলাপ হতে বিরত থাকেন। তাঁরা জাকাত আদায় করেন। তাঁরা নিজেদের যোনাঙ্গকে হেফাজত করেন, তবে নিজেদের স্বীদে এবং ডান হাতের অধিকারীদের সঙ্গে যৌনমিলন দোষণীয় বলে গণ্য হবে না। তাঁরা আম্মানত রক্ষা করেন এবং ওয়াদা করলে সেই ওয়াদা রক্ষার প্রাণপণ চেষ্টা করেন। এই গুণগুলো যাদের মধ্যে আছে তাঁরা নিঃসন্দেহে কোরান অনুসারে মোমিন। কোরান বলছে মোমিনেরা বিজয় লাভ করেছে। যুদ্ধ থাকলেই বিজয়ের প্রশ্ন আসে। এই যুদ্ধটি তরবারির যুদ্ধ নয়, বরং আপন নফস হতে খান্নাসরুপী শয়তানকে তাড়িয়ে দেবার যুদ্ধে জয়লাভ করা। মোমিনেরা যে নিজের ভেতরে লুকিয়ে থাকা খান্নাসরুপী শয়তানের হাতগুলো কেটে দেবার যুদ্ধ করেছেন এবং সেই যুদ্ধে বিজয় লাভ করেছেন, সেই যুদ্ধটিকেই বলা হয়েছে জেহাদে আকবর তথা সবচেয়ে বড় জেহাদ। সুতরাং মোমিনের প্রকৃত পরিচয়টি না জেনে যারা মোমিনের আগে ‘প্রকৃত’ শব্দটি লাগায় তাদের আরও একটু নিরপেক্ষ গবেষণা করার আহ্বান জানাচ্ছি। প্রকৃত মোমিন শব্দটি গুনতে অনেকটা সোনার পাথরের বাটি তথা আত্মবিরোধী তথা ডার্ক কনট্রাডিকশন মনে হয়।

পচা-বাসি-ভেজাল খাদ্য খেলে যেমন অসুস্থ হবার সম্ভাবনাটি থেকে যায়, সে রকম এই জাতীয় কাঁচা হাতের লিখনি মানুষকে বিব্রতের অবস্থায় ফেলে দেবার সম্ভাবনাটিকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

কোরান-এ সালাতের উল্লেখ : ৫৫

কোরান-এর ২৩ নম্বর সূরা মুমিনুনের ৯ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে : এবং যাহারা তাহাদের সালাতের উপরে হেফাজতকারী। (ওয়াল লাজিনা হম্ম আলা ছালাওয়া তিহিম ইউহাফিজুন)।

কোরান-এ সালাতের উল্লেখ : ৫৬

কোরান-এর ২৪ নম্বর সূরা আন-নূরের ৩৭ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে : (সেইসব) লোকেরা তাহাদের বিরত রাখে না ব্যবসা-বাণিজ্য এবং কেনা-বেচা আল্লাহর জিকির হইতে এবং সালাত কায়েম করা হইতে এবং জাকাত আদায় হইতে, তাহারা ভয় করে সেই দিনে যেদিন তাহাদের অন্তর ও চোখগুলি উল্টাইয়া যাইবে। [হবহ রাখার দরুন বাক্যটিকে ইচ্ছা করেই সাজালান্ন না।] (রিজালুন্ লাতুলহীহিম তিজারাতুঁও ওয়ালা বাইউন আন যিকরিল্লাহি ওয়া ইকামিস্ সালাতি ওয়া ইতায়িয্ যাকাতি ইয়াখাফুনা ইয়াওমান তাতাকাল্লাবু ফীহিল কুলুবু ওয়াল আবসার)।

ব্যাখ্যা

সেইদিনটি হলো যেদিন মারা যাবে। কী অপূর্ব ভাষায় চোখ উল্টে যাবে বলা হয়েছে। কারণ এইসব লোকেরা বেচা-কেনা এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের মতো নিতান্ত বৈষয়িক বিষয়ের মধ্যে অবস্থান করেও আল্লাহর জিকির হতে বিরত থাকতো না। কেবল আল্লাহর জিকিরই নয়, বরং সালাত কায়েম এবং জাকাত আদায়ের বিষয়গুলো সব সময় পালন করতো। বেচা-কেনা এবং ব্যবসা-বাণিজ্য যদিও দুইটি শব্দ, কিন্তু আসল উদ্দেশ্যটি হলো এক। বৈষয়িক বিষয়ের প্রসঙ্গে কেনা-বেচার সময়ে আল্লাহর জিকিরে মশগুল থাকা এবং সালাত আদায় করা এবং জাকাত আদায় করা—এই তিনটি বিষয় মোটেও সহজ কাজ নয়; তাই চোখ উল্টানো মরণকে এরা তো ভয় করেই না বরং মৃত্যুকে স্বাভাবিক ভেবেই আলিঙ্গন করে নেয়। এবং আল্লাহর দরবারে উচ্চ মর্যাদার সম্মানিত আসনে সম্মানিত হয়। [এই জিকির, এই সালাত, এই জাকাত দায়েমি তথা স্থায়ী। মহানবি বলেছেন, ‘আস সালাতুদ্ দাওয়ামি আফজালুম মিনাল সালাতিল ওয়াক্তি’ অর্থাৎ ‘ওয়াক্তিয়া নামাজ ইতে দায়েমি সালাত তথা সর্বকাল সালাতে থাকা অনেক মর্যাদাকর’]। এই দায়েমি সালাতের কথাটি কোরানুল হাকিম-এ সূরা মারেক্কের ২৩ নম্বর আয়াতেও বলে দেওয়া হয়েছে। ব্যবসা-বাণিজ্য এবং কেনা-বেচার সময়ে আল্লাহর জিকিরে থাকা কোনো মামুলি বিষয় নয়, ইহা কেবল উচ্চস্তরের আমানুগণের পক্ষেই সম্ভব।

কোরান-এ সালাতের উল্লেখ : ৫৭

কোরান-এর ২৪ নম্বর আন-নূরের ৫৬ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে : এবং সালাত কায়েম করো এবং জাকাত আদায় করো এবং রসূলের অনুসরণ করো যাহাতে তোমরা আল্লাহর রহমত পাইতে পারো। (ওয়া আকীমুস সালাতা ওয়া আতুয্ যাকাতা ওয়া আতীউর রাসূলা লা আল্লাকুম তুর হাম্বুন)।

ব্যাখ্যা

এখানে তিনটি বিষয় পালন করার কথাটি বলা হয়েছে : একটি সালাত কায়েম, অপরটি জাকাত আদায় এবং অপরটি রসুলের এত্তেবা করা তথা আনুগত্য গ্রহণ করা। সালাত আদায় করাটিও রসুলেরই আনুগত্য গ্রহণ করা, আবার জাকাত আদায় কথাটিও একই বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত। তা হলে আবার রসুলের আনুগত্য করার বিষয়টি বলতে এখানে কী বোঝানো হয়েছে? আল্লাহর দেওয়া বিধানগুলো আন্তরিকভাবে পালন করাতেই তো রসুলের আনুগত্য করা বুঝায়। একটু খেয়াল করুন, এখানে নবির আনুগত্য করার কথাটি বলা হয় নি। কেন এখানে ‘নবি’ শব্দটি ব্যবহার না করে ‘রসুল’ শব্দটি ব্যবহার করা হলো? ‘খাতামান নবি’ আমরা পাই, কিন্তু ‘খাতামার রসুল’ সমগ্র কোরান-এ একবারও বলা হয় নি। কেন বলা হয় নি? বলা হয় নি এ জন্য যে, রসুল শব্দটি সার্বজনীন। তাই মহানবি সার্বজনীন নামটিকেই গ্রহণ করে নিয়েছেন। আমরা কোরান-এ কয়েকটি সুরার কয়েকটি আয়াতে দেখতে পাই যে ফেরেশতারাও রসুল। কিন্তু ফেরেশতাদেরকে সমগ্র কোরান-এর একটি আয়াতেও নবিরূপে দেখতে পাই না। ফেরেশতা যত বড় শক্তিশালীই হোক না কেন, যত ক্ষমতাই তাকে দেওয়া হোক না কেন, কিন্তু ফেরেশতাদের নফসও দেওয়া হয় নি এবং রুহ তো

দেবার প্রশ্নই ওঠে না। যেহেতু আদমের ভেতর আল্লাহ রুহ ফুৎকার করে দিয়েছেন সেই হেতু নফস-ও রুহ-বিহীন ফেরেশতাদেরকে সেজ্জদা করতে তথা আনুগত্য গ্রহণ করতে আদেশ দেওয়া হয়েছে। কোরান-এ একবারও বলা হয় নি যে ‘নাহনু আকরাবু ইলাইহে মালাইকাতান, হাবলিল ওয়ারিদ,’ অর্থাৎ ফেরেশতাদের শাহারগের নিকটেই আল্লাহ আছেন, তা-ও আবার ‘আম্মি’-রূপে নয় তথা ‘আনা’-রূপে নয়, বরং ‘আম্মরা’-রূপে, বহুবচনে, ‘নাহনু’-রূপে। এরপরেও অনেক অনেক ভেদ-রহস্যের গুপ্তকথার ভাণ্ডারগুলো খুলে দেওয়া যায়, কিন্তু দিলাম না। ফেরেশতারা তো আল্লাহর সেফাতি

নুরের তৈরি (জাতনুরের নয়)। ফেরেশতাদের যেখানে নফসও দেওয়া হয় নি এবং রুহও দেওয়া হয় নি এবং নির্বাচন করার ক্ষমতাটি পর্যন্ত দেওয়া হয় নি তাই ফেরেশতাদের তো শাহারগই নাই। তাই আল্লাহর ‘জাত’-রূপে থাকার প্রশ্নটিও অবান্তর।

প্রত্যেকটি ইনসানে কাম্মেল তথা পীরে কাম্মেল তথা অতি উচ্চ স্তরের ওলিদের পায়রবি তথা যো-হকুমের দারোয়ানরূপে ফেরেশতাদের দণ্ডায়মান হবার কথাটি জানতে পারি। পীরানে পীর দস্তগীর মাহবুবে সোবহানি কুতুবে রব্বানি গাউসে সামদানি শেখ সৈয়দ মাওলানা মহিউদ্দিন আবদুল কাদের জিলানিকে আহলে সুন্নাতুল

জামাতের অনুসারীরা অত্যন্ত সম্মান প্রদর্শন করে এবং ওহাবি ফেরকার অনুসারীরা কাফেরে আকবর ও কাফেরে আউয়াল তথা সর্বশ্রেষ্ঠ কাফের (?) বলে (নাউজুবিল্লাহ) এবং শিয়া ফেরকার অনুসারীরা ‘ম্যাজিশিয়ান’ তথা যাদুগীর বলে থাকে (নাউজুবিল্লাহ)। সেই বড়পীর সাহেব তাঁর লিখিত কেতাবে বলেছেন যে, কারবালায় শহিদে আজম ইমাম হসাইনের রওজা মোবারকে সকাল হতে সন্ধ্যা পর্যন্ত ৭০ হাজার ফেরেশতা কান্নাকাটি করেন এবং সন্ধ্যা হতে সকাল পর্যন্ত অন্য ৭০ হাজার ফেরেশতা কান্নাকাটি করেন। এখন বলতে চাই, এই ফেরেশতারাই রসুল হয়, কিন্তু নবি হয় না এবং নবি মানুষ হতেই হয়। তবুও এত কিছু জানার পরও আমরা কোনো ইনসানে কামেল তথা পীরে কামেলকে ভুলেও রসুল বলতে চাই না। (আকালমান্দকে লিয়ে ইশারাই কাফি)।

কোরান-এ সালাতের উল্লেখ : ৫৮

কোরান-এর ২৪ নম্বর সূরা আন-নূরের ৫৮ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে : হে আম্মানুগণ, যাহারা তোমাদের ডান হাতের অধিকারভুক্ত এবং তোমাদের মধ্যে যাহারা বালেগপ্রাপ্ত হয় নাই তাহারা তোমাদের অনুমতির জন্য তিন সময়ে (অপেক্ষা করিবে), ফজরের সালাতের পূর্বে এবং গরমের সময়ে দুপুরে যখন তোমাদের পোশাক খুলিয়া রাখ এবং এশার সালাতের

পর। [এই আয়াতের মর্মার্থ অধম লিখকের জ্ঞানা নাই, তবে সদর উদ্দিন আহমদ চিশতির রচিত কোরান দর্শন নামক কোরান তফসিরে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।] (ইয়া আইউহাল্ লাজিনা আম্মানু লিইয়াস্তা যিন্‌কুম্বুল লায়ীলা মালাকাত আইমানুকুম ওয়াল্লাজিনা লাম ইয়াব্লুগল হলুম্মা মিনকুম সালাসা মাররাতিন্; মিন্‌কাবলি সালাতিল ফাজরি ওয়া হীনা তাদ্বাউনা সিয়াবাকুম মিনাজ্জ জোহিরাত ওয়া মিম্ব বাদি সালাতিল ইশায়ি)।

কোরান-এ সালাতের উল্লেখ : ৫৯

কোরান-এর ২৬ নম্বর সূরা শুয়ারার ২১৭-২১৯ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে : এবং নির্ভর করুন আজিজরূপী (ভাসমানরূপী পরাক্রমশালী) রহিমের উপর যিনি আপনাকে দাঁড়ানো অবস্থায় দেখেন এবং সেজদাকারীদের মধ্যে আপনার উঠা বসা দেখেন। (ওয়া তাওয়াক্কাল আলল আযীযির রাহীম। আল্লাযী ইয়ারাকা হীনা তাকুম্বু। ওয়া তাকাল্লাবাকা ফিস্সাজ্জিদীনা)।

কোরান-এ সালাতের উল্লেখ : ৬০

কোরান-এর ২৭ নম্বর সূরা নমলের ৩ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে : যাহারা সালতি কায়েম করে এবং জাকাত আদায় করে এবং যাহারা আখেরাতে বিশ্বাস রাখে। (আল্লাজিনা ইউকীমুনাস সালাতা ওয়া ইউতুনাস যাকাতা ওয়াহম্ব বিল আখিরাতি হম্ব ইউকিনুন)।

ব্যাখ্যা

এই আয়াতটির বিষয়ে কিছু কথা লিখতে গেলেই প্রথম দুইটি আয়াতে কী বলা হয়েছে উহা চিন্তা করার বিষয়। 'ত্বা-সীন ওইগ্লো কোরান-এর আয়াত এবং

সুস্পষ্ট কেতাব মোমিনদের জন্য হেদায়েত এবং সুসংবাদ।' তিলকা দু'টিকে অঙ্কর না বলে শব্দই বললাম এবং ওই শব্দ দুইটি হলো কোরান-এর আয়াত এবং সুস্পষ্ট কেতাব। কিন্তু এখানে একটি প্রশ্ন দাঁড়ায় আর সেই প্রশ্নটি হলো এই দুইটি শব্দ যে কোরান-এর আয়াত এবং সুস্পষ্ট কেতাব ইহা কাদের জন্য? ইহা ইনসানের জন্য নয় তথা মানুষের জন্য নয়, ইহা মুশরিকদের জন্য নয়, ইহা মেনাফেকদের জন্য নয়, ইহা কাফেরদের জন্য নয়, ইহা আলবাবদের জন্য নয়, ইহা আফসারদের জন্য নয় এবং এমনকি ইমানদারদের জন্যও নয় তথা আমানুদের জন্যও নয়, কারণ এই এতগুলো শ্রেণীর মানুষদের পক্ষে তিলকা দু'টি শব্দ যে কোরান-এর আয়াত ইহা বোঝা মোটেই সম্ভবপর নয়। তাই সোজাসুজি বলা হয়েছে যে, এই তিলকার রহস্যটি একমাত্র মোমিনেরাই বুঝতে পারবেন। সুতরাং এই দু'টো শব্দ কেবলমাত্র মোমিনদেরকেই লক্ষ্য করে বলা হয়েছে। সাধারণ মানুষ তো দূরে থাক, বরং আমানুরাও ইহার বিদ্ধ-বিসর্গ বুঝতে পারবে না। এই তিলকা শব্দ দুইটি মোমিনের জন্য সুসংবাদ, কারণ মোমিনেরা এই শব্দ দুইটির অর্থ ও রহস্য ভালোভাবে জানেন বলেই ইহা সুসংবাদ এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভের পথে বিরাট একটি মহামূল্যবান পাথর, অনেকটা আমাদের দেশীয় ভাষায় যেমন বলা হয় : সবার জন্য জঙ্গলের খড়ি, কিন্তু মোমিনদের জন্য জরি। ডাক্তার-কবিরাজরা জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে যে ঔষধি গাছটি রোগ নিরাময় করে সেই গাছটি খুঁজে নেন। ডাক্তার-কবিরাজের চোখে জরি আর সাধারণ মানুষের চোখে ওই গাছটি হলো জঙ্গলের খড়ি। আল্লাহ কোনো কিছুই নিরর্থক সৃষ্টি করেন নাই। কোরান-এর এই শব্দগুলোকে আমরা না বুঝে কোরান-এর সাংকেতিক চিহ্ন নামের লেবেল এটে দিয়েছি এবং বুঝতে চেয়েছি যে, এইগুলোর অর্থ এক আল্লাহই জানেন। যদি কারো-না-কারো জন্য এই শব্দগুলো রহস্য জানবার গুপ্ত ভাষা না হতো তা হলে মোমিনদের কথাটি উল্লেখ করা হতো না। যদি কেউ না কেউ বুঝতেই না পারে তা হলে এই শব্দগুলোর সার্থকতাটি

কোথায় থাকে? আল্লাহ তো এমনিতেই সব কিছু জানেন : তা হলে না বুঝতে পেরে আল্লাহর ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে খালাস হয়ে যাবার কথাটি একদম মানায় না।

কোরান-এ সালাতের উল্লেখ : ৬১

কোরান-এর ২৯ নম্বর সূরা আনকাবুতের ৪৫ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে: তেলাওয়াত কর যাহা তোমার দিকে আল কেতাব হইতে ওহি হয় এবং সালাত কায়েম কর, নিশ্চয়ই সালাত অশ্লীলতা ও অবিশ্বাস নিবারণ করে এবং নিশ্চয়ই আল্লাহর জিকির আকবর (শ্রেষ্ঠ)। আল্লাহ জানেন তোমরা যাহা বানাইতেছ। (উতলু মাউহিয়া ইলাইকা মিনাল কিতাবি ওয়া আকিমিস্ সালাতা; ইন্নাস্ সালাতা তান্হা আনিল্ ফাহশায়ি ওয়াল মুনকারি; ওয়ালা যিকরুল্লাহি আকবারু; ওয়াল্লাহ ইয়ালামু মা তাস্নাউন)।

ব্যাখ্যা

নিশ্চয়ই সালাত তথা নামাজ অশ্লীলতা নামক মন্দ বিষয়গুলো এবং ছোট ছোট অবিশ্বাসগুলো দূর করে দেয়। এই দু'টো বিষয় হতে মুক্ত রাখে বলে 'নিশ্চয়ই' শব্দটি সালাতের আগে ব্যবহার করা হয়েছে। এই বিষয়টি ইতিবাচক এবং নেতিবাচক তথা পজিটিভ এবং নেগেটিভ দু'রকমভাবেই চিন্তা করা যায়। তবে ইতিবাচক দিকটি হলো, যারা অশ্লীল এবং মন্দ কাজে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে তাদের এই সালাত ধীরে ধীরে অশ্লীল ও মন্দ হতে মুক্ত করে দেয়। আমরা হজরত আনাস (রা.)-এর বর্ণনাতে পাই যে, মহানবির সঙ্গে এক মহাপাপী নামাজ আদায় করতো। এই মহাপাপীর

পাপের বিষয়গুলো মহানবিকে জানানোর পর মহানবি বললেন যে, এই নামাজই তাকে সমস্ত রকম পাপ কাজ হতে একদিন বিরত রাখবে এবং বাস্তবে তাই হয়েছিল। হজরত হাসানও বলেছেন, যে-নামাজ নামাজিকে তার পাপসমূহ হতে বিরত রাখে না, সেই নামাজ নামাজই নয়। তার ওই নামাজ পড়া আর না পড়া একই কথা। কারণ নামাজ যেখানে মন্দ কাজ হতে অবশ্যই বিরত রাখে বলে ঘোষণা করা হয়েছে সেখানে মন্দ কাজ হতে যদি বিরত না হতে পারে তা সোজা কথায় সেই নামাজ সম্পূর্ণ নিষ্ফল তথা বেকার। কচু কাটতে কাটতে যেমন ডাকাত হয় তেমনি নামাজ পড়তে পড়তে আল্লাহর ওলিও হয়। প্রথমটি নেগেটিভ তথা নেতিবাচক, পরে পজিটিভ তথা ইতিবাচক। বাস্তব জীবনে মানুষের উপর উভয় প্রকার কর্মফল দেখতে পাই।

কোরান-এ সালাতের উল্লেখ : ৬২

কোরান-এর ৩০ নম্বর সূরা আর রুমের ১৭-১৮ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে : সুতরাং আল্লাহর তসবিহ পাঠ কর সঙ্ক্যায় ও ভোরে এবং

তাঁরই জন্য একমাত্র প্রশংসা আকাশসমূহ এবং জম্বিনে এবং রাতের বেলায় ও দুপুর বেলায়। (ফাসুবহানাল্লাহি হীনা তুমসুনা ওয়াহীনা তুসবিহুন। ওয়ালাহল হামদু ফিস সাম্মাওয়াতি ওয়াল আরদি ওয়া আশিয়্যাও ওয়াহীনা তুজহিরুন)।

ব্যাখ্যা

প্রশংসা দুই প্রকার : একটি প্রশংসা মৌখিক, অপরটি আন্তরিক। একটি মৈজাজি প্রশংসা, অপরটি হাকিকি প্রশংসা। দুটোরই প্রয়োজন আছে। মুখের প্রশংসাটির মূল্য কতটুকু তা আল্লাহই নির্ধারণ করবেন। এবং আন্তরিক প্রশংসা তথা হাকিকি প্রশংসা তখনই একজন সাধক করতে পারেন যখন আপন নফসের সঙ্গে পরীক্ষা করা জন্য যে খান্নাসরূপী শয়তানটিকে দেওয়া হয়েছে উহাকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। এখানে একটি মজার কথা না বলে পারলাম না আর তা হলো, সমগ্র কোরান-এ ‘খান্নাস’ শব্দটি মাত্র একবার ব্যবহার করা হয়েছে। খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, অথচ মাত্র একবার কেন বলা হলো জানি না। অনুরূপভাবে আরও দুইটি শব্দ, যাহা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, উহাও সমগ্র কোরান-এ মাত্র একবার ব্যবহার করা হয়েছে। একটি ‘কাওসার’, অপরটি হলো ‘আহাদ’। ‘আমার’, ‘আমি’ হতে যখন সাধক খান্নাসটিকে বাহির করে দেয়, তথা মুসলমান বানায়, তথা সম্পূর্ণ বশীভূত করে ফেলে, তখনই সাধক দেখতে পায় যে একমাত্র প্রশংসাটি তো আল্লাহর জন্যই। আকাশসমূহ এবং জমিন, তথা সমগ্র সৃষ্টিরাজ্য, তাঁরই গুণগান গাইছে তথা তাঁরই অনুগত, তাঁরই মুখাপেক্ষী, তাঁরই আয়ত্তাধীন এবং তৌহিদে বাস করছে। এখানে আরেকটু বলে নেওয়া ভালো যে, আকাশসমূহ বলতে

মনোজগতকেও বুঝানো হয়েছে এবং ‘আরদ্’ বলতে পৃথিবী, জম্মিন মাটি ও দেহটিকেও বুঝানো হয়েছে। আরবি ভাষাটি, দুঃখ নিয়ে বলছি যে, একটি অত্যন্ত গরিব ভাষা। একই ওহি যাকে বাংলায় প্রত্যাদেশ বলা হয়, উহা যেমন নবি-রসুলের কাছে ‘ওহি’ হয়, তেমনি হজরত মুসা ও হজরত ইসা (আ.)-র মায়েদের কাছেও ওহি হয় এবং সূরা নহলের ৬৮ নম্বর আয়াতে আমরা দেখতে পাই, মোম্বাহির কাছেও নাজেল হয়। শব্দটির বানান, জের-জবর একই, কিন্তু প্রকারভেদে তিন রকম হচ্ছে। মোম্বাহির কাছে ওহি নাজেল হয় বলে কখনই মোম্বাহির পরে ‘আলাইহিস সালাতুস সালাম’ ব্যবহারের প্রশ্নই ওঠে না। কারণ মোম্বাহি কেবল নফস তথা জীবাত্মার অধিকারী, কিন্তু রুহ তথা পরমাত্মার প্রশ্নটিই ওঠে না। রুহ তথা পরমাত্মাটি সমগ্র সৃষ্টিরাজ্যে একমাত্র জিন এবং মানুষকে দেওয়া হয়েছে। তাই মানুষ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব তথা আশরাফুল মাখলুকাত। এই আয়াত দু’টোতে আর একটি কথা বলা হয়েছে আর সেই কথাটি হলো একমাত্র প্রশংসা। একমাত্র প্রশংসা বলতে কী বুঝায়? অন্য কোনো কিছুর অস্তিত্ব এবং অবস্থান থাকলে প্রশংসার দাবি করতে পারে। একটি অণুর পরিমাণ ধূলিকণাও যদি আল্লাহ হতে আলাদা থাকতো তা হলে বিজ্ঞানীরা ওই ধূলিকণাটির প্রশংসা এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা-র চেয়েও বড় করে

লিখতে পারতো। যেহেতু আল্লাহর সেফাত তথা গুণাবলি ছাড়া সৃষ্টিজগতে আর কিছুই নাই সেই হেতু প্রশংসাটিও হয়ে যায় একমাত্র তথা ‘আল’। কেউ থাকলে তো প্রশংসাটি করা যায় এবং সেই প্রশংসাটি যত ক্ষুদ্রই হোক, কিন্তু আল্লাহর অস্তিত্ব ছাড়া সৃষ্টিজগতে আর কেহই নাই।

সুতরাং একমাত্র প্রশংসাটি তো একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের, একমাত্র প্রশংসাটি তো আল্লাহ জাল্লা শানাহর। তাই সাধক মনে-প্রাণে দেখতে পান যে একমাত্র প্রশংসাটি আল্লাহরই, কারণ সাধক ধ্যানসাধনা, মোরাকাবা-মোশাহেদার মাধ্যমে, তথা দায়েমি সালাতের মাধ্যমে তথা অবিরাম সংযোগের মাধ্যমে, তথা নিত্য যোগাযোগের মাধ্যমে খান্নাসকে তাড়িয়ে দিতে পেরেছেন। ইহাকেই বলা হয় হাকিকি প্রশংসা। এই হাকিকি প্রশংসাটি আল্লাহর সাধক ছাড়া অন্যের পক্ষে করা সম্ভব নয়। যাহা সম্ভব উহা মেকাজ্জি প্রশংসা। উহা খান্নাসকে সঙ্গে নিয়ে মৌখিক প্রশংসা।

কোরান-এ সালাতের উল্লেখ : ৬৩

কোরান-এর ৩০ নম্বর সূরা আর রুমের ৩৬ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে : পবিত্র মনে-প্রাণে এবং তাকওয়ার সহিত কয়েম কর সালাত এবং শেরেককারীদের দলভুক্ত হইও না। (মুনাব্বিনা ইলাইহি

ওয়াস্তাকুহু ওয়া আকীমুস্ সালাতা ওয়ালা তাকুন্নু মিনাল মুশরিকীন)।

ব্যাখ্যা

এই আয়াতটিতে পবিত্র মনে-প্রাণে তথা বিশুদ্ধ চিত্তে এবং তাকুওয়ার সহিত সালাত কায়েম করার কথাটি বলা হয়েছে। পবিত্র চিত্তটি তথা পবিত্র নফসটি তখনই পবিত্র হয় যখন নফসের সাথে মিশে থাকা খান্নাসটি আর থাকে না। অনেকটা দুধে মাখন মিশে থাকার মতো খান্নাসের অবস্থান। দুধ দেখলে যে রকম দুধের সঙ্গে মাখন আছে বোঝা যায় না, সেই রকমভাবে আপন নফসের সঙ্গে খান্নাসের অবস্থানটিও বোঝা যায় না। দুধের উপর চরখার প্রচণ্ড টানাটানিতে মাখন যখন ভেসে ওঠে তখন অবাক হয়ে যায়। বুঝতে পারি, দুধের ভিতরে মাখনটি যে লুকিয়ে ছিলো উহা চরখার অবিরাম টানাটানির পরই ভেসে উঠে তথা মাখনটি যে দুধেরই সঙ্গে মিশেছিল উহা ধরা পড়ে যায়। আল্লাহর সাধকেরা যখন দায়েমি সালাতের মাধ্যমে তথা ধ্যানসাধনার মাধ্যমে তথা মোরাকাবা-মোশাহেদার মাধ্যমে খান্নাসটিকে বাহির করে ফেলে দুধের ভেতর হতে মাখন বাহির করার মতো, তখনই সাধকের চিত্তটি হয় বিশুদ্ধ, পুতঃপবিত্র। এই দায়েমি সালাতে মশগুল থাকাটাকেই বলা হয় তাকুওয়া তথা তদগত হয়ে থাকা। খান্নাস যতদিন নফসের সঙ্গে অবস্থান করে ততদিন

বিগ্গদ্ধ চিত্তটি অর্জন করা যায় না। তাই আয়াতটির শেষে বলা হয়েছে যে, মূশরিকদের তথা শেরেককারীদের দলে অবস্থান করো না। আমি এবং খান্নাস দুজনে থাকলেই হয় শেরেক। সুতরাং খান্নাসকে সঙ্গে রেখে দায়েমি সালাত তথা হাকিকি সালাতটি কায়েম করা যায় না। দুইয়ের অবস্থানকেই বলা হয় শেরেক। তৌহিদে দুই থাকে না এবং দুই থাকার বিধান নাই। হোমিওপ্যাথিক ঔষধের নবম শক্তিতে মূল ঔষধের কোনো অস্তিত্বই খুঁজে পাওয়া যায় না। তা হলে ২০০ শক্তিতে মূল ঔষধের আশা করাটা বৃথা এবং ১০,০০০ শক্তিতে আরও বৃথা। ভালো করে লক্ষ করে দেখুন, মূল ঔষধের যেখানে নবম শক্তিতে অস্তিত্বই থাকে না সেইখানে ১০,০০০ শক্তিতে থাকার প্রশ্নই ওঠে না। মূল ঔষধটি ১০,০০০ শক্তিতে নাই সত্য, কিন্তু ভয়ঙ্কর শক্তিটি অবস্থান করছে। ঔষধের অস্তিত্ব নাই, কিন্তু শক্তির ভয়ঙ্করতা আছে। কী সূক্ষ্ম চিন্তার বিষয়। জ্ঞানীদের জন্য এই উপমাটি কাজে লাগতে পারে।

আরেকটি বিষয় লক্ষ করার মতো আর সেটা হলো, যখন দুধ হতে মাখন সম্পূর্ণরূপে ভেসে ওঠে তখন দুধ আর দুধ থাকে না, দুধ হয়ে যায় ঘোল তথা মাঠা। ঘোল দেখতে কিন্তু হুবহু দুধের মতো। চোখ বিশ্বাস করতে চায় না যে এটা ঘোল, কিন্তু পান করার সময় বোঝা যায় যে এটা দুধ নয়, আমি ঘোল পান করছি। ঠিক সে রকমভাবে দায়েমি সালাতের মাধ্যমে, আল্লাহর বিশেষ রহমতে, খান্নাসটি যখন বাহির হয়ে যায় তখন সাধকের দেহ-মনটি দেখতে সাধারণ মানুষের মতোই, কিন্তু মোটেও সাধারণ নয়। ‘আনা বাশারুম মিসলেকুম’

তথা ‘আমি তোমাদেরই মতো বাশার’, অথচ সাধারণ বাশার মোটেই নয়।

পাঠক বাবারা এবং মায়েরা একটি লক্ষ করুন, তোহিদের বাণী কিন্তু একটিই, কিন্তু ইহার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের শৈলী অনেক। সঙ্গীত যে রকম মাত্র সাতটি পাকে বাধা থাকে, তথা সা-রে-গা-মা-পা-ধা-নি-সাঁ-ব মধ্যে সব সঙ্গীত সৃষ্টি করা হয়েছে, সেই সৃষ্টির শৈলী বহু রকম, কিন্তু সব সঙ্গীতই ওই একই সাতপাকে বাধা। সুতরাং কোরান-এর ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণগুলো যদি একই রকম হয় তো অধম লিখকের কর্তব্য কিছু নাই। একই সঙ্গীতে যেমন বহু রাগ-রাগিনীর চং ও শৈলীর ব্য্কার দেখতে পাই, যেমন রাগে ভৈরবী, রাগে বেহাগ, রাগে ইমন, রাগে কাফি, রাগে মালকোম, রাগে বাহার, রাগে কেদারা, রাগে ঠুমরি, রাগে খানঝাট, রাগে হংসধনী, রাগে কিরবানী, রাগে মধুবসন্তী, রাগে কানাড়া, রাগে দরবারী, রাগে বাগেশ্রী, রাগে শাহানা, রাগে ভীম, রাগে মেঘমল্লার, রাগে সুরদাসী, রাগে মিয়া কি মল্লার, রাগে জয়ন্তী, রাগে হিন্দোল, রাগে দীপক, রাগে হিন্দোল বাহার, রাগে খান্জাজ বাহার, রাগে পরজ, রাগে পাহাড়ী, রাগে খট, রাগে রসিয়া, রাগে মালিগোড়া, রাগে সাজগিরি, রাগে বরাটি, রাগে জৈংসী, রাগে রেবা, রাগে ত্রিবেণী, রাগে কোমারিকা, রাগে মালসী, রাগে বলারী, রাগে চন্দ্রমধু, রাগে সাবেরী, রাগে মালবগোড়া, রাগে মায়ুরী, রাগে সুখাবতী, রাগে শঙ্করাভরণ, রাগে নারায়ণী ইত্যাদি অনেক অনেক রাগ-রাগিনী ওই একই সাত পাকে বাধা মাত্র, অথচ মনে হয় কত গান, কত কথা, কত সুর, কত মূর্ছনা— আসলে সবই তো ওই সাত পাকেই বাধা। জ্ঞানীদের জন্য এই উপমাটি কাজে লাগতে পারে।

কোরান-এ সালাতের উল্লেখ : ৬৪

কোরান-এর ৩১ নম্বর সূরা লুকমানের ১-৫ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে : আলিফ লাম মীম। ওইগুলি কেতাবুল হাকিমের আয়াত। মুহসিনিনদের জন্য হেদায়েত ও রহমত। যাহারা সালাত কায়েম করে এবং জাকাত আদায় করে এবং আখেরাতে বিশ্বাস রাখে

তাহারাই তাহাদের রবের উপর হেদায়েতের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং তাহারাই সফলকাম। (আলিফ লাম মিম। তিলকা আয়াতুল কিতাবিল হাকীম। হুদাও ওয়া রাহমাতাললিল মুহসিনীন। আল্লাখিনা ইউকীমুনাস সালাতা ওয়া ইউতুনায় যাকাতা ওয়াহম বিন আখিয়াতি হম ইউকিনুন। উলাইকা আলা হদাম মির রাব্বিহম ওয়া উলাইকা হমুল মুফলিহুন)।

ব্যখ্যা

এই আয়াতগুলোর ব্যখ্যা লিখতে গেলে প্রায় একই রকম বক্তব্যটি দিতে হয়। কিন্তু এখানে এই ‘আলিফ লাম মিম’ তিনটি শব্দকে আয়াতি বলা হয়েছে। কোরান শব্দটি ব্যবহার না করে কেতাবের আয়াত বলা হয়েছে, আবার কেতাবের সঙ্গে ‘হাকিম’ শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। ‘হাকিম’ অর্থই হলো বিজ্ঞানময় রহস্যপূর্ণ। আবার বলা হয়েছে : ‘যারা সংকল্পশীল তাদের জন্য এই আলিফ লাম মিম আয়াতটি হেদায়েত ও রহমত বহন করে।’ অথচ এই কথাগুলো না বুঝতে পেরে সাংকেতিক চিহ্নের ব্যুত্থিতে বেখে দেওয়া হয় এবং বলা হয় যে ইহার অর্থ আল্লাহই জানেন। অর্থাৎ জানবার আগ্রহটি এবং গবেষণা করার বাসনাটির উপর দেয়াল তুলে দেয়। নিজেরা না বুঝতে পারুক, কিন্তু সবার জন্য পাইকারিভাবে দেয়ালটি দাঁড় করানো মোটেই সমীচীন মনে করি না। নিশ্চয়ই অধম লিখকের এই ‘আলিফ লাম মিম’ আয়াতটির বিজ্ঞানময় অর্থটি জানা আছে, কিন্তু শরিয়তের দৃষ্টিতে ইহার ব্যখ্যা দেওয়া ঠিক মনে করিলাম না। কারণ ইহা মাথার অর্জিত জ্ঞান দিয়ে বুঝবার উপায় থাকে না। যারা সিনার এলেক্স কিছুটা ইলেক্ট্রন হাঙ্গার করতে পেরেছে তারাই এর মর্মার্থ কিছুটা হলেও বুঝতে পেরেছেন। তাই এই জ্ঞানকে কেতাবের জ্ঞান বলা হয়েছে এবং সেই কেতাবটির শেষে হাকিম শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে তথা বিজ্ঞানময় রহস্যপূর্ণ কেতাব বলা হয়েছে। রহস্যের কেতাব রহস্য দিয়েই জানতে হয় : মাথার এলেক্স দিয়ে জানা যায় না। কোরান-এর সবচাইতে বড় আকারের যে বিশাল তফসিরটি ইমাম ফখরুদ্দিন রাজি করে গেছেন তিনি

মুরিদ্ হবার জন্য হজরত নজমুদ্দিন কোবরার কাছে গিয়েছিলেন। হজরত নজমুদ্দিন কোবরা ইমাম রাজিকে মুরিদ্ করেন নাই, বরং একটি কথাই বলেছিলেন যে, 'তুমি কলম দিয়ে ঘষে ঘষে কাগজের উপর অনেক কথা লিখেছ, আর আমি নফসের উপর জিকির-আজকারের রেয়াজত করে কলবি জ্ঞান হাসিল করেছি। তোমার জ্ঞান মাথার জ্ঞান, আর আমার জ্ঞান সিনার জ্ঞান। তাই তোমাকে মুরিদ্ করতে পারলাম না। তবে রহমতের নজর হতে বঞ্চিত হবে না। বাবা রাজি, মনে রেখো, সিনার এলেক্স হাসিল করতে হলে কালি-কলম ও কাগজের দরকার হয় না।'

কোরান-এ সালাতের উল্লেখ : ৬৫

কোরান-এর ৩১ নম্বর সূরা লুকমানের ১৭ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে : হে আমার পুত্র, সালাত কায়েম করো, সৎ কাজের আদেশ দাও, অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখো এবং বিপদে ধৈর্যধারণ করো, নিশ্চয়ই ওইসব সাহসিকতার কাজ। (ইয়া বুনাইয়া আকিমিস্ সালাতা ওয়ামুর বিল মারুফি ওয়ান্ হা সালাতা ওয়ামুর বিল মারুফি ওয়ান্ হা আনিল্ মুনকারি ওয়াসবির্ আলা মাআসাবাক ; ইন্না জালিকা মিন আজমিল উমূর।)

ব্যাখ্যা

এখানে হজরত লোকমান তাঁর ছেলেকে সালাত কায়েমের উপদেশ দিচ্ছেন। সালাত অর্থ হলো আলাহর সঙ্গে যোগাযোগ তথা আলাহর সঙ্গে সংযোগটিকে চিরস্থায়ী করা। এই মহান যোগাযোগটি তথা সালাতটি যখন প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় তখন আর খান্নাসরুপী শয়তানের কোনো কার্যকারিতা থাকে না এবং তখনই মানুষ মহৎ হয়ে যায়, পবিত্র হয়ে যায়। নিজে মহৎ না হয়ে অপরকে মহৎ হবার উপদেশ দেওয়া মোটেই মানায় না এবং ইহা তাহিদের শিক্ষা নয়। সালাত কায়েম হয়ে গেলে মানুষ যে সব রকম পাপ কাজ এবং ফায়েসা থেকে মুক্ত হয়ে যায় সেটাও কোরান-এ অন্যত্র বলা হয়েছে। সুতরাং আমরা বলতে পারি যে যার সালাত কায়েম হয়ে গেছে তিনি মন্দ কাজ এবং সব

রকম ফায়েসা হতে মুক্ত হয়ে গেছেন এবং যিনি মুক্ত হয়ে গেছেন তিনিই মহা তাই হজরত লোকমান ছিলেকে বলছেন যে, ভালো কাজ করার আদেশ দিয়ে। এই আদেশটি কাদেরকে দিতে বলেছেন? হয়তো আপনজন, পাড়া-প্রতিবেশী এবং আম-জনতাকে। এবং একইভাবে আদেশ দিচ্ছেন মন্দ কাজগুলো করতে বারণ করতে। এখানেও একটি প্রশ্ন থেকে যায় যে, ভালো কাজগুলো বলতে কী বুঝায়? এবং ভালো কাজগুলোর একটি তালিকা তৈরি করা দরকার। আবার মন্দ কাজগুলো বলতে কী বুঝায়? মন্দ কাজগুলোরও একটি সুনির্দিষ্ট তালিকা থাকা প্রয়োজন। কারণ একটি কাজ কারও কাছে ভালো এবং কারও কাছে মন্দ। সমাজ জীবনে এই রকম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মতপার্থক্য হওয়াটা স্বাভাবিক। নতুবা এই ভালো-মন্দের তর্কযুদ্ধে ফেরকাবাজি হতে পারে। বিষয়গুলো দেখতে মনে হয় খুবই সোজা, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বড়ই জটিল, কারণ সমাজ জীবনে বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে এই রকম দৃশ্যগুলো আমাদের অহরহ দেখতে হয়। কথায় কথায় বলতে হচ্ছে যে, আহলে সুন্নাতুল জামাতের অনুসারীরা হজরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.), ফারুকে আজম ওমর ফারুক (রা.) এবং জুন্নুনারাইন হজরত ওসমান গনি (রা.)-কে উচ্চ স্তরের সাহাবা বলে মেনে নেয়, অথচ শিয়া ফেরকার মুসলমানেরা এই তিন মহান সাহাবার বিরুদ্ধে অনেক রকম কৎসা রটনা করেন এবং এই কৎসা রটনায় শিয়া ফেরকারি মুসলমানেরা সুন্নিদের হাদিস হতে উদ্ধৃতি দিয়ে থাকেন। বাগে ফেদাক, সাকিফার তর্কবিতর্ক, দোয়াত কলমের হাদিস ইত্যাদি ধারালো যুক্তিতর্কের মাধ্যমে তুলে ধরেন যা অনেকেরই অনুভূতিতে আঘাত করে। এখন প্রশ্নটি হচ্ছে, কোনটি ভালো এবং কোনটি মন্দ? আবার ওহাবি ফেরকার অনুসারীরা মহানবির নামে মিলাদ পড়া, মহানবির নামে দাঁড়িয়ে কেয়াম করা এবং পাচজন বড় বড় ওলি যথা : গাউসুল আজম বড় পীর সাহেব, স্পেনের মহিউদ্দিন ইবনুল আরাবি, মিশরের আহমেদ রেফায়ি, ইরান বা তুরস্কের মাওলানা জালাল উদ্দিন রুমি

এবং হজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গাজ্জালিকে তথা এই বিশ্ববিখ্যাত আল্লাহর পাঁচ ওলিকে কাফের (?) বলে ওহাবিদের গুরুঠাকুর আবদুল ওহাব নজ্জদি ঘোষণা করেছে। এবং শুধু ঘোষণাই করে নি, বরং বলেছে, যারা এদের কথা মতো চলবে বা চলে তাদেরকে কতল করা (খুন করা) ওয়াজিব। এখন পাঠকদেরকেই প্রশ্ন করি যে ওহাবিদের গুরুঠাকুর আবদুল ওহাব নজ্জদির কথাগুলোকে ভালো বলবো, না মন্দ বলবো? সুতরাং মানব জীবনের চলার প্রতিটি ধাপে কোনটা ভালো আর কোনটা মন্দ এটা নির্ধারণ করাটা কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়। এখানে সুফিবাদের চরম পর্যায়ের কথাগুলো বলছি না। এখানে সুফিবাদের দর্শনের ব্যাখ্যাও লিখছি না, বরং একদম সাদামাটা ভাষায় সমাজ জীবনের পথে চলতে গিয়ে প্রশ্নগুলো এসে দাঁড়ায়। এখানে আমরা ইমামুল আউলিয়া হজরত বায়েজিদ বোস্তামির সুফিদর্শনের অতি উচ্চ স্তরের কথাগুলো, যেমন বায়েজিদ বলেছেন, ‘মান আরাফাল্লাহা, কাল্লা লেসানাহ।’ ‘যে ব্যক্তি আল্লাহর পরিচয় লাভ করেন তথা মারেফতের সাগরে অবগাহন করেন, অবশ্যই সেই ব্যক্তিটি নির্বাক হয়ে যান তথা হতভম্ব হয়ে পড়েন।’ বুকে হাত রেখে বলুন তো, ওহাবি ফেরকা, শিয়া ফেরকা, বাটালভি ফেরকা, চক্রালভি ফেরকার অনুসারীরা কি ইমামুল আউলিয়া হজরত বায়েজিদ

বোস্তামিকে আল্লাহর ওলি বলে মেনে নেবে? যাকে আপনি-আমি সারাটি জীবন আল্লাহর একজন মহান ওলি বলে পরম শ্রদ্ধাভরে মেনে চলছি তাকেই এতগুলো ফেরকার অনুসারীরা মানা তো দূরে থাক, বরং হি হি করে হাসবে। সুতরাং ভালো এবং মন্দের পার্থক্যটি করাও সমাজ জীবনে ভয়ঙ্কর জটিল হয়ে দাঁড়ায়। এই ছোট ছোট আপেক্ষিক দর্শনের ঠঁতাঠঁতি, মারামারি, বক্সিং এবং মল্লযুদ্ধের ফলে স্বাভাবিকভাবেই সমাজ জীবনের মানুষগুলো দিশেহারা হয়ে পড়ে। কে খান্নাসরুপী শয়তানটিকে আপন নফস হতে তাড়িয়ে দিতে পেরেছেন, আর কে পারেন নি এটা চোখে দেখা যায় না, অন্তর দিয়েও বোঝা যায় না, এমনকি গবেষণা করেও এর আগামাথা পাওয়া যায় না। তা হলে? তা হলে বলতে হয় যে আল্লাহ যে বলেছেন, ‘আমি (আল্লাহ) তোমাদেরকে দুনিয়াতে পরীক্ষা করার জন্য পাঠিয়েছি’— এই কথাটিরও চির অবসান হয়ে যায়। যদি ধরাই যেত যে কে আল্লাহর ওলি আর কে আল্লাহর ওলি নয়, তা হলে সব বিষয়ের কিসসা খতম। সুতরাং কাকেই বা দোষ দিতে যাব? শুধু বলতে পারি, অদৃশ্য সুতায় বাঁধা তকদিরটি নিষে, প্রত্যেকে তকদিরের কর্মফল নিয়ে এই মর্ত্যমঞ্চে নেচে চলছে। তা হলে কাকে দোষ দেব?

হজরত লোকমান জানতেন যে তাঁর ছেলে যখন ভালো কাজের আদেশ দেবেন এবং মন্দ কাজ করা হতে নিষেধ

করবেন তখনই অনেক রকম বিপদের মুখোমুখি হতে হবে। তাই বিপদে ধৈর্যধারণ করার উপদেশটি প্রেসক্রিপশনরূপে পত্রের হাতে তুলে দিয়েছেন।

হজরত লোকমানের পরের (আয়াতে) উপদেশটি হলো : অহঙ্কার-বশে তুমি মানুষকে অবজ্ঞা করো না। আসলে শব্দটির হুবহু অর্থটি হলো, ‘তিনি তাঁর মুখ ফিরাইয়া নইলেন।’ যদিও অধম লিখক হুবহু শব্দটি ব্যবহার করি, কিন্তু এইখানে ইচ্ছা করেই তা করলাম না। কেননা আরবি ভাষায় এই শব্দটিকে বাগধারারূপে তথা ইডিয়মরূপে ব্যবহার করা হয়। বাংলা ভাষাতেও এই রকম বাগধারা আছে। যেমন, যিনি সব সময় হালে থাকেন সেই হালের মানুষটির সামনে যদি ব্যান্ডপাটির বাজনা বাজানো হয় তৌ হালে বিভোর হয়ে বৈতালিক নৃত্যে মগ্ন হয়ে যাবে। এটাকেই বাংলা ভাষার বাগধারায় বলা হয়ে থাকে : এমনিতেই নাচুনি বুড়ি, তার উপর ঢোলের বাড়ি। ইংরেজি ভাষাতেও আমরা এ রকম বাগধারা দেখতে পাই। যেমন অব্যোর ধারায় বৃষ্টি পড়ছে-কে ইংরেজিতে বলা হয় : রেইন ফলস্ ক্যাটস অ্যান্ড ডগ্‌স। আসলে হজরত লোকমানের ছেলের কোনো অহঙ্কারই থাকতে পারে না, কারণ সালাত কায়েম হয়ে গেলে আর কোনো অহঙ্কারই থাকে না। তখন আল্লাহকে নিয়ে অহঙ্কার করা যায়, কিন্তু নিজে নিজে অহঙ্কার করা যায় না। ধরে নিলাম আল্লাহকে নিয়েই অহঙ্কার করছেন, তা হলে মানুষকে অবজ্ঞা আর অবহেলা করার প্রশ্নটিও আপেক্ষিক। সেই সঙ্গে উদ্ধতভাবে পৃথিবীতে বিচরণ করার কথাটিও আপেক্ষিক। কিন্তু আল্লাহ যে কোনো উদ্ধত অহঙ্কারীকে মোটেই পছন্দ করেন না সেই কথাটি হজরত লোকমানের ছেলের জন্য প্রযোজ্য নয়, বরং সাধারণ মানুষকে শিক্ষা দেবার জন্য কথাটি বলা হয়েছে। ‘আপনার আগের গুনাহসমূহ এবং পেছনের গুনাহসমূহ আল্লাহ মাফ করে দিয়েছেন’- কথাটি মহানবির সাহাবাদের বেলায় প্রযোজ্য, কিন্তু মহানবির জন্য মোটেই প্রযোজ্য নয়। কারণ কোরানি-এর সুবানজম্মে আল্লাহ বলেছেন যে, মহানবি জীবনে একটি কথাও নিজ হতে বলেন নি, বরং আমি আল্লাহ যা

বলতে বলেছি তাই বলেছেন। সুতরাং মহানবির জন্য গুনাহ করার প্রশ্নই ওঠে না।

খিজিরের মতো আবদুহ যখন হজরত মুসা (আ.)-র সামনে নতুন নৌকাটির ছোট্ট একটি অংশ খুলে ফেলে পানিতে ডুবিয়ে দিলেন তখন হজরত মুসা (আ.)-র কাছে আবদুহ খিজিরের এই কর্মকাণ্ডটি মোটেই পছন্দ হয় নি। কিন্তু হজরত মুসা (আ.) জানতেন যে দুই সমুদ্রের মিলনক্ষেত্রে পাওয়া আল্লাহর আবদুহকে কিছুই বলা যাবে না। আবদুহ খিজিরের পর পর তিনটি কর্ম হজরত মুসা (আ.)-এর কাছে অসহ্য, অশোভনীয় বলে প্রতীয়মান হলেও কোনো প্রকার মন্দ মন্তব্য করেন নি, কারণ হজরত মুসা (আ.) জানতেন যে তিনি আবদুহ খিজির, এবং চরম উর্ধ্বের মারফতি জ্ঞান অর্জন করার জন্য আগেই তাঁকে গুরুরূপে মেনে নিয়েছেন এবং এ-ও বলেছেন যে, ‘আপনি (খিজির) আমাকে ঈশ্বরশীলদের সঙ্গেই পাবেন।’ বাহিরের দৃষ্টিতে আত্মবিরোধ, কিন্তু অন্তর্দৃষ্টিতে মহৎ কাজ। সুতরাং ভালো-মন্দের আপেক্ষিকতার ঘূর্ণায়মান মঞ্চে চোখ দুটো বিস্তারিত হয়ে নিজের কাছেই ফেরত আসে।

কোরান-এ সালাতের উল্লেখ : ৬৬

কোরান-এর ৩৩ নম্বর সূরা আহজাবের ৩৩ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে: তোমরা তোমাদের ঘরে অবস্থান করো এবং জাহেলি যুগের মতো চাকচিক্য প্রদর্শন

করিও না, সালাত কায়েম করো, জাকাত আদায় করো এবং আল্লাহ ও তাঁর রসুলের অনুসরণ করিবে। (ওয়া কার্না ফী বুইউতিকুন্না ওয়ালা তাবারুজ্জনা তাবারুজ্জাল জাহিলিয়াতিল উলা ওয়া আকিম্নাস্ সালাতা ওয়া আতিনায্ যাকাতা ওয়া আতিনাল্লাহা ওয়া রাসুলাহ)।

ব্যাখ্যা

এই অত্যাধুনিক যুগে এই আয়াতের ব্যাখ্যাটি লিখতে গিয়ে ভীষণ চিন্তায় পড়ে যাই। তবে যদিও এই আয়াতের আদেশগুলো মহানবির স্বীদেবকে তথা সমগ্র মুসলিম জাহানের মায়েদের দেওয়া হয়েছে, তবু উপদেশটি মুসলিম নারীদের বেলায়ও প্রযোজ্য। তবে বিশেষভাবে মহানবির স্বী তথা মুসলমানদের মাতাদেরকে লক্ষ করে যে আদেশটি দেওয়া হয়েছে উহা যেন মুসলিম নারীরাও অনুসরণ করতে পারে। উচ্চ এবং সর্বোচ্চ আদালতের বিচার তথা হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্টের বিচারকদের চলাফেরার উপর বিশেষ কতগুলো নির্দেশ দেওয়া হয়ে থাকে। মহানবির স্বীদেব তথা মুসলমানদের মাতাদের যে উপদেশগুলো দেওয়া হয়েছে উহা অনেকটা উচ্চ আদালতের বিচারপতিদের চলাফেরার উপর বিধি-নিষেধ দেওয়ার মতো বলা যায় কি না বিজ্ঞ আলেম-উলামাদের উপরেই এই বিচারের ভারটি তুলে দিলাম। কারণ হিশাবে এই বলতে চাই যে,

এই অত্যাধুনিক যুগে ঘরের ভেতর অবস্থান করতে গেলে জ্ঞান অর্জনের প্রশ্নে বাহিরে আসতেই হবে। চাকুরির প্রশ্নে, চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রশ্নে, আইনজ্ঞদের প্রশ্নে এবং ইত্যাদি বিষয়ের প্রশ্নে নারীদেরকে ঘর হতে বাহির হতেই হবে। সুতরাং আমার মনে হয় (আমার ভুলও হতে পারে) এই রকম কড়াকড়ি ব্যবস্থাপত্রটি মহানবির স্বীদের বেলায়ই কেবল প্রযোজ্য। তবে মুসলিম নারীরা যেন বেহায়াপনার পোশাক-আশাক না পরে শালীনতার পোশাকে আচ্ছাদিত হয়ে বাহির হয়। এমন এক অত্যাধুনিক যুগে নাটক-সিনেমায়, নারীদের অবস্থানটি কী হবে তা আমার পক্ষে ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভবপর হলো না। তবে এক কথায় যুগের চাহিদা অনুযায়ী নারীদের কর্মসংস্থানের প্রশ্নে শুধু একটি কথাই বলতে চাই আর সেই কথাটি হলো, বেহায়াপনা করাটি মোটেই ঠিক নয়।

কোরান-এ সালাতের উল্লেখ : ৬৭

কোরান-এর ৩৪ নম্বর সূরা সাবার ৪৬ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে : আপনি বলুন, আমি তো তোমাদেরকে শুধু একটি উপদেশই দিতেছি আর তাহা হইতেছে এই যে, তোমরা আল্লাহর জন্য দাঁড়াও (সালাতে) প্রথমে জোড়ায় জোড়ায় (দুইজন করিয়া) এবং তাহার পর একা একা। তোমরা ফারাক করিয়া দেখ তোমাদের সাহেব জিনগন্থদের মধ্যে নহেন। নিশ্চয়ই তিনি তো সতর্ককারী

তোমাদের কঠোর শাস্তি সম্পর্কে। (কুল ইন্‌নামা আইজুকুম বিওয়া হিদাতিন আন্‌ তাকম্মু লিল্লাহি মাস্না ওয়া ফুরাদা সুন্না তাতাফাক্‌কারু মা বিসাহিবিকুম মিন্‌ জিন্নাতিন; ইন্‌হয়া ইল্লা নাযীরুল্লাকুম বাইনা ইয়াদাই আজ্জা বিন শাদীদি)।

ব্যাখ্যা

এই আয়াতের দ্বারা আল্লাহ তাঁর রহস্যলোকের গোপন বিষয়গুলো কী করে জানতে পারবে এবং কী ব্যবস্থা করা দরকার সেই বিষয়টি, প্রচ্ছন্নভাবে বলে দিয়েছেন। আয়াতের প্রথমেই লক্ষ করে দেখুন, কী অপূর্ব ভাষার শৈলীতে আল্লাহ বলছেন, ‘আপনি বলুন, আমি তো তোমাদেরকে শুধু একটি উপদেশই দিতেছি।’ এই রকম ভাষার শৈলীতে আশ্চর্যজনক জ্ঞানানোটি কল্পই পাওয়া যায়। আল্লাহ বলছেন : তোমরা আল্লাহর জন্য দাঁড়াও (সালাতে) প্রথমে জোড়ায় জোড়ায় (দুইজন করিয়া) অর্থাৎ দুইজনে দাঁড়াও, কিন্তু তিনজন অথবা চারজন অথবা আরও অনেকে দাঁড়াও এই কথাটি বলা হয় নি। কেন সালাতের জন্য তথা আল্লাহর সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য জোড়ায় জোড়ায় দাঁড়াতে বলা হলো? আরও তো অনেক সংখ্যা ছিলো। সেই সংখ্যাগুলোর উল্লেখ না করে কেবল জোড়ায় জোড়ায় সালাতে দাঁড়াবার কথাটি বলবার মধ্যে একটি সাক্ষাতিক গোপন রহস্য লুকিয়ে আছে, যা সবার পক্ষে ধরার তো প্রশ্নই আসে না, বরং

অনেক ইসলাম গবেষকও এই বিষয়টি ঠাহর করতে পারেন না। সালাতের হাকিকি বিষয়টি জানেন সেই রকম একজনকে শিক্ষকরূপে, গুরুরূপে, মুরশিদরূপে, পীররূপে গ্রহণ করে নেবার উপদেশটি প্রচ্ছন্নভাবে দেওয়া হয়েছে।

এই আয়াতটির গোপন রহস্যগুলো যিনি সবচাইতে ভালো করে বুঝতে পেরেছেন তিনিই এই বিষয়টির উপর ভিত্তি করে বিশাল একটি গ্রন্থ রচনা করে গেছেন। সেই বিশাল গ্রন্থটির মর্যাদা এতই উর্ধ্বে রাখা হয়েছে যে সেই গ্রন্থটিকে মানুষের রচিত ফারসি ভাষার কোরান বলা হয়। সেই বিশাল গ্রন্থটির নাম পবিত্র মসনভি তথা মসনভি শরিফ। যিনি লিখেছেন তিনি আহলে সুন্নাতুন জাম্মাতের অনুসারীদের কাছে প্রাণপ্রিয় পরম শ্রদ্ধেয় মাওলানা জালাল উদ্দিন রুমি।

মাওলানা জালাল উদ্দিন রুমির শিক্ষক তথা গুরু তথা মুরশিদ তথা পীরের নামটি হলো বিশ্ববিখ্যাত ওলিয়ে কাম্মেল বাবা শামসে তাব্রিজ। এই শামসে তাব্রিজকে নিয়ে কেমন করে হাকিকি সালাতটি কায়েম করা যায় সেই শিক্ষাটি হাসিল করতে গিয়ে বছরের পর বছর বিরাট ধৈর্য ও কঠোর বেয়াজতে মশগুল ছিলেন। তাই তিনি এই কথাটিও তাঁর মসনভি শরিফ-এ লিখে গেছেন যে, মাওলানা রুমি নিজে নিজে কাম্মেল হতে পারেন নি, যে পর্যন্ত না বাবা শামসে তাব্রিজের গোলামি গ্রহণ করেছেন।

ওহাবি ফেরকার অনুসারীদের মাথার মগজে এই কথাগুলোর রহস্যটি আঘাত করতে পারে না, বরং

ওহাবিরা শামসে তাব্রিজের গোলামি গ্রহণ করাটিকে সরাসরি শেরেক বলে ফেলে। স্থূল বিষয়গুলো তথা একদম সাদামাটা বিষয়গুলো ওহাবিরা গ্রহণ করে থাকে, তাই তাদের ধর্মীয় বিষয়গুলো শিশুসুলভ আচরণে ও কথায় ভরপুর।

সালাতে দাঁড়াও জোড়ায় জোড়ায়, তারপর একা একা। বাক্যটি যেন কেমন! তার উপর তার উপর ‘উপদেশ দিচ্ছি’ বলা হয়েছে এবং তার উপর আবার বলা হয়েছে : একটি মাত্র উপদেশ দিচ্ছি। এখানে আল্লাহর জন্য দাঁড়াতে বলা হয়েছে, কিন্তু ‘সালাত’ কথাটি নাই; সালাত কথাটি আমরা ব্রাকেট লাগিয়ে বাক্যটির ভাবকে পরিষ্কার করার অভিপ্রায়ে দিয়ে থাকি।

বার বার বলেছি যে, সালাতের হবহ বাংলা অনুবাদটি হলো যোগাযোগ তথা সংযোগ। এই যোগাযোগটি কি দুনিয়ার সঙ্গে না আল্লাহর সঙ্গে? দুনিয়ার সঙ্গে যোগাযোগে যারা মহাব্যস্ত থাকেন তাদেরকে ‘মরদুদ’ বলা হয়েছে। সুতরাং ‘আল্লাহর জন্য দাঁড়াও’ কথাটির সঙ্গে যোগাযোগ শব্দটিকে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কোরান-এর হবহ অনুবাদে আল্লাহর জন্য দাঁড়াতে বলা হয়েছে এবং সালাত শব্দটি উল্লেখ করা হয় নি। কোরান-এ উল্লেখ না করলেও অন্তত এটা পরিষ্কার বোঝা যায় যে যোগাযোগের জন্য তথা সালাতের জন্য দাঁড়াতে বলা হয়েছে।

লক্ষ করার বিষয়টি হলো, এখানে নফসটিকে দাঁড়াতে বলা হয়েছে তথা জীবাত্মাটিকে দাঁড়াতে বলা হয়েছে এবং এই দাঁড়ানোটা আল্লাহর জন্য। আল্লাহর আদেশটির নাম রুহ। আল্লাহর আদেশ কখনও আল্লাহ হতে আলাদা নয়। আমরা বাংলা ভাষায় রুহের প্রতিশব্দটি ব্যবহার করেছি পরমাত্মা। আবার অন্যত্র বলা হয়েছে, আল্লাহ মানুষের শাহারগের তথা জীবন-রগের নিকটেই আছেন। সুতরাং নফসের তথা জীবাত্মার মনোবাসনা পূর্ণ করার জন্য বলা হয় নাই, বলা হয়েছে নিরেট আল্লাহর জন্য। তাই ‘একটিমাত্র উপদেশ দিচ্ছি’ কথাটি বলা হয়েছে।

মানুষের নিজের মধ্যে যখন নফসটি মোৎমায়েন্না হয়ে যায় তথা পবিত্র হয়ে যায়, তখনই আল্লাহর রুহরূপটি বিকশিত ও প্রকাশিত হয়ে পড়ে নিজের মধ্যে। অন্য মানুষদের থেকে আল্লাহর এই জাগ্রত ও প্রকাশিত ও বিকশিত রূপটিকে ধরে ফেলার বিধানটি আল্লাহ নিজেই রাখেন নি। যদি সবাই এই রূপটি ধরতেই পারতো বা বুঝতেই পারতো তবে জগতে একজনও কাফের বা মুনাকফেক থাকতো না। এবং ‘আমি তোমাদেরকে দুনিয়াতে পরীক্ষার জন্য পাঠিয়েছি’ কথাটির সার্থকতা থাকতো না। যদি এই আয়াতটির কেহ ভুল ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করে থাকে তা হলে তাকেও আমরা দোষারোপ করতে চাই না। মানুষের সহজাত প্রবৃত্তিটি হলো মানুষ সব কিছু বুঝে যেতে চায়। বুঝতে না পারলেও গৌজামিলের গদা ঘুরাতে থাকে। কেন এ রকম হয়? প্রতিটি মানুষের নফসের সঙ্গে খান্নাসরূপী

শয়তানটিকে দেওয়া হয়েছে, তাই পরে বলা হয়েছে যে তোমাদের সাহেব জিনগন্থ নন তথা জিনটিকে তাড়িয়ে দিতে পেরেছেন; কারণ খান্নাস মানেই হলো জিন। তাই মহানবির মোহাম্মদ নামটি এখানে উল্লেখ না করে এখানে সাহেব শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ যিনি জিনরূপী খান্নাসকে আপন নফস হতে সম্পূর্ণ তাড়িয়ে দিতে পেরেছেন তিনিই সাহেব, তিনিই গুলিয়ে কামেল, তিনিই পীর। এই পীর শব্দটির সার্থকতা অর্জন করতে হলে নির্জনে ১৫টি বছর ধ্যানসাধনা করতে হয়। ইহা নামের পীর নয়, ইহা উপাধির পীর নয়, ইহা বিএ পাশ করা প্রধানমন্ত্রীকে দেওয়া হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানজনক ডক্টরেট ডিগ্রি নয়। এই রকম উচ্চ মার্গের অধিকারীদেরকেই পীর বলা হয়। আমরা ঘোল-মার্কা পীরের সঙ্গে থেকে খাঁটি দুধ-মার্কা পীরকে মাপতে গিয়েই যত ভুল করি। আমরা মুফতি-মোল্লা দিয়ে মোহাম্মদকে বিচার করে ভুল করি। আমরা পোপ-পাদ্রী দিয়ে খ্রিস্টকে বিচার করে ভুল করি। আমরা খাদেম দিয়ে খাজা বাবাকে বিচার করে ভুল করি। আমরা পাণ্ডা দিয়ে ভগবান কৃষ্ণকে বিচার করে ভুল করি। আমরা রাব্বি দিয়ে মুসা কালিমুল্লাকে বিচার করে ভুল করি। কেন ভুল করি? ভুলটি তখনই করি, যখন আপন নফসের সঙ্গে খান্নাসরূপী শয়তানকে রেখে বিচার করি। তাই এখানে সুন্দর করে কী অপূর্ব ভাষায়

কোরান বলছে : তোমাদের সাহেবের মাঝে জিন নাই, তথা তোমাদের সাহেব জিনগ্রস্ত নহেন। যদি মহানবি মোহাম্মদের নামটি এখানে উল্লেখ করা হতো তা হলে আল্লাহর এই উপদেশগুলো সীমাবদ্ধতার বলয়ে বাঁধা থাকতো। আল্লাহর জন্য তথা আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য সবাইকে ‘আল্লাহর জন্য দাঁড়াও’ বলা হয়েছে।

আবদুল্লাহ ইউসুফ আলি এই আয়াতটির ব্যাখ্যা লিখতে গিয়ে টিচার তথা শিক্ষকটির কথা বলেছেন। আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই তাঁকে। এই শিক্ষককে নিয়েই তথা এই শিক্ষক হতেই কেমন করে ধ্যানসাধনা, মোরাকাবা-মোশাহেদার বিষয়গুলো জেনে নিতে পারবো তারই জন্য জোড়ায় জোড়ায় দাঁড়াতে বলা হয়েছে। তথা একজন পীর, অপরজন মুরিদ; একজন শিক্ষক, অপরজন ছাত্র। এই ছাত্র তথা এই মুরিদ যখন ধ্যানসাধনার মাধ্যমে জিনগ্রস্ততা হতে তথা খীন্নাস হতে মুক্তিলাভ করে তখন আর পীরের প্রয়োজন হয় না, তখন আর শিক্ষকের প্রয়োজন হয় না; তাই কোরান বলছে : তারপর তো একা একা।

এই পীরের এতই প্রয়োজন যে পীরের শিক্ষা ছাড়া একা হওয়া যায় না। আর একা হলে পীরের আর দরকার হয় না। এই পীর বিষয়টি তথা শিক্ষকটির গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি যিনি দিয়ে গেছেন (আমরা নিজস্ব মতে) ওনার নাম, বিশ্ববিখ্যাত ওলিয়ে কাম্মেল মুজাদ্দের আলফেসানি সেরহিন্দ। হজরত মুজাদ্দের আলফেসানি সেরহিন্দ তো আপন পীরকে তথা হজরত বাকি বিল্লাহকে প্রথম মাবুদ বলেছেন। লক্ষ করুন, শেষ মাবুদ বলেন নি, কারণ শেষ মাবুদটি আপন নফসের

উপরেই বিকশিত ও প্রকাশিত হয়ে পড়ে। তাই হজরত মুজাদ্দের আলফেসানি বলেছেন, পীরে তাস্ত আউয়াল মাবুদ তাস্ত অর্থাৎ ‘তোমার পীরই তোমার প্রথম মাবুদ।’ (মাতলাউল উলুম ৮৬ পৃ)। হজরত হাফিজ সিরাজিও এরকম কথাটিই বলেছেন, তবে ভাষাটি অন্যরূপ। হজরত হাফিজ সিরাজি বলেছেন, আপন পীরের ধ্যানে-নিরিখে-বরজ্জখে, বছরের পর বছর নির্জনে ধ্যানসাধনা করার পর যখন আপন পীরের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে ফানা হয়ে গেলাম এবং কিছুই আর অবশিষ্ট রইল না, তখনই দেখতে পেলাম : আমাদের পীরও আমি, আমাদের মুরিদও আমি। ফারসি ভাষায় বাক্যটি এই রকম : ‘চু খুদরা বিনগারাম দিদাম হামু নাস্ত জাম্মালে খুদ জাম্মালে ইয়ারে দিদাম।’ অন্যত্র হজরত হাফিজ সিরাজি, যার নামাজে জানাজা সেই দিনের মোল্লারা পড়ে নি, সেই হাফিজ সিরাজি ফারসি ভাষায় বলছেন, ‘নামাজে মোল্লা মেহরাবে মিস্কার, নামাজে আশেকা বারদারে দিদাম।’ অর্থাৎ ‘মোল্লার নামাজ মেহরাব থেকে মিস্কারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ আর প্রেমিকেরা নামাজ পড়েন ঠাট্টা-তামাশার শুলের উপর দাঁড়িয়ে।’

আরও উল্লেখ করা যায় যে, হজরত হাফিজ সিরাজি তাঁর রচিত বৃহৎ দিওয়ান-টির প্রথমেই উল্লেখ করেছেন : শুরু করলাম আপন পীর ও মুরশিদের নামে। এত বড় সাহসী পীর-পূজারি খুব কমই হন, খুব কমই সাহস

করে এ রকম কথা লিখে গেছেন। তবে বাংলার বুকে
মাণ্ডলাউল আলা বাবা জ্ঞান শরীফ শাহ সুরেশ্বরী আরও
এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে তাঁর অমর গ্রন্থ নূরে হক গঞ্জে
নূর-এ লিখে গেছেন :

না বল খোদার নাম না বল রসুল।

এক চিতে পীর মুখে বোলাও কেবল॥

মোর্শেদ হাসরে গতি খলিফা নবীর।

শত নবি সাখী নহে, কিন্তু নিজ পীর॥

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পীর মাণ্ডলানা জাফর
শাহ ফকিরের দাদাপীর হলেন বাবা জ্ঞান শরীফ শাহ
সুরেশ্বরী। তাই আমরা দেখতে পাই, ওহাবি ফেরকার
অনুসারীদের কাছে বাবা জ্ঞান শরীফ শাহ সুরেশ্বরী
পটামিয়াম সায়ানাইন্ডের মতো ভয়ঙ্কর বিষ। এই ‘পীর
মুখে বোলাও কেবল’ কথাটির ভাষাটি হলো, ‘আল্লাহর
জন্য দাঁড়াও জোড়ায় জোড়ায়।’ এই গুপ্ত রহস্যটি সবার
চোখে তো ধরা পড়ার প্রশ্নই ওঠে না, বরং বড় বড়
গবেষকদের মাথাও ঘুরে যায়। যেমন আইনস্টাইনের
সূত্রগুলো অন্যান্য বৈজ্ঞানিকদের মাথাগুলোকে ঘুরিয়ে
দিয়েছিল। জ্ঞান অসীম, যদিও বৈজ্ঞানিকেরা প্রতি
সেকেণ্ডে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল গতির গাড়ি
হাঁকিয়েও নিউট্রন নক্ষত্রটির দূরত্বের হিসাবটি ছয়
হাজার কোটি আলোকবর্ষ বলে ঘোষণা করেছেন এবং
বলেছেন ইহা অসীম। তা হলে অধ্যাত্ম জ্ঞানের রাজ্যটি

আরও কত বড়, কত বিরাট অসীম হতে পারে? মাথার কম্পিউটারগুলো ফটফট শব্দ করে ভেঙে খান খান হয়ে যায়। তাই মানুষ কখনই আল্লাহ হয় না, বরং আল্লাহর মহা আলোর পবিত্রতায় সম্পূর্ণ ডুবে যায়। যেমন পানিতে চিনি মিশে যায়। মনেই হয় না পানির মধ্যে চিনির অস্তিত্ব আছে, কিন্তু গবেষণার ল্যাবরেটরিতে কেমিক্যাল টেস্ট করলেই চিনির অস্তিত্বটি ধরা পড়ে যায় তথা প্রকাশিত হয়ে পড়ে।

পরিশেষে, এই আয়াতটির শেষ অংশে বলা হয়েছে : তোমাদের অতি নিকটে কঠিন শাস্তিটি যে লুকিয়ে আছে উহা বলে দেবার জন্যই সাহেবকে তথা মহানবিকে সাবধানকারী তথা সতর্ককারীরূপে পাঠানো হয়েছে মাত্র। এই মাত্র শব্দটি দিয়েও ওহাবি ফেরকার অনুসারীরা মহানবিকে আল্লাহর জ্ঞাত নুরে তৈরি না বলে মাটির তৈরি সাধারণ মানুষ বলে থাকে। মাত্র শব্দটি কী উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে, আর ওহাবিরা তার কী ব্যাখ্যা লেখে!

কোরান-এ সালাতের উল্লেখ : ৬৮

কোরান-এর ৩৫ নম্বর সূরা ফাতিরের ১৮ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে : কোনো বোঝা বহনকারী অপরের বোঝা বহন করে না, এবং যদি ভারী বোঝা বহনকারী একজন তাহার ভারের দিকে ডাকে তাহা হইলে কেউ তাহার বোঝা হইতে কিছু বহন করে না,

যদিও সে নিকটের অধিকারী (আপনজন, নিকটাত্মীয় হয়)। আপনি কেবল তাহাদেরকেই সাবধান করুন, যাহারা তাহাদের অপ্রকাশ্য রবকে ভয় করে এবং সালাত কায়েম করে এবং যে পবিত্র করে তবে সে তার নফসের জন্যই পবিত্র করে, সুতরাং আল্লাহর দিকেই ফিরিয়া যাওয়া। (ওয়ালা তাযিরু ওয়া যিরাতুঁও যিয়রা উখরা ওয়া ইন্ তাদউ মুস্কালাতুন ইলা হিম্মিহা লা ইউহ্মাল মিন্হ শাইয়ুও ওয়ালাও কানা যাকুরবা; ইন্লামা তুনযিরুল লাজ্জিলা ইয়াখশাওনা রাব্বাহম বিল্ গাইবি ওয়া আকামুস ছালাতু, ওয়া মান্ তাযাক্কা ফাইন্লামা ইয়াতা যাক্কা লি নাফসিহি, ওয়া ইলাল্ লাহিল্ মাসির)।

ব্যাখ্যা

এই আয়াতটির ব্যাখ্যা লিখতে গিয়ে প্রথমেই যে প্রশ্নটি আসে সেই প্রশ্নটি হলো, এই বোঝা বহন করা বলতে কী বোঝানো হয়েছে? ইহা কীসের বোঝা? ইহা কি পাপের বোঝা? প্রশ্ন আসে, পাপ বলতে কী বুঝায়? কী কী রকম পাপের বোঝা হতে পারে তার তালিকাটি দেওয়া হয় নি। সুতরাং কেউ যদি ব্যাখ্যা লিখতে গিয়ে ধনসম্পদের বোঝা অথবা ধর্মরাশির মোহের বোঝায় ভারাক্রান্ত হওয়াটাকে বোঝায়, তা হলেও বলার কিছু থাকে না। কারণ যে যেভাবে বুঝতে পেরেছে সে সেইভাবেই ব্যাখ্যা লিখে যাবে। এর কমও নয়, এর বেশিও নয়। আপন চৈতন্যের অনুভূতির প্রখরতার গভীরতা যার যত বেশি তার ব্যাখ্যাটিও তত সুন্দর ও সাবলীল হয়। যে-নফসটি তথা জীবাত্মাটি একটি মানবদেহে অবস্থান করে, ধাপে ধাপে সে যখন যোবনের

দিকে এগিয়ে যেতে থাকে তখনই নফসের ভেতর লুকিয়ে থাকা খান্নাসটি তার অনেক রঙ-টঙের শাখা-প্রশাখাগুলো মেনে ধরে। ইহাকেই প্রলোভন অথবা মোহ বলতে চাই। ধনসম্পদ অর্জন করা মোটেই কোনো খারাপ বিষয় নয়, বরং ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গিতে ইহাকে সুন্নতও বলা যায়। কিন্তু যখন এই ধনসম্পদ অর্জনের পেছনে লোভ-মোহটি শত শত জিস্মা বের করে আপন নফসের বিবেকটিকে নাড়া দিতে থাকে তখনই সেই ধনসম্পদ অর্জন বিষয়টি বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। এই লোভের বোঝাটি প্রতিনিয়ত মনটিকে দহন করতে থাকে। ইহাকেই চিঠদাহ বলা হয়। পাপ-পুণ্যের সংশয়ে প্রতিনিয়ত চিঠদাহ হতে থাকে। অবৈধ লোভ-মোহ যখন ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকুরি ইত্যাদি বিষয়গুলোতে অবৈধ কিছু করে ফেলে তখনই আপন নফসে পাপ-পুণ্যের সন্ধেই এবং সংশয়, যাকে উচ্চাঙ্গ ভাষায় নিহুবে চিঠদাহ বলা হয়, উহাই বিবেকের শরীরে আঘাত করতে থাকে। অবশ্য যত আঘাতই করুক না কেন, সমাজ-জীবনে চলার পথে সততার বোরখাটি পরতে বাধ্য হয়। সে পরিষ্কার বুঝতে পারে যে তার বিবেকের ঘাড়ের উপর একটি পাপের বোঝা সিন্দাবাদের দৈত্যের মতো বসে আছে, কিন্তু প্রকাশ করতে নারাজ সে, কারণ, সমাজের বুকে ছোট হয়ে যাবার সম্ভব ভয় থাকে। সাধু হতে পারে না, কিন্তু সাধু সাজতে বাধ্য হয়।

অন্য মানুষের এবং পাড়া-পড়শি ও নিকটাত্মীয়দের ধনসম্পদ মেনে দিলে অথবা আমানত খেয়ানত করলে আল্লাহ মারফ করে দেবার বিধানটি রাখেন নি। যাদের হক আত্মসাৎ করা হয়েছে তারা যে পর্যন্ত মারফ না করবে সেই পর্যন্ত আল্লাহ মারফ করার বিধানটি রাখেন নি। এই একটি মাত্র বিষয়ের জন্য অধিকাংশ মানুষকে যে জাহান্নামে যেতে হবে ইহা সবাই কমবেশি বুঝতে পেরেও বুঝতে পারেন না। অনেকটা যেমন ধূমপানকারী

জ্ঞানে যে ধূমপান শরীরের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর, কিন্তু জ্ঞানবার পরেও ধূমপান করে। মাতাল জ্ঞানে যে মদ একটি ক্ষতিকারক বিষ, তারপরেও জেনেশুনে মদ পান করে। আরেক ধাপ নেমে যদি বলি যে যারা এতিমের হক মেরে দেয় তারা প্রথমেই ইসলাম হতে বাদ তথা খারিজ, আর যে ইসলাম হতে খারিজ সে তো মুসলমানই নয়।

আনুষ্ঠানিক এবাদত-বন্দেগির ফরজ ও সুন্নতগুলো পালন করাটা অনেকটা গাছের গোড়া কেটে মাথায় পানি ঢালার মতো। এ জাতীয় মানুষদের এবাদত-বন্দেগিগুলোকে কোরান লোক-দেখানো এবাদত-বন্দেগি বলে বার বার সতর্ক করে দিয়েছে। এই জাতীয় পাপের বোঝাগুলো তাকেই বহন করতে হবে এবং অন্যে বহন করবে না। এমনকি এই বোঝার কিছুটা বহন করার জন্য যদি সে অন্যকে ডাকে অথবা পরম নিকটাত্মীয়দেরকেও ডাকে, তবু এই বোঝার অংশীদারিত্ব নিতে কেউ রাজি হবে না।

আবার এই বোঝার বিষয়টির অন্যরকম ব্যাখ্যাও লেখা যায়। যেমন প্রথম পূর্ণাঙ্গ মানব তথা পরিপূর্ণ মানব হজরত আদম (আ.) এবং মা হাওয়াকে জ্ঞান্নাতে আলাহ গন্ধম খেতে মানা করেছিলেন এবং বলে দিয়েছিলেন যে, যদি ওই নিষিদ্ধ বৃক্ষের স্বাদ গ্রহণ করে তো দুনিয়া নামক কারাগারে ফেলে দেওয়া হবে। আদমের অন্তরে খান্নাসরূপী শয়তানের অবস্থানটি থাকুক অথবা না-ই থাকুক অথবা জ্ঞান্নাতের বাহিরেই থাকুক, এই শয়তানের কুমন্ত্রণায় অথবা প্ররোচনায়

অথবা ইচ্ছা করে, অথবা দুনিয়ায় মানুষের অবস্থান করার অভিপ্রায়টি পূর্ণ করার তরে আল্লাহর প্রেমে মত্ত হয়ে জেনেপ্তরে নিষিদ্ধ বৃক্ষের স্বাদ নামক বিষটি পান করলেন।

আল্লাহর ইচ্ছার কাছে আদমের ইচ্ছাটি কোরবানি করে দেবার নামই হলো প্রেম তথা ইশ্ক। আল্লাহর প্রেমে, আল্লাহর ইশ্কে হজরত আদম (আ) এতই মাতোয়ারা ছিলেন যে কঠিন শাস্তিগুলো হাসিমুখে মাথা পেতে নিলেন। আইনের যেখানে কবর ভালোবাসার সেখানে গুরু। তাই আমরা ইমামুল আউলিয়া বায়েজিদ বোস্তামির মতো বিরাট আল্লাহর গুলির মুখে বলতে শুনি, ‘মান আরাফাল্লাহা কাল্লা লেসানাহ’ অর্থাৎ ‘যে ব্যক্তি আল্লাহর পরিচয় লাভ করেন তিনি নির্বাক হয়ে যান।’ অবশ্য আমি অকপটে স্বীকার করব এবং মাথা নত করে মেনে নেব যে, এই কথাগুলো সবার পাতে দেওয়া যায় না। যাদের হজম করার শক্তি আছে তারাই নিতে পারবে। যদি কাঠ প্রকৃতির মন-মানসিকতা নিয়ে আল্লাহকে প্রশ্ন করি— শয়তানের প্ররোচনায় তথা শয়তানের কুমন্ত্রণায় জান্নাতে আদম এবং হাওয়া যে নিষিদ্ধ বৃক্ষটির আশ্বাদ গ্রহণ করেছেন এবং এই আশ্বাদ করার অপরাধে দুনিয়া নামক জেলখানায় ফেলে দেওয়া এবং বহুদিন দুজনের বিচ্ছেদের বিরহজ্বালার কান্না এবং অনেক বছর পর উভয়ের মিলন হওয়াটি দুনিয়ার দৃষ্টিতে একটি বেদনাদায়ক কাহিনী, একটি আঘাত

করা ইতিহাস- যদি প্রশ্ন করি আদম এবং হাওয়া জান্নাতে মানা-করা কাজটি করার দরুনই দুনিয়া নামক জেলে ফেলে দিয়ে আল্লাহ সূক্ষ্ম বিচারটিই করেছেন তথা আল্লাহ যে ‘আদিল’ ইহাই প্রমাণ করেছেন। নিষিদ্ধ বৃক্ষের স্বাদটি দুনিয়াতে নয়, বরং জান্নাতে গ্রহণ করার দরুনই দুনিয়ায় পাঠিয়ে দেওয়া হলো। অধম লিখক এবং পৃথিবীতে বাস করা ছয় শত কোটি মানুষের একজনও তো জান্নাতে যায় নি, নিষিদ্ধ বৃক্ষের স্বাদ গ্রহণ করা তো বহু দূরের কথা : তা হলে আমরা কেন আদম আর হাওয়ার অমান্য করার বিষয়টি বহন করার জন্য দুনিয়াতে এলাম? ধরে নিলাম আল্লাহর মহব্বতেই আদম আর হাওয়া ইচ্ছা করেই গন্ধমটি খেয়েছেন, কিন্তু আমরা তো জান্নাতেই যাই নি, গন্ধম খাওয়ার প্রশ্নটি বহু দূরের কথা- তা হলে জান্নাত-জাহান্নামে যাবার প্রশ্নে এই কঠিন পরীক্ষার মুখোমুখি আমরা কী কারণে হলাম? হজরত আদম (আ.) - হাওয়া আল্লাহর প্রেমে ইচ্ছা করেই গন্ধম খেলেন, কিন্তু আমরা যদি ইচ্ছা করে গন্ধমটি না খাই তথা আইনজের ভূমিকাটি পালন করি, তা হলে এর উত্তরটি কী হবে? ধরে নিলাম, আমরা কেউ ইচ্ছা করে খাবো না, তা হলে কী হবে?

‘যে কেহ নিজের নফসকে পবিত্র করে সে তো পবিত্র করে নিজেরই নফসের মঙ্গলের জন্য।’ আল্লাহর এই

কথাগুলো ব্যাখ্যার পরিণামটি আমার মনে হয় সুফিবাদেরই ইঙ্গিত বহন করে।

কোরান-এ সালাতের উল্লেখ : ৬৯

কোরান-এর ৩৫ নম্বর সূরা ফাতিরের ২৯ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে : নিশ্চয়ই যাহারা তেলাওয়াত করে আল্লাহর কেতাব এবং সালাত কায়েম করে এবং ব্যয় করে যে রেজেক আমরা দিয়াছি গোপনে এবং প্রকাশ্যে তাহারাই এমন একটি ব্যবসায়ের আশা রাখে যাহার লোকসান নাই। (ইন্নালা লাজিনা ইয়াত্বুননা কিতাবাল্লাহি ওয়া আকামুস সালাতা ওয়া আনফাকু মিম্মা রাজাক্নাহম সিররাও ওয়ালা নিয়াতাই ইয়ারজুন হিজারাতাল্লান তাবুর)।

ব্যাখ্যা

এখানে একটি বিষয় লক্ষ্য করার মতো আর উহা হলো ‘কোরান তেলাওয়াত করে’ না বলে ‘কেতাব তেলাওয়াত করে’ বলা হয়েছে। ‘কেতাব’ শব্দটির দ্বারা প্রধানত দুই রকম অর্থ করা যায় : একটি কোরান আর অপরটি আল্লাহর প্রতিনিয়ত বিকাশমান সৃষ্টিজগতের রহস্যটিকে তেলাওয়াত করা তথা পাঠ করা। এই পাঠ করাটিকেও আবার দুই ভাগে ভাগ করা যায় : একটি মুখে উচ্চারণ করে পাঠ করা এবং বিজ্ঞানীদের প্রকৃতির বৈচিত্র্য পাঠ করা, অপরটি ধ্যানসাধনার মাধ্যমে আল্লাহর নুরে নুরময় হয়ে আল্লাহর চলমান বিকাশ ও প্রকাশকে পাঠ

করা। একটি চোখ খুলে পড়া যায় অথবা কণ্ঠস্থ থাকলে চোখ বন্ধ করেও পড়া যায়। উহাই কোরানুল মবিন। এই কোরান-কে মৌখিকভাবে পাঠ করতে হলে আরবি ভাষাটি জানতে হয় অথবা যে কোনো ভাষায় ইহার উচ্চারণগুলো লিখে পাঠ করা যায়। কোরান পাঠ করার বিষয়টিতে সার্বজনীনতা থাকলেও আরবি ভাষায় কিছুটা আকরিক জ্ঞানের প্রয়োজন হয়। তাই আল্লাহর সার্বজনীনতার ভাবটি তুলে ধরার জন্য কেতাব তেলাওয়াত করতে তথা পাঠ করতে পারে যারা, তাদের কথাটি এখানে বলা হয়েছে। মেজাজি অর্থেও ইহার ব্যাখ্যা দেওয়া যায়। আবার হাকিকি অর্থের ব্যাখ্যাটি হলো আসল ব্যাখ্যা, যদিও হাকিকি ব্যাখ্যাটি অসীম এবং দুনিয়ার সব গাছগুলো যদি কলম হয় তবুও— হাকিকি কেতাবের কিছুটা তেলাওয়াত করা যায়— কিছু ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করাটি প্রায় অসম্ভব বলেই মনে হয়।

আল্লাহর কোরান যে বিশ্বায়ের বাবার বাবা এবং জগতের একটি অতুলনীয় গ্রন্থ (ধর্মের সাইনবোর্ড ফেলে নিরপেক্ষ হয়ে লিখছি) ইহা

গভীর মনোযোগ সহকারে একাগ্রচিত্তে ৩০/৪০ বছর পাঠ করলেই মর্মে

মর্মে উপলব্ধি করা যায়। অধম লিখক প্রায় ৪০টি বছর বহু কোরান-এর তফসির, বহু আরবি ডিকশনারি এবং বহু কোরান-এর লোগাত পাঠ করার পর এই সিদ্ধান্তে

উপনীত হয়েছি এবং কোরান বার বার পাঠ করে একটি মূল্যবান বিষয় জ্ঞানতে পেরেছি আর সেই বিষয়টি হলো, অধম লিখক কোরান-এর কিছুই বুঝতে পারি নি। অবশ্য প্রথম ১০/১২ বছর কোরান পাঠ করে এবং কোরান-এর বিভিন্ন তফসির ঘেঁটে এই মনে হয়েছিল যে, কোরান বিষয়টিতে ভালো জ্ঞান অর্জন করেছি। অধম লিখকের এই কথাগুলো মোটেই রূপক ভাষার আশ্রয় নিয়ে বলছি না, অথবা জ্ঞানীদের মতো বিনয়ের ভাষায় বলছি না, অথবা দার্শনিক সফ্রেটিস এবং বিজ্ঞানী নিউটনের মতো করে মোটেই বলছি না, বরং একদম সাদামাটা ভাষায় সরল মনে মনের কথাগুলো তুলে ধরলাম।

এই আয়াতে সালাত তথা যোগাযোগ তথা সংযোগটি যারা কাসেম করে এবং পরে বলা হয়েছে, ‘এবং আমরা (এখানে আল্লাহ বহুবচন ব্যবহার করেছেন একবচন নয়, কারণ রেজেক দেবার সময় কোরান-এর প্রতিটি স্থানে আল্লাহকে বহুবচনে পাওয়া যায়, একবচনে নয়।) যে রেজেক তাহাদেরকে দিয়াছি উহা হইতে ব্যয় করে।’ রেজেক বিষয়টিতেও মেজাজি রেজেক এবং হাকিকি রেজেক দুইটিই পাওয়া যায়। মেজাজি রেজেক বলতে আমরা ধন-সম্পদকেই বুঝে থাকি। কিন্তু হাকিকি রেজেক বলতে একটি মানুষকে অন্ধকার জগত হতে নুরানি জগতে নিয়ে আসা বুঝায়। কারণ কোরান-এর অনেক স্থানে অনেকবার আল্লাহ বলেছেন যে তিনি বেহিশাব রেজেক দান করেন। মনে রাখতে হবে যে আল্লাহর কোরান মানুষের কথা নয়, সূতরাং কোরান-এর প্রতিটি শব্দের ভেতর কিছু না কিছু রহস্য লুকিয়ে থাকে। দুনিয়ার বৈষয়িক ধনসম্পদ কখনই বেহিশাব তথা হিশাব ছাড়া হতেই পারে না। কারণ সমগ্র

পৃথিবীতে কত কোটি টন চাউল, কত কোটি টন গম, আলু, কাসাভা, শাক-সজ্জি, মাছ-মাংস ইত্যাদির হিসাবটি এই আধুনিক যুগে দেওয়া একটি মামুলি ব্যাপার—যেখানে দুনিয়ার দৈর্ঘ্য, প্রস্থ এবং গুরুত্ব কতটুকু তারও হিসাবটি পাই, সুতরাং ‘বেহিশাব রেজেক্ট দেওয়া হয়’ কথাটিতে মেক্সিকো রেজেক্টের কথাটি বলা হয় নি বলেই মনে হয় (আমার ভুলও হতে পারে)।

এখানে আরেকটি বলে রাখা ভালো যে, মেক্সিকো রেজেক্টটি প্রকাশ্যে ব্যয় করা যায়, কিন্তু হাকিকি রেজেক্টটি গোপনে ব্যয় করতে হয়। হাকিকি রেজেক্টটি প্রকাশ্যে ব্যয় করার বিধানটি নাই। তাই আমরা এখানে দেখতে পাই যে, মেক্সিকো রেজেক্ট এবং হাকিকি রেজেক্ট দুটোরই উল্লেখ করা হয়েছে। অধম লিখকের জ্ঞান মতে, দুনিয়াতে এমন কোনো ব্যবসা নাই যে-ব্যবসা লোকসানি তথা ক্ষতির মুখোমুখি না হয়। সুদের ব্যবসারটিকে ব্যবসা নাম দিয়ে ব্যবসারটিকে অর্পণ করিতে চাই না। কারণ যারা আসল সুদখোর (ব্যংকের মুনাফার কথাটি বলছি না) তাদেরকে কীটপতঙ্গও ঘৃণা করে। যদি অধম লিখককে পরীক্ষা করতে চান তা হলে একটি পরীক্ষা করেই দেখুন। সুরা বনি ইসরাইলের ৭৮ নম্বর আয়াতটি লিখে তিনজন সুদখোরের নাম (ব্যংকের মুনাফাখোরদের কথা নয়, যারা প্রতি মাসে ১০০ টাকার সুদ ১০/১৫ টাকা করে নেয়, এরাই আসল সুদখোর) তাদের মায়ের নামসহ একটি কাগজে লিখে সেই কাগজটি ডালিম গাছে, কদবেল গাছে, গরুর খুরায়, পোকা লাগা ইত্যাদি বিষয়গুলোতে ঝুলিয়ে দেন, দেখতে পাবেন গাছের এবং গরুর খুরা হতে পোকাগুলো সরসর করে নেমে গেছে। অধম লিখক এই কাজটি করার পর কাজের ফলটি দেখে অনেকটা নির্বাক হয়েছিলাম। সুতরাং যে ব্যবসায়ে লোকসান হবার প্রশ্নই ওঠে না সেই ব্যবসারটি হলো হাকিকি ব্যবসা, যা আল্লাহর ওলিরা করে থাকেন। তাই বলা হয়ে থাকে যে আল্লাহর ওলিদের দিয়েই আল্লাহর পরিচয় কিছুটা জানা যায়।

কোরান-এ সালাতের উল্লেখ : ৭০

কোরান-এর ৩৯ নম্বর সূরা যুমারের ৯ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে : যে ব্যক্তি রাত্রির প্রতিটি প্রহরে সেজদায় থাকিয়া এবং দাঁড়াইয়া এবাদত করে, আখেরাতকে ভয় করে এবং তাহার রবের রহমত আশা করে, বলো, যাহারা জানে এবং যাহারা জানে না তাহারা কি সমান? উলুল আলবাবরাই (জ্ঞানী সম্প্রদায়ের লোকেরাই) তো উপদেশ গ্রহণ করে। (আম্মান হওয়া কানিতুন আনায়াল লাইলি ছাজ্জিদাও ওয়া কায়িমাই ইয়াহ্যারুল আখিরাতা ওয়া ইয়ারজু রাহমাতা রাব্বিহি কুল হাল ইয়াস্তাওযিল লাজিনা ইয়ালামুনা ওয়াল লাজিনা লা ইয়ালামুনা, ইন্নামা ইয়াতাযাক্করু উলুল আলবাব)।

ব্যাখ্যা

এখানে একটু ভালো করে লক্ষ করলেই দেখতে পাবেন এবং মাথার মগজে একটি চৈতন্যের মৃদু আঘাত লাগবে যখন দেখতে পাবেন যে, এবাদত-বন্দেগি এবং সেজদার অবস্থা তথা আনুগত্যের হালের অবস্থানটি দিনের বেলায় বর্ণনা করা হয় নি। কারণ দিনের বেলার এবাদত-বন্দেগি দেখা যায়, অথবা অন্য কিছু অজ্ঞাত গোপন বিষয় আছে যার জন্য দিনের বেলায় এবাদত না করে রাত্রির প্রতিটি প্রহরের কথা বলা হয়েছে। দিনের বেলায় বৈষয়িক বিষয়ের দৃশ্যগুলো আপন নফসের উপর অনেক রকম আঘাত দিতে পারে। ষড়রিপুর ডিশ

অ্যান্টেনাগুলো বৈষয়িক বিষয়গুলোকে দিনের বেলায় তাড়াতাড়ি আঘাত করে। তাই আমরা দেখতে পাই, যত এবাদত-বন্দেগির কথা বলা হয়েছে এবং মেরাজে গমনের কথাটি বলা হয়েছে এবং কদর তথা শক্তিশালী দিনের কথা না বলে কদর তথা শক্তিশালী রাত্রির কথা বলা হয়েছে। মেজাজি দৃষ্টিভঙ্গিতে দিনের বেলাতেও এবাদত-বন্দেগি করার কথাটি পাই। কিন্তু রহস্যলোকে প্রবেশ করার জ্ঞানটি অর্জন করার জন্য রাত্রির প্রতিটি প্রহরে এবাদত-বন্দেগি করার উপদেশটি দেওয়া হয়েছে। হাকিকি এবাদত তথা ধ্যানসাধনাটি অন্ধকারে একদম নির্জন স্থানে একাকী করতে হয়। সেই মহা উদাহরণটি, মহানবি জাবালুন নুর পর্বতের আড়াই হাজার ফুট উঁচুতে হেরাণ্ডহায় পনেরটি বছরের ধ্যানসাধনাটি করার মাধ্যমে উন্মতদের জন্য এবং জ্ঞানী লোকদের জন্য রেখে গেছেন।

মহানবি কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান করেন। যিনি কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান করেন তাঁর জন্য শিক্ককের তথা পীরের কোনো প্রয়োজন হয় না। আবহাওয়াবিদেরা বলেন যে, ঝড়ের মূল কেন্দ্রে কোনো ঝড় থাকে না। পাথরের তৈরি ডাল ভাঙার জাতাকলের মাঝখানে কোনো ডাল ভাঙে না। তারপরেও মহানবি তাঁর উন্মতদের শিক্ষা দেবার জন্য, নিজে প্রথমে পনেরটি বছর নির্জন হেরাণ্ডহায় ধ্যানসাধনা করেছেন। এই

ধ্যানসাধনাটি মহানবির জন্য মোটেই প্রযোজ্য নয়, বরং তাঁর উন্মতদের শিক্ষা দেবার জন্য প্রযোজ্য। কারণ মহানবি তখনও নবি যখন আদি পিতা আদম (আ.) ও আদি মাতা হাওয়া মাটি ও পানিতে অবস্থান করেছেন। ৪০ বৎসর বয়সে মহানবি যে নবুয়ত পেয়েছেন ইহা অতীব সত্য, কিন্তু ইহা মেজাজি সত্য, হাকিকি সত্য নয়। কারণ কোরান যেখানে বলছে যে মহানবি জীবনেও একটি কথা নিজের পবিত্র নফস হতে বলেন নি, বরং আল্লাহ যা বলতে বলেছেন তাই তিনি বলেছেন, সুতরাং মহানবির জাহেরি জাত-নুরের দেহটিতে যতদিন অবস্থান করেছেন ততদিনই তিনি নবি। সুতরাং মহানবির জাহেরি জন্মটিতেই তাঁর আজন্ম নবিত্বের পরিচয় পাই।

আরেকটি প্রশ্ন থেকে যায় আর সেই প্রশ্নটি হলো, মহানবি কি একটি দেহের মধ্যেই সীমাবদ্ধ? যেখানে বিশ্ববিখ্যাত ওলি-আল্লাহ হজরত বাবা আলাউদ্দিন কালিয়ার সাবেরি বলছেন, ‘খুদবা খোদ আজাদ বুদি খোদ গেরেফতার আমুদি’ অর্থাৎ ‘আপন ইচ্ছায় দেহ হতে যেমন বেরিয়ে যাওয়া যায়, তেমনি দেহের বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া যায়।’ সুতরাং দেহটি যতই নুরানি হোক, সেই নুরানি দেহের মধ্যেই মহানবির শান-মান-জালুয়াকে সীমাবদ্ধ করা যায় না।

আরেকটি প্রশ্ন থেকে যায় যে, আল্লাহ বলছেন : আমরা তোমার শাহারগের নিকটেই আছি। সুতরাং মহানবির সঙ্গেই তো আল্লাহ আছেন। এর বেশি ব্যাখ্যা করলে বিষয়টি একদম ঊলঙ্গ হয়ে যায় তাই জ্ঞানীদের জন্য ইশারাই যথেষ্ট। এখানে সাধক না বলে যে কোনো ব্যক্তি, যিনি রাতের অন্ধকারের প্রতিটি প্রহরে সেজদায় থাকেন ও দাঁড়িয়ে আনুগত্য প্রকাশ করেন এবং আখেরাতকে ভয় করেন এবং রবের রহমত পাবার আশা করেন, সেই ব্যক্তিটি তো কখনই তাদের সম্মান হতে পারে না অন্য যারা এইভাবে এবাদত-বন্দেগি করে না। তাই কোরান বলছে, যারা জানে এবং যারা জানে না, তারা কোনোদিন কোনো অবস্থাতেই সম্মান নয়। তারপর বলা হয়েছে, আলবাবরাই তথা যারা এই বিষয়গুলো জানবার আগ্রহ প্রকাশ করে তারাই এই উপদেশগুলোকে মেনে নেয়।

পরিশেষে একটি কথা না বলে পারলাম না আর সেটা হলো, আনুগত্য প্রকাশ করতে গেলেই দাঁড়াবার কথাটি উল্লেখ করা হয়েছে। বসে বসে আনুগত্য অবশ্যই প্রকাশ করা যায়, কিন্তু দাঁড়িয়ে আনুগত্য প্রকাশ করার কথাটি বেশি পাই। সুতরাং মহানবির আনুগত্য প্রকাশের জন্য দাঁড়িয়ে কেয়াম করবো, না বসে কেয়াম করবো? পাঠক বাবা-মায়াদের হাতে এই বিচারের ভারটুকু তুলে দিলাম। তারপরেও একটি কথা থেকে যায় যে, আপনার তকদির আপনাকে বসাতেও পারে, দাঁড়াতেও পারে। কারণ জন্মের আগেই প্রতিটি মানুষের তকদির নির্ধারিত। এই নির্মম সত্যটি মেনে নেওয়াও তকদির, আবার না মেনে নেওয়াটাও তকদির।

অধম লিখকের ইঁহা একটি নিজস্ব মত আর তা হলো, দিনের আলোকে গাছ-ভরা আম, গাছ-ভরা লিচু, গাছ-ভরা কমলা ইত্যাদি ফলগুলো সহজেই দেখতে পাই, কিন্তু রাতের অন্ধকারটি যখন ছেয়ে যায় তখন আর আম, লিচু, কমলা, পেঁপে ইত্যাদি ফলগুলো দেখা যায় না। দিনের বেলায় সব কিছু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখা যায়, অথচ রাতের আঁধারে গাছ-ভরা আমের একটি আমও দেখা যায় না। ছোট পাহাড়ের টিলার মতো অন্ধকারের বোরকা দিয়ে যেন ঢেকে রাখা হয়েছে। মানুষের ভিতরের রিপুগুলো রাতের আঁধারে অনেকখানি দুর্বল থাকে, তাই রাতে আল্লাহর সঙ্গে যোগাযোগ তথা সংযোগ তথা সালাতে দাঁড়াবার উপদেশটি পাই। তা ছাড়া প্রায় আল্লাহর ওলিরাই সারা রাত জেগে সালাত ও জিকিরে মগ্ন থাকেন। তাই হয় তো এবাদতের মোক্ষম সময় হিসেবে রাতের অন্ধকারকে বেছে নেওয়া হয়েছে।

জাগ্রত অবস্থায় বাহ্যিক দৃশ্যগুলো আমরা দেখতে পাই, পরক্লে ঘুমিয়ে গেলে আর দেখতে পাই না, তবে স্বপ্নে দেখার প্রশ্নটি বাদ দিলাম। একটি মানুষ রহস্যলোকে প্রবেশ করার ধ্যানসাধনাটি করুক চাই না করুক, কিন্তু রহস্যলোকে তাকে যেতেই হবে। একটি ঘটনা দিয়ে রহস্যলোকে তাকে নিয়ে যাবে, সেই ঘটনাটির নাম মৃত্যু। মৃত্যু কখনই ধ্বংস নয়। সূতরাং মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করার কথাটি বলা হয়েছে, কিন্তু ধ্বংস হয়ে যাবার কথাটি একবারও বলা হয় নি। যিনি বা যারা জীবিত থাকতেই রহস্যলোকে প্রবেশ করতে পেরেছেন, তাদেরকেই লক্ষ করে বলা হয়েছে, 'মৃত্যু

কাবলা আনতা মৃত' তথা 'মরার আগে মরে যাও।' মৃত্যু অর্থ ধ্বংস নয় বটে, মৃত্যুকেই আবার কোরান কেয়ামতি বলেছে। তবে মৃত্যু নামক ঘটনাটিকে কেয়ামতে সগিরা তথা ছোট কেয়ামত বলা হয়েছে। কোরান বলেছে, কেয়ামতের সঙ্গে সঙ্গে তোমাকে উঠানো হবে। এখানে নফস তথা জীবাত্মাটিকে উঠানোর কথা বলা হয়েছে, দেহটির কথা বলা হয় নি, কারণ দেহটি হলো নফস তথা জীবাত্মার একটি পোশাক মাত্র। আমরা যেমন পুরনো পোশাক ফেলে দিয়ে নতুন পোশাক দেহে ধারণ করি, সে রকম নফস তথা জীবাত্মাটিও দেহ নামক পোশাকটি বার বার বদলায়। হিন্দুশাস্ত্রে ইহাকে পুনর্জন্মবাদ বলা হয়। ইসলামে ইহাকে আরবি ভাষায় কেয়ামত বলা হয়। এই কেয়ামতটি বিবর্তনবাদের বলয়ে বাধা থাকে। সুতরাং বিবর্তনবাদের রহস্যটি না বোঝার দরুন অনেক রকম চিন্তার অনেক রকম কথার ফসলগুলো আমরা অহরহ দেখতে পাই।

সম্পূর্ণ একটি অপ্রাসঙ্গিক কথা বলতে চাই। বলতে চাই যে, অধম লিখকের বইটি পড়ে যদি মনে করেন যে কোরান-এর তফসিরটি করা কর্তব্য তা হলে অধম লিখককে আর্থিক সাহায্য করতে পারেন। কোরবানির চামড়ার টাকা, জাকাতের টাকার সামান্য একটি অংশ কি আপনাদের কাছে চাইতে পারি না?

কোরান-এ সালাতের উল্লেখ : ৭১

কোরান-এর ৪২ নম্বর সূরা আশ্ শুরার ৩৮ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে: এবং যাহারা তাহাদের রবের জন্য সাদ্ধা দেয় এবং সালাত কায়েম করে, এবং পরামর্শের মাধ্যমে নিজেদের কার্যসম্পাদন করে এবং আমরা যে রেজেক দিয়াছি তাহা হইতে ব্যয় করে (ওয়াল লাজিনাস তাজাবু লিরাক্বিহিম ওয়া, আকামুস্ সালাতা ওয়া

আমরুহম শূরা বাইনাহম ওয়া মিম্মা রাযাক্নাহম
ইয়ন্ফিকুন)।

ব্যাখ্যা

প্রথমেই বলতে হয় যে রবের ডাকে সাড়া দেওয়াটি দুই প্রকার : একটি মেজাজি সাড়া দেওয়া এবং অপরটি হাকিকি সাড়া দেওয়া। রবের জন্য সাড়া দেওয়াটি কখনই একটি মামুলি বিষয় নয়, কারণ আপন নফস তথা জীবাত্মার সঙ্গে খান্নাসরূপী শয়তানটিকে তাড়িয়ে দেবার পরই রবের জন্য সাড়া দেওয়া যায়। অন্যথায় সারা জীবন চীৎকার করলেও কোনো সাড়া পাবার আইনটি রাখা হয় নি। আরও একটি কথা অনিচ্ছায় পাঠকদেরকে জানিয়ে রাখতে চাই। আপন নফসের সঙ্গে খান্নাসটিকে জড়িয়েই বৈষয়িক সভ্যতা (ম্যাটেরিয়াল সিভিলাইজেশন) ধাপে ধাপে গড়ে উঠেছে। বৈষয়িক বিজ্ঞানের চোখ-ধাঁধানো বিস্ময়কর চলমান আবিষ্কারগুলো সবই কিছু আপন নফসের সঙ্গে খান্নাসকে রেখেই করা হয়েছে। শুনলে মনে কষ্ট হয়, বোবা বিদ্রোহের একটি উত্তাপ উখিত হতে চায়, কিন্তু ইহা যে একটি নির্মম সত্য, উলঙ্গ সত্য। আবার একটু সান্ত্বনাটিও তো পাই। কখন পাই? যখন কোরান হতে জানতে পারি যে নবি দাউদ (আ.) এবং নবি সোলায়মান (আ.) জিনদের দিয়েই জেরুজালেম নগরী এবং বায়তুল মোকাদ্দাসটি বানিয়েছিলেন। যে বায়তুল

মোকাদ্দাসটি জিন দ্বারা বানানো হয়েছিল
 উহা মেজাজি বায়তুল মোকাদ্দাস : ভুলেও চিন্তা
 করবেন না যে উহা হাকিকি বায়তুল মোকাদ্দাস।

যে বিজ্ঞানী ৬০০০ আলোক বর্ষ দূরে অবস্থিত
 নিউট্রন নক্লরটি আবিষ্কার করেছেন, যে নক্লরটির এক
 চায়ের চামচ উপাদান পৃথিবী গ্রহে এনে মাপলে এর
 ওজন হয় ১০০ কোটি টন, সেই বিজ্ঞানী কিছু আপন
 নফসের সহিত খান্নাসকে রেখেই নিউট্রন নক্লরটি
 আবিষ্কার করেছিলেন। আল্লাহর প্রতিটি বিষয়ে স্থূলতার
 অভ্যন্তরে সুক্সাতিসুস্ক রহস্যময় ইঙ্গিতগুলো লুকিয়ে
 থাকে। কেউ ধরতে পারে, কেউ পারে না। ধরা এবং না
 ধরাটিও তকদির। এই কথাগুলো কোরান-এর সুরা
 মোমিনে স্পষ্ট করে বলে দেওয়া হয়েছে। আপন রবের
 ডাকে সাড়া দেওয়া এবং আপন রবকে সাড়া দেবার
 জন্য ডাকা— দু'টোই ধ্যানসাধনার মাধ্যমটি ছাড়া এক
 প্রকার অসম্ভব (মাদারজাত ওলি, মাজ্জুব এবং
 আবদালদের কথা আলাদা)।

দুনিয়ার ভিখারি সারাদিন দ্বারে দ্বারে ঘুরেও সহজে
 সাড়া পায় না, আর এটা তো রবরূপী আল্লাহর সাড়া
 পাবার জন্য বলা হয়েছে। বাক্যটি খুবই ছোট, কিন্তু
 ইহার গভীরতা ব্যাখ্যা করলে দেখা যায় বিরাট একটি
 লুকানো বিষয়। তবে এটিকে ওপেন সিক্রেট বলা যায়।
 অনেকটা এই রকম কথা যে, এই সামান্য আর্টল্যান্টিক

সাগরটি পারি দিতে পারলেই আমেরিকা দেখতে পাবেন। আকাশযানের কথা বলছি না, ষ্টিমারে করে গিয়েই দেখুন না কত বড় ঠেলা সামলাতে হয়! অথচ এই তো আর্টল্যান্টিকের ওপারেই আমেরিকা। শুনলে মনে হয় যেন ছেলের হাতের মোয়া, কিছু ব্যাপকতার প্রশ্নে এইটা যে কত বিশাল এবং কত ঘাত প্রতিঘাতের মুখোমুখি হতে হয় তা কেবল ষ্টিমারের যাত্রীরাই হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারে।

বাক্যটি মেজাজি তথা ছোট, কিছু হাকিকি তথা আসল রূপটি যে কত ব্যাপক এবং পদে পদে হৌচট খেতে হয় তা যারা ধ্যানসাধনা করেছেন বা করেন তারাই মর্মে মর্মে বুঝতে পারেন। কী সুন্দর করে বলা হয়েছে, যারা তাদের রবের জন্য সাড়া দেয়! কিছু এই সাড়া দেওয়াটি কখনই এবং কোনো কালেই নিজের নফসের ভিতরে আরেকজন খান্নাস থাকলে পাওয়া তো দূরের কথা, বরং সাড়া পাওয়ার আইনটিও রাখা হয় নি।

রবরূপী আল্লাহর জন্য সাড়া দিতে চাও? তা হলে যোগাযোগ তথা সংযোগ তথা আরবি ভাষায় সালাতটিকে দাঁড় করাও, তথা সালাতের মধ্যে ডুবে যাও, তথা ওয়াক্জিয়া নামাজে নয়, বরং দায়েমি সালাতের মধ্যে ডুব দাও। মহানবি বলেছেন, ‘আস্‌সালাতুদ দাওয়ামি আফজালুম মিনাল সালাতিল

‘ওয়াক্তি’ অর্থাৎ, ‘ওয়াক্তিয়া নামাজ হইতে দায়েমি নামাজ অনেক আফজাল তথা মর্যাদাপূর্ণ।’ কোরান-এর ৭০ নম্বর সূরা মারেজের ২৩ নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলছেন, ‘আল্লাজিনা হুম আলা সালাতিহিম দায়িমুনা’ অর্থাৎ যাহারা তাহাদের সালাতের উপর দায়েমিভাবে দাঁড়ায়, তথা সর্বক্ষণ সালাতের মধ্যে ডুবে থাকে, তথা যোগাযোগের মধ্যে তথা সংযোগের মাঝে নিজের নফসটিকে সজাগ রাখে তথা নফসের সঙ্গে খাল্লাসটিকে তাড়িয়ে দেবার ধ্যানসাধনায় মগ্ন থাকে তাঁরাই এই অবিরাম ধ্যানমগ্নতায় অবিরাম ধৈর্যধারণের মাধ্যমে যখন রবরূপী আল্লাহর সাড়া পাবার উপযুক্ত হয় তখনই রবরূপী আল্লাহ প্রতিনিয়ত সাড়া দিচ্ছে থাকেন। ইহা দৃশ্যমান জগতের (ফেনোমেনাল ভিশন) বিজ্ঞান নয়, বরং আপন খাল্লাস মেশানো প্রবৃত্তিটির বিরুদ্ধে অবিরাম জেহাদ করার সাধনা।

রবরূপী আল্লাহর জন্য কেউ যদি উপযুক্ত হতে চায় তা হলে তাকে অবশ্যই অবিরাম সালাতে দাঁড়াতে হবে। এখানে আমরা রবের পরিচয় এবং সালাতের পরিচয়টি মেজাজি-রূপেও পাই আবার হাকিকি-রূপেও পাই। যে যতটুকু জ্ঞানের বোঝা বহন করার উপযুক্ত আল্লাহ তাকে তার বেশি বোঝা চাপিয়ে দেন না, এবং ইহাও কোরান-এর একটি উপদেশ।

রবরূপী আল্লাহকে কেমন করে পাওয়া যায়, কীভাবে ধ্যানসাধনা তথা মোরাকাবা-মোশাহেদাটি করতে হবে, এই বিষয়ের সঙ্গে যারা যুক্ত আছেন বা থাকেন, তাদের সঙ্গেই শলাপরামর্শ করার আদেশটি দেওয়া হয়েছে। ঘোর দুনিয়াদারদের কাছে পরামর্শটি চাইতে বলা হয় নি, কারণ ঘোর দুনিয়াদারদের কাছে পরামর্শটি নিতে গেলে কাঁচকলা পাওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় নাই। একটু ভালো করে লক্ষ করে দেখুন আল্লাহর সবগুলো আদেশ বর্তমান কালে দেওয়া হয়েছে। তা হলে আল্লাহর রহস্যলোকে প্রবেশ করতে হলেও বর্তমান কালেই করতে হয়। তাই কোরান অন্যত্র বলেছে : যে দুনিয়াতে অন্ধ সে মরার পরও (আখেরাতে) অন্ধ থাকবে। আল্লাহ বর্তমান কাল দিয়ে আদেশ-নিষেধ করছেন আর পাওয়াটা যদি বাকি হয়, তথা মরে যাবার পর পাওয়া যাবে বলা হয়, তা হলে খনার বচনটি মনে পড়ে যায়, আর সেই বচনটি হলো, বাকির নাম ফাঁকি।

মহানবি যে হেরাণ্ডহায় নির্জনে ১৫টি বছর ধ্যানসাধনা করেছেন তার ফলাফলটি কি আল্লাহ বাকিতে দিয়েছেন, না নগদ দিয়েছেন? মহানবি নবুয়ত নগদই পেয়েছেন, বাকিতে নয়; আল্লাহর কোরান নগদই নাঙ্কেল হয়েছে, বাকিতে নয়; জিবরাইল আমিনের দর্শন নগদই হয়েছে, বাকিতে নয়— তা হলে মহানবিকে আন্ত

রিকভাবে অনুসরণ করে বাকিতে পাবার কথাটি বড়ই বেমানান।

জন্মচক্রে বার বার কেয়ামতের মুখোমুখি হতে হতে যেদিন রবরূপী আল্লাহকে পাবার উপযুক্ত হয় তখনই পাওয়া যায়, অন্যথায় তকদির বড়ই নিষ্ঠুর। মনকে তৃপ্ত করার জন্য মনের মুখে হালুয়া-রুটি দেবার জন্য রবরূপী আল্লাহর নামে অনেক রকম মনগড়া ধানাই-পানাই-র কথাগুলো যুক্তিতর্কের মেকি মুখোশ পরিয়ে বিবেককে ফাঁকি দেবারি ডগডগি বাজানো হয়। এতেই বা কাকে দোষ দেব? কারণ সবই তো তকদিরের খেলা।

আবার বলা হয়েছে, আল্লাহ তাদেরকে (সবাই আমভাবে বলা হয় নি) যে রেজেক দেওয়া হয়েছে উহা হতে ব্যয় করতে বলেছেন। চেয়ে দেখুন, এখানে ‘আনা’ তথা আমি শব্দটি নেই, বরং ‘নাহনু’ তথা আমরা তথা বহুবচনটি আল্লাহ ব্যবহার করেছেন। আগেই বলেছি যে, রেজেক বণ্টন করার প্রশ্নে আল্লাহ বহুবচনের রূপটি ধারণ করেন। এবং এই রেজেক ব্যয় করার প্রশ্নেও একটি বলয়, একটি দেয়াল, একটি প্রাচীর দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়েছে। যারা সাধক, যারা আল্লাহকে পাবার সাধনায় সব কিছু ছেড়ে দিয়ে ধ্যানমগ্ন হয়ে আছেন, কেবল তাদের জন্যই রেজেকটি ব্যয় করার কথাটি বলা হয়েছে। এই রেজেকটির প্রশ্নেও মেজাজি রেজেক এবং হাকিকি রেজেক কথা দু’টো এসে যায়। কী নিখুঁতেরও নিখুঁত কোরানুল করিম! কী মহা বিজ্ঞানের বিজ্ঞান কোরানুল হাকিম! কেউ বুঝতে পারে, কেউ বুঝতে পারে না। পারা এবং না পারা দু’টোই তকদরি। যদি

রাগাবিত হন এই কথাগুলো পড়ে, তা হলে এই রাগাবিত হওয়াটাও তকদির। এই কথাগুলো পড়ে যদি খুশি হন, এই খুশি হওয়াটাও তকদির। এই বইটির ব্যাপক প্রচারের প্রয়োজন আছে বলে মনে করেন তো এটাও তকদির। আবার যদি মনে করেন, কী আজীবাজে উল্টাপাল্টা সব কথা লিখে রেখেছে, তা হলে এটাও তকদির।

কোরান-এ সালাতের উল্লেখ : ৭২

কোরান-এর ৫০ নম্বর সূরা ক্বাফের ৩৯-৪০ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে : সুতরাং ধৈর্যধারণ করো উহার যা হা বলে তাহার উপরে এবং তসবিহ পড়ো তোমার রবের হাম্দ (প্রশংসা)-এর সহিত সূর্য উঠিবার আগে এবং সূর্য ডুবিয়া যাইবার আগে এবং রাত্রির মধ্যে তসবিহ পড়ো এবং সেজদার পরেও। (ফাসবির আলা মাইয়াকুলুনা ওয়া সাব্বিহ বিহাম্দি রাব্বিকা কাবলা তুলুইশ শামসি ওয়া কাব্বাল গরুব। ওয়া মিনাল লাইলি ফাসাব্বিহ্ ওয়া আদ্বারাস সুজুদ)।

ব্যাখ্যা

এখানে এই আয়াত দুটির সামান্য ব্যাখ্যা লিখতে গিয়ে প্রথমেই ৪০ নম্বর আয়াতের শেষ অংশটির কথা বলতে চাই। বলা হয়েছে, ‘ওয়া আদ্বারাস সুজুদ’ অর্থাৎ ‘এবং সেজদার পরেও।’ এই সেজদাটিকে প্রায় তফসিরকারীরাই ‘সেজদা’ শব্দটি ব্যবহার না করে

‘সালাত’ শব্দটি ব্যবহার করেছেন, তথা নামাজের কথাটি উল্লেখ করেছেন। যদিও ওয়াক্ফিয়া সালাত তথা নামাজ পড়তে গেলে নামাজের সঙ্গে সেজদা শব্দটি ওতপ্রোতভাবে জড়িত, কিন্তু তাই বলে সেজদা শব্দটি হবহ না রেখে সালাত শব্দটি ব্যবহার করা কি সঠিক মনে করেন?

কোরান-এর সুরা রহমানে বলা হয়েছে, ‘ওয়ান নাজমু ওয়াস সাজ্জারু ইয়াস জুদান’ অর্থাৎ ‘এবং তারকা (লতা) এবং গাছগুলো সেজদায় আছে।’ কেউ যদি লিখেই ফেলেন যে আকাশের তারা আর গাছগুলো নামাজ পড়ছে তা হলে কি বাক্যটিকে হবহ রাখা হলো? মোটেই না। হিব্রু ভাষায় হজরত ইসা (আ.)-র কাছে যে ইঞ্জিল শরিফ-টি নাজেল হয়েছিল উহার অনুবাদটি সর্বপ্রথম ধাতবপাতে খোদাই করে লেখা হয়েছিল। হিব্রু ভাষার মূল ইঞ্জিল শরিফ-টিকে ফেলে দিয়ে সরল অনুবাদ করা হয়েছিল। অনুবাদটি হবহ হয়নি বলেই ইঞ্জিল শরিফ-টির বিষয়ে অনেক রকম কথাবার্তা, অনেক রকম মতভেদ জানতে পারি। আল্লাহর নাজেলকৃত হিব্রু ভাষায় হজরত ইসা (আ.)-র কাছে যে ইঞ্জিল শরিফ-টি নাজেল হয়েছিল সেই ইঞ্জিল-টি মানুষের আপন প্রবৃত্তির বিচারের মাধ্যমে অনুবাদ করা হয়েছিল। এটা যে কত বড় মারাত্মক অপরাধ করা হয়েছিল তাতে কেবল খ্রিস্টান ধর্মের অনুসারীরাই

ব্যখিত হন নি, বরং সমগ্র মুসলিম জাতিও ব্যখিত হয়েছিলেন। কারণ যদি কোনো মুসলমান হজরত ইসা (আ.)-র উপর নাজেলকৃত ইঞ্জিল-টিকে অস্বীকার করে তবে সেই ব্যক্তিটি প্রথমেই কাফের। আর কোনো দলিলপত্র, যুক্তিতর্ক এবং আইনি লড়াই প্রয়োজন হয় না। কারণ কোরান প্রথমেই যে ৪টি আসমানি কেতাবকে মেনে নেয়ার কথাটি ঘোষণা করেছে তার মধ্যে ইঞ্জিল শরিফ-ও একটি। সুতরাং বিসমিল্লাতেই যেখানে গলদ সেখানে আর কোনো কথা অবশিষ্ট থাকে না।

সেজদাকে সালাত তথা নামাজ অনুবাদ যারা করেছেন তাদের বিরুদ্ধে কিছুই বলার থাকে না। তবে হবহটি রেখে দিলে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম আরও নূতন নূতন, আরও চমকপ্রদ ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করতে পারতো। তবে আল্লাহর বিশেষ রহমত যে আক্ষরিক কোরান-টুকু আমরা হবহ পেয়েছি। যদি না পেতাম তা হলে অধম লিখক সেজদা না লিখে ‘সালাত’ কথাটিই লিখতাম। এইখানেই কোরান-এর মাহাত্ম্য। কারণ যত রকম অনুবাদই করা হোক না কেন, মূল বিষয়টি তথা মূল কোরান-টি সামনে আছে বলেই আর কোনো দ্বিধা-দ্বন্দ্ব আর ভয় থাকার কথাটি আসে না।

আল্লাহর এই প্রশংসা ও মহিমা ঘোষণাটি মূল দৃষ্টিতে মনে হবে যে মহানবিকেই করতে বলা হয়েছে, আসলে তা মোটেই নয়। ইহা মহানবির উন্নতদেরকে করতে

বলা হয়েছে। একবচনে ‘তুমি প্রশংসা করো, তুমি মহিমা ঘোষণা করো’ পড়লে মনে হয়, ইঁহা মহানবিকেই আল্লাহ করতে বলেছেন। কিন্তু মহানবি তো নিজেই প্রশংসা এবং মহানবি তো স্বয়ং মহিমা। ইঁহা অধম লিখকের কথা নয়, বরং বিশ্ববিখ্যাত মাওলানা জালালউদ্দিন রুমির পীর ও মুরশিদ বাবা শামসে তাব্রিজের কথা।

আজ যদি মূল ফারসি ভাষাটি এবং তার সঙ্গে বাংলা উচ্চারণটি এবং সঙ্গে অনুবাদটি বাংলাদেশের বড় বড় পীরের দরবার হতে প্রকাশ করা হতো তা হলে ওহাবিদের গরম বাতাসগুলো রুমি এবং শামসে তাব্রিজ নামক এয়ারকুলার দু’টি বাহির করে দিতো এবং কিছুটা হলেও সংশয়ের

অবসান হতো। কিন্তু কোনো এক অজ্ঞাত কারণে বড় বড় দরবারগুলো কেন যে হাত গুটিয়ে বসে আছে ভেবে পার-কুল পাই না। অধম লিখকের

মতো গরিব আর পচা পীর ভক্তদের টাকায়, কোরবানির চামড়ার টাকায়, জাকাতে টাকায়, মানতে টাকায়, একটির পর একটি বই প্রকাশ করে চলছি। এই বৃদ্ধ বয়সে সারাটি রাত জেগে জেগে এই দুঃখের বিলাপ পাঠকদেরকে একটু শোনালাম।

কোরান-এ আল্লাহ ‘আনা আকরাবু ইলাইহে মিন্ হাবলিল ওয়ারিদ’ তথা ‘আমি তোমাদের শাহারগের নিকটেই আছি’ না বলে ‘নাহনু’ তথা ‘আমরা’ শব্দটি ব্যবহার করেছেন। আমরা বলতে নিশ্চয়ই বহুবচনকেই বুঝানো হয় এবং বহুবচনে অনেক (?) আল্লাহর কথাটি এসে যায়। ঠিক সেই রকম ‘আপনি প্রশংসা করুন,

আপনি মহিমা ঘোষণা করুন’— এই কথাগুলো মোটেই মহানবির জন্য প্রযোজ্য নয়, বরং মহানবির উদ্ভবের জন্য।

‘আউজুবিল্লাহে মিনাশ্ শায়তোয়ানুর রাজিম’ তথা ‘পাথরের আঘাত খাওয়া শয়তান হতে আশ্রয় চাইছি’ কথাটি মুখে হাজারবার ঘোষণা করলেও শয়তান আপনাকে মোটেও ছেড়ে দেবে না। কীভাবে পড়লে, কীভাবে অনুশীলন করলে শয়তান হতে আশ্রয় পাওয়া যায় সেই কথাগুলো, সেই উপদেশগুলো কামেল পীর হতে জেনে নিতে হয়। তফসিরে হসাইনি আর মেশকাত শরিফ পাঠ-করা শর্তযুক্ত পীরদের কাছে জানবার কথাটি বলা হচ্ছে না, কারণ এই জাতীয় পীর দিয়ে দেশ ছেয়ে গেছে।

যখন কোনো সাধক ধ্যানসাধনার অদৃশ্য তরবারি হাতে নিয়ে জেহাদে আকবরে বছরের পর বছর আল্লাহকে পাবার জন্য জেহাদ করে যায় তখন সেই জেহাদির চেহারা-সুরত, চলন-বলন, সমাজের কাছে বেখাপ্পা মনে হয় এবং নানা রকম ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও তামাশা করে থাকে। এই বিষয়টিতে সুলতানুল হিন্দ খাজা গরিব নেওয়াজের কেবলোই কাবা হজরত খাজা ওসমান হারুনি ফারসি ভাষায় বলে গেছেন : ‘মানাম ওসমানে হারুনি ইয়ারে শায়েখ মানসুরাম, মালামাত মিকুনাদ খালকেউ বারদারে মিরাকসাম।’ অর্থাৎ ‘আমি ওসমান হারুনি মনসুর হাল্লাজের বন্ধু। মনসুর হাল্লাজ যন্ত্রণার শুলীতে, আর আমি মানুষের ঠাট্টা-তামাশা আর বিদ্রূপের অদৃশ্য শুলীতে দাঁড়িয়ে তোমার প্রেমে নাচছি।’

আল্লাহর প্রেমিকের জন্য, আল্লাহর জেহাদে আকবরের অনুসারীদের জন্য একদিকে অবিরাম ধ্যানসাধনার কঠোর পরিশ্রমে ধৈর্যধারণ করা, আবার

অন্যদিকে মানুষের ঠাট্টা-তামাশা-বিদ্বেষের উপর দাঁড়িয়ে বিশাল ধৈর্যধারণ করে প্রেমের নৃত্য করা।

কোরান-এ সালাতের উল্লেখ : ৭৩

কোরান-এর ৫২ নম্বর সূরা তুরের ৪৮-৪৯ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে : আপনি সবার (ধৈর্যধারণ) করুন আপনার রবের হুকুমে (নির্দেশে)। সুতরাং আপনি আমাদের (আল্লাহ একবচন ব্যবহার করেন নি) চোখের সামনেই আছেন এবং তসবিহ পাঠ করুন হামদ (প্রশংসা)-এর সহিত আপনার রবের যখন আপনি বিছানা ত্যাগ করেন এবং রাত্রিকালে এবং তারকাগুলি ডোবার সময়ে আপনি তসবিহ পাঠ করুন। (ওয়াস্বির লিহকুমি রাব্বিকা ফাইন্না কা বিআ ইউনিনা ওয়া সাব্বিহ বিহামদি রাব্বিকা হীনা তাককুম। ওয়া মিনাল্ লাইলি ফাসাব্বিহহ ওয়া ইদ্বারান নুজুম)।

ব্যাখ্যা

‘সুতরাং আপনি আমাদের চোখের সামনেই আছেন’ এই কথা কয়টির সামান্য ব্যাখ্যা দিতে চাই, কারণ অন্য বিষয়গুলোর ব্যাখ্যা কমবেশি আগেই দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ এখানে ‘আমরা’-রূপ ধারণ করে তাঁর রহস্যময় চোখের সামনেই আছেন বলে ঘোষণাটি দিলেন। এই চোখ বলতে কি মানবীয় দেহের মাঝে যে দুটি চোখ দেওয়া হয়েছে উহাকে বোঝানো হয়েছে কিনা জানি না। আল্লাহ প্রতিটি মানুষের জীবন-রণের (শাহারণের) নিকটেই আছেন বলে যে ঘোষণাটি দিয়েছেন সেই ঘোষণাই অন্যরকম ভাষায় তথা চোখের অবতারণাটি করেছেন। যারা ধ্যানসাধনা করছে

তাদেরকে এই বলে বুঝানো হয়েছে যে আমরা (আল্লাহ) তোমার চোখের সামনেই আছি। এই চোখের সামনে থাকা বলাতেই আল্লাহর জ্ঞাতরূপে থাকা বলা হয়েছে। সেফাতরূপে থাকার কথাটি এখানে বলা হয় নি। কারণ আমাদের চোখের সামনেই আছেন বলে ঘোষণা করার অর্থটিই হলো জ্ঞাতরূপে অবস্থান করা। এখানে কেবল ম্বেজাজি সালাত এবং হাকিকি সালাত যারা পালন করে আসছে তাদের কথাটি যদিও বিশেষ মর্যাদাপূর্ণ, কিন্তু প্রতিটি মানুষের জীবন-রংগের (শাহারংগের) নিকটেই আল্লাহ আছেন বলা হয়েছে। এখানে ধর্ম-বর্ণ-গোত্র-সম্প্রদায় কোনো কিছুই উল্লেখ করা হয় নি। যেহেতু আল্লাহ সার্বজনীন এবং কারো মুখাপেক্ষী নন তথা মহানিরপেক্ষ, তাই তিনি প্রতিটি মানুষের শাহারংগের নিকটে আছেন বলে ঘোষণা করেছেন।

হে সাধক, আল্লাহ যে রকম তোমাকে সব সময় দেখছেন অথবা আল্লাহর চোখের সামনেই আছো, সুতরাং তুমি অবিরাম ধ্যানসাধনা করে যাও তা হলে তুমিও তাঁকে দেখতে পাবে। হে সাধক, সালাতে দাঁড়ানো অবস্থায় আল্লাহ যে রকম বিশেষভাবে তোমাকে দেখছেন অথচ তুমি দেখছো না, তাই তুমিও দেখতে চেষ্টা করো— এই কথাটি বলা হয়েছে।

রাতের আঁধারে, তারকাগুলো বিদায়ের পরে এবং বিছানা ছেড়ে উঠে আসার সময়ে আল্লাহর প্রশংসা ও

পবিত্রতা ঘোষণা করে যাও। সাধককে আরও বলা হচ্ছে যে, এই ধ্যানসাধনা করতে গেলে অবশ্যই তোমাকে ধৈর্যধারণ করতে হবে। কারণ সালাতের সঙ্গে ধৈর্যধারণ করার কথাটি আগেও বলা হয়েছে। ধৈর্যধারণ করতে বলা হয়েছে ‘তোমার রবের হুকুমের অপেক্ষায়।’ রবের হুকুমটি বলতে এখানে কী বুঝানো হয়েছে? আল্লাহর নৈকট্য পাবার কথাটি বলা হয়েছে। আল্লাহর দর্শনের মহা-ফয়েজ লাভের কথাটি বলা হয়েছে। আল্লাহর এই মহা-ফয়েজ তারাই লাভ করতে পারে যারা বিরাট ধৈর্যধারণ করে আল্লাহর হাম্দ তথা মহিমাটি ঘোষণা করে যায়। ইহা করতে গেলে বিরাট ধৈর্যের প্রয়োজন। এই ধৈর্য যার নাই তার জন্য আল্লাহর দর্শনের মহা-ফয়েজটিও নাই। তাই কোরান-এর অন্যত্র আল্লাহ বলছেন যে, আমি (আল্লাহ) ধৈর্যশীলদের সঙ্গে আছি অথবা থাকি। অতি অবাক করা একটি বিষয় হলো এই যে সালাত তথা নামাজের কথাটি কোরানুল মবিন-এ ৮২ বার উল্লেখ করা হয়েছে। (আমরা চেষ্টা করবো পাঠকদের সামনে এই ৮২ বার সালাত কায়েমের কথাটি তুলে ধরতে)। অথচ কেন অতি অবাক হই? সমগ্র কোরান-এ একটিবারও বলা হয় নি যে আল্লাহ পাক নামাজীদের সঙ্গে আছেন তথা ‘ইন্নালাহা মা আল মুসাল্লিনা’ অর্থাৎ ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ নামাজীদের সঙ্গে আছেন অথবা থাকেন!’ কেন বলা হয় নি?

আওলাদে রসূল শহিদে আজম ইমাম হোসায়েন—
 ‘হসাইনু মিন্‌নি ওয়া আনা মিনাল হসাইন’ তথা ‘
 হোসায়েন আম্মা হতে এবং আমি (মোহাম্মদ) হোসায়েন
 হতে’— ঈদের জামাতে নামাজ পড়ার আগে ইমাম
 হোসায়েনকে মহানবি কাঁধের ওপর নিয়ে একটু দ্রুতপদে
 এগিয়ে চলছেন। ফারুককে আজম ওমর ফারুক বললেন,
 ‘ইয়া রাসুলুল্লাহ, আপনার মোহরে নবুয়তের উপর
 ইমাম হোসায়েনের পায়ে লাথি পড়ছে।’ মহানবি
 বললেন, ‘ওমর, যার পায়ে লাথি মোহরে নবুয়তের
 উপরে পড়ছে, দ্যাখো সে কত সুন্দর।’ মহানবি মসজিদে
 খুৎবা দিচ্ছেন। কিশোর ইমাম হোসায়েন মহানবির
 দিকে

হেঁটে হেঁটে যাচ্ছেন। পায়জামার নিচের অংশটি ইমাম
 হোসায়েনের পায়ে নিচে পড়ে যাবার সম্ভাবনাটি দেখে
 মহানবি খুৎবা পাঠ ফেলে রেখে ইমাম হোসায়েনকে
 কোলে তুলে নিলেন। মহানবি বলেছেন, ‘কে সৈয়দদের
 বাবাকে দেখতে চাও? দেখে নাও ইমাম হোসায়েনকে।’
 সেই ইমাম হোসায়েনের তাঁবুতে নামাজ আদায় করার
 জন্য আজান হচ্ছে কারবালার রণপ্রান্তরে, আবার
 অন্যদিকে নরপিশাচ এজিদের তাঁবুতেও আজান হচ্ছে
 নামাজ আদায় করার জন্য। একই আজানের ধ্বনি
 ইমাম হোসায়েনের তাঁবুতে, আবার নরপিশাচ এজিদের
 তাঁবুতে। একই নামাজ, রুকু, সেজদা ইমাম হোসায়েনের

ঠাবুতে, আবার নরপিশাচ এজিদের ঠাবুতে— তা হলে আদিল (সুন্মবিচারক) আল্লাহ কী করে নামাজিদের সঙ্গে থাকেন?

এই ৪৮ ও ৪৯ নম্বর আয়াত দু'টোর সারসংক্ষেপটি বলতে গেলে এই বলতে হয় যে, হে সাধক, হে সালাত পালনকারী, তোমাদেরকে ঐশ্বর্যধারণ করতে হবে। তোমাদেরকে রবের প্রশংসা, পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করতে হবে। সেটা বিছানা ছেড়ে ওঠার সময়েই হোক আর নিশীথ রাতের অন্ধকারেই হোক, অথবা তারকাদের বিদায় ঘণ্টাই বাজুক। আরও বলা হলো, তোমাদের এই ধ্যানসাধনা, তোমাদের এই সালাত আল্লাহ দেখছেন। তাই বলা হয়েছে, হে সাধক, তুমি তো আমার চোখের নজরেই আছো। রহমতের মহা-ফয়েজ পাবার অপেক্ষায় থাকতে চেষ্টা করো।

আওলাদে রসূল ইমাম জাফর সাদেক (আ.) বলেছেন, 'মান আরাফাল্লাহা আরাদা আম্মা সেওয়াহ' অর্থাৎ 'যে ব্যক্তি আল্লাহকে চিনেছে সে সব কিছু হতে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে।' আল্লাহর বন্ধুদের বিষয়ে আল্লাহ এইরূপ বলবে, 'আজল ইয়ায়ি তাহতা কাবায়ি লা ইয়া রেফুহম গায়েবি' অর্থাৎ 'আমার বন্ধুগণ আমার কাবার আবরণে আবৃত, আমি ছাড়া অন্য কেহ তাদেরকে চিনতে পারে না।'

বাগদাদের বিখ্যাত ওলি হজরত মোহাম্মদ ওয়াসে বলেছেন, ‘মা রাআইতু শাইয়ান ইন্না রাআইতুল্লাহা ফিহে’ অর্থাৎ ‘আমি কোনো বস্তুই দেখি নাই অথচ যা দেখেছি তাতে আল্লাহকেই দেখেছি।’

কোরান-এ সালাতের উল্লেখ : ৭৪

কোরান-এর ৫৩ নম্বর সূরা নজমের ৬২ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে : সুতরাং আল্লাহকে সেজদা করো এবং এবাদত করো। (ফাস্জুদু লিল্লাহি ওয়াবুদু)।

ব্যাখ্যা

ছোট্ট একটি আয়াত এবং তার হুবহু অর্থটি করা হলো। কিন্তু এই আয়াতটির আগে বলা হলো, কেয়ামত অতি নিকটে। এবং এই কেয়ামতের রহস্য একমাত্র আল্লাহই জানেন এবং যারা আল্লাহর ওলি হয়েছেন তারা জানেন। তবে একটি কথা বলতে হয় যে, আল্লাহ জানালেই জানা যায়, অন্যথায় অসম্ভব।

কেয়ামত দুই প্রকার : একটি ছোট কেয়ামত, অপরটি বড় কেয়ামত। একটি কেয়ামতে সগিরা, অপরটি কেয়ামতে কবিরা। উপরের আয়াত কয়টি পড়লে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, ইহা কেয়ামতে সগিরা তথা একটি মানুষের মৃত্যুই কেয়ামত তথা ছোট কেয়ামত। তাই বলা হচ্ছে, এই দুনিয়ার মায়ার খপ্পড়ে পড়ে, দুনিয়ার মোহে ডুবে থেকে কী সুন্দর হাসিঠাট্টা করছো! কিন্তু কেয়ামত অতি নিকটে থাকা সত্ত্বেও একটু অনুতাপ, একটু

আক্লেপ, একটু গবেষণা এবং কেয়ামতের যে মুখোমুখি হতে হবে একদিন সেই জন্য কি কাঁদতেও পারো না?

আল্লাহ স্বয়ং বিস্ময় প্রকাশ করছেন। সর্বগ্রাসী শাস্তির কথাটিও কি চিন্তা করে একটু অনুতপ্ত হও না? একটু হ্রদ্বন করতে পারো না? আর অনুতাপ ও হ্রদ্বন করবেই বা কেমন করে? কারণ কেয়ামত বিষয়টি ভাববার সময় তো তোমরা পেলে না! তোমরা তো একদম উদাসীন। তোমরা মনেই করো না যে কেয়ামত অতি নিকটবর্তী। এই লোভের সংসারের মায়ায় ডুবে থেকে কী করেই বা ভাবতে পারো! তাই তোমাদেরকে বলছি, আল্লাহর আনুগত্যকে মেনে নাও, তথা সেজ্জদা করো এবং আল্লাহর এবাদত করো।

তোমরা কি দেখো নাই, সেই প্রাচীন আদ জাতিকে মূর্তিপূজার জন্য তথা আপন খেয়ালখুশি মতো চলার জন্য, এবং সামুদ্র জাতিকেও, ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছিল— ওই মূর্তিপূজার কারণেই, তথা আপন খেয়ালখুশি মতো চলার কারণেই। আপন খেয়ালখুশি মতো চলাকেই বলা হয় মূর্তিপূজা, তবে উহা হাকিকি মূর্তিপূজা, মেরাজি মূর্তিপূজা নয়। ইহা যদি সত্যিই মেরাজি মূর্তিপূজা হতো তা হলে আমরা দেখতে পাই, অখণ্ড বিশাল ভারতে মেরাজি মূর্তিপূজা তথা নিজ হাতে পাথর, মাটি, ধাতব পদার্থ দিয়ে মূর্তি বানিয়ে আজও পূজা করে চলছে। মেরাজি মূর্তিপূজার কথাটি যদিও

আমরা গ্রহণ করে নিতে পারি না, কিন্তু আদ ও সামুদ জাতিকে যে মূর্তিপূজার জন্যই ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছিল সেটা ছিল হাকিকি মূর্তিপূজা তথা আপন খেয়ালখুশি মতো চলা। নতুবা অখণ্ড ভারতে এই ম্লেজাজি মূর্তিপূজা করার অপরাধে আদ ও সামুদ জাতির মতো করে ধ্বংস করে দেওয়া হতো। কিন্তু কঠিন বাস্তবের মুখোমুখি হয়ে আমরা কী দেখতে পাই?

সুতরাং ব্যক্তির মৃত্যুটাই হলো, ছোট কেয়ামত। অধম লিখকের মনে হয় এখানে ব্যক্তির মৃত্যু নামক ছোট কেয়ামতটির কথাই বলা হয়েছে। যদি কেউ আমার কথাগুলো মেনে না নেয় তা হলে আমার বলার কিছু নাই।

কোরান-এ সালাতের উল্লেখ : ৭৫

কোরান-এর ৫৮ নম্বর সূরা মুজাদালার ১৩ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে : ওহে! তোমরা গোপন আলাপের আগে সদকা দিতে ভয় পাও? যখন তোমরা তাহা পারিলে না এবং আল্লাহ তোমাদিগকে মারফ করিয়া দিলেন। সুতরাং সালাত কায়েম করো এবং জাকাত আদায় করো এবং আল্লাহকে মানো এবং রসুলকে মানো। আল্লাহ জানেন তোমরা যা করো। (ওয়া আশফাক্তুম আনতুকা দিহ্মু বাইনা ইয়াদাই নাজওয়াকুম সাদাকাতিন; ফাইয়লাম তাফাআলু ওয়াতা বাল্লাহ আলাইকুম ফাআকিমুস সালাতা ওয়া আতুয

যাকাতা ওয়া আতীউল্লাহা ওয়া রাসুলাহ; ওয়াল্লাহু খাবীরুম্বিমা তাম্বালুন)।

ব্যাখ্যা

এই আয়াতটির ব্যাখ্যা লিখতে গিয়ে এর আগের আয়াতটি সম্পর্কে কিছু কথা বলতে হয়। বলতে হয় যে, রসুলের সাহাবাদের মাধ্যমে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মধ্যে যারা আম্মানু তথা ইম্মানদার তাদেরকে চুপিচুপি তথা গোপনে কথা বলতে চাইলে আগে রসুলকে সদকা দিয়ে কথা বলার কথাটি বলা হয়েছে। মহানবির সাহাবারা নিঃসন্দেহে মোমিন। আম্মানু আর মোমিনের মধ্যে বিরাট ব্যবধান। যদিও আম্মানুরাও ইম্মানদার এবং মোমিনরাও ইম্মানদার। আম্মানু এবং মোমিনের পার্থক্যটি তখনই দেখতে পাই যে

আল্লাহ আম্মানুদের সঙ্গে থাকেন না, বরং মোমিনদের সঙ্গে আল্লাহ আছেন বা থাকেন কথাটি কোরান-এ ঘোষণা করা হয়েছে। কোরান-এর ৮ নম্বর

সূরা আনফালের ১৯ নম্বর আয়াতের শেষ অংশে বলা হয়েছে, ‘ওয়া আল্লাল্লাহা মাত্মাল মুমিনীন’ অর্থাৎ ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ মোমিনদের সঙ্গে আছেন বা থাকেন।’

আবার একই সূরার ৪৫ নম্বর আয়াতের শেষেও বলা হয়েছে যে ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে আছেন বা থাকেন।’ অনাগত কালে যারা দীনের উপরে ইম্মান আনবে তাদেরকেই লক্ষ করে বলা হয়েছে যে, রসুলের

সাথে চুপিচুপি কথা বলতে চাইলে আগে সদকা দেবে তারপরে কথা বলবে। এটা বা এই বিষয়টি কল্যাণ ও পবিত্রতা বয়ে আনবার সহায়ক।

মুখের মিস্তি কথা, বিনয়, ভদ্রতা এবং নম্রতার যেমন প্রয়োজন হয় তার চেয়ে কিছুটা বেশি গুরুত্ব দিয়ে সদকা দেবার উপদেশটি এখানে দেওয়া হয়েছে। নিজের পরিশ্রমে অর্জিত সম্পদ হতে কিছুটা সদকা দেওয়া মোটেই কম কথা নয়। অবৈধ উপায়ে অর্জিত ধনসম্পদ হতে কিছু দান করাটা যত সহজ, তত সহজ মোটেই নয় মাথার ঘাম পায়ে ফেলে কষ্টে অর্জন করা ধন-সম্পদ হতে সদকারূপে কিছু দেওয়া। ধনসম্পদটি একই বিষয়, কিন্তু ধন-সম্পদ অর্জন করার প্রশ্নে অবৈধ আর বৈধ দু'টো বিষয়ে আকাশ-পাতাল ব্যবধান।

রসূলকে এই পরিশ্রমে অর্জিত ধনসম্পদ হতে কিছু সদকা তথা হাদিয়া প্রদান করতে কোরান বলছে এবং সেই সঙ্গে এই কথাটিও বলে দেওয়া হয়েছে যে, যদি একান্তই সদকা তথা হাদিয়াটি দিতে না পারো, যদি অক্ষম হও, তা হলে আল্লাহ ক্ষমা করে দেবেন। রসূলকে এই সদকা প্রদানের বিষয়টিতে কতটুকু গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে যে যদি অক্ষম হয় তো ক্ষমা করে দেবার কথাটি বলা হয়েছে। তার মানেই হলো, রসূলকে সদকা তথা হাদিয়া না দেওয়াটা ঠিক নয়, তাই ক্ষমার কথাটি

এসেছে। তা না হলে, সদকা দিতে না পারলে ক্লমা করে দেবার কথাটি কেন এসেছে?

আল্লাহ ক্লমা করে দিয়ে আবার উপদেশ দিলেন এই বলে যে, তোমরা সালাত কায়েম করো তথা যোগাযোগটি তথা সংযোগটি সংরক্ষণ করো তথা হেফাজত করো। তারপর বলা হলো, জাকাত আদায় করো এবং এখানেই শেষ নয়, বরং আরও বলা হলো, আল্লাহর এত্তেবা করো তথা আল্লাহকে মানো এবং আল্লাহর রসুলের এত্তেবা করো তথা রসুলকে মানো।

এখন আমরা একটু গবেষণার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে নবি এবং রসুলের বিষয়টি আলোচনা করতে চাই। রসুল একটি চলমান প্রক্রিয়া, কিন্তু নবি কখনই চলমান প্রক্রিয়া হওয়া তো দূরে থাক, বরং মহানবির মধ্যেই নবুয়ত খতম তথা শেষ। সুতরাং মহানবি শেষ নবি তথা খাতামান নবি। রসুল বিষয়টি বলতে গিয়ে কেন ইহাকে একটি চলমান প্রক্রিয়া বলা হলো? তার প্রধান কারণ হলো, আল্লাহর রসুল মানুষ এবং ফেরেশতা উভয়টি হতে নির্বাচন করা হয় তথা নেওয়া হয় তথা মনোনীত করা হয়, কিন্তু নবির প্রশ্নে কোরান-এর একটি আয়াতেও কোনো ফেরেশতাকেই নবি বলা হয় নি। কেউ কি দেখাতে পারবেন যে একজন ফেরেশতাকে নবি বানানো হয়েছে? পারবেন না। কারণ এই রকম কথা থাকলে তো পারবেন। যাহা নাই উহা পারার প্রশ্নই ওঠে

না। সুতরাং বিশ্ববিখ্যাত একেকজন আল্লাহর ওলি এবং যে কোনো আল্লাহর ওলি ফেরেশতাদের চেয়ে অনেক অনেক মর্যাদাবান। ফেরেশতার আল্লাহর ওলিদের খেদমত করেন, সাহায্য করেন এবং আরও অনেক রকম কাজ ওলিদের সঙ্গে থেকে সমাধান করেন। ফেরেশতাও রসূল আবার মানুষও রসূল। নফস ও রুহ যার নাই সেই ফেরেশতাও রসূল আবার নফস ও রুহ আছে সেই মানুষও রসূল। মানুষকেই আশরাফুল মাখলুকাত তথা সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব বলা হয়েছে। ফেরেশতাদের এই রকম কথা বলার প্রশ্নই ওঠে না। সুতরাং এই চুপিচুপি সদকা দেবার নিয়মটি তথা প্রথাটি কোনো অবস্থাতেই উচ্ছেদ করা যায় না। ইহাকে কখনই নাসেক-মনসুকের ফাঁদ পেতে ধরা যায় না। যদি কোরান-এর এই আয়াতে রসূল না বলে নবি বলা হতো তা হলে খোদার কসম, আমি অধম লিখকই এই আয়াতটিকে নাসেক-মনসুকের ফাঁদে ফেলে দিতাম।

আমরা আল্লাহর ওলিদেরকে— তা সেই ওলি বড়ই হোন আর ছোটই হোন, বড় মোমবাতিই হোক আর ছোট মোমবাতিই হোক, আলোর প্রশ্নে তার কমবেশি থাক, কিছু কখনও রসূল বলবো না, রসূল বলতে যাবো না। যদিও হাকিকতে বলা যায় কি না উহা পাঠকদের কাছেই বিচারের ভারটি তুলে দিলাম। এ জন্যই আমরা ভক্তদের দেখতে পাই আল্লাহর ওলিদেরকে সদকা তথা

হাদিয়াটি দিতে। যদিও বাংলাভাষায় এই সদকা ও হাদিয়াকে গুরুদক্ষিণা বলা হয়। বাংলাভাষায় গুরুদক্ষিণা অনুবাদ করলেই কিছু লোক হিন্দুধর্মের গন্ধ পায়। হিন্দুদের বিবাহে যেমন উলুধনি দেওয়া হয়, খাতুনে জান্নাত মা ফাতেমার বিবাহেও উলুধনি দেওয়া হয়েছিল এবং এই একবিংশ শতাব্দীতেও আরব দেশগুলোর বিবাহ অনুষ্ঠানে ওই একই উলুধনি দিতে দেখা যায়। এটা একটা নিজস্ব সংস্কৃতি।

ব্রিটিশ আমলে আমরা দেখতে পাই যে আমাদের মুসলমান বাপ-দাদারা সবাই ধুতি পরিধান করতো এবং খুবই কম লোকে, যারা নবাব পরিবারের, তাদেরকে খ্রিস্টানদের পোশাক ফুলপ্যান্ট পরতে দেখতাম। ছোটকালে দেখেছি বাপ-দাদারা ফুলপ্যান্ট পরিধানকারী ব্যক্তিটির দিকে অবাক চোখে চেয়ে থাকতো এবং একে অপরকে চুপিচুপি বলতো যে এরা খ্রিস্টান হয়ে গেছে। সেইদিনে ফুলপ্যান্ট পরাটাকে খ্রিস্টানদের অনুসরণ করা হচ্ছে বলে মনে করা হতো। আর আজ চেয়ে দেখুন তো! ফুলপ্যান্ট পরে মসজিদে নামাজ আদায় করাটা এখন একটি সাধারণ ব্যাপার। এখন যদি কেউ শখেও ধুতি পরিধান করে তো উল্টা প্রশ্ন করা হবে যে হিন্দুদের পোশাক কেন পরা হলো? এখন ধুতি পরাটার মানে হলো হিন্দুদের পোশাক পরিধান

করা। বিবর্তনবাদের ধাপগুলো আমাদেরকে অবাক করে বৈকি।

সেই ব্রিটিশ আমল থেকেই মুসলমানরা ‘খোদা হাফেজ’ কথাটি বলতো। আর এখন ‘খোদা হাফেজ’ বিদায় নিয়ে ‘আল্লাহ হাফেজ’ এসে গেছে। এ যেন রুটির ডিজাইন বদলানো। তবে ফতোয়া দেওয়া হয়েছে যে ‘আল্লাহ হাফেজ’ বলার মাঝে অনেক সওয়াব হাসিল করা যায়। খোদা শব্দটি ফারসি ভাষার, সুতরাং ফারসি ভাষায় ‘খোদা হাফেজ’ বলার মাঝে সওয়াব থাকলেও উহা খুবই কম। দুঃখ হয় : আল্লামা ইকবাল, মাওলানা জালাল উদ্দিন রুমী, হাফিজ সিরাজি, সানায়ি ইত্যাদি ইসলামের মহামনীষীরা আল্লাহ হাফেজের এত বড় মর্তবাটি জানতেন না!

কোরান-এ সালাতের উল্লেখ : ৭৬

কোরান-এর ৭০ নম্বর সূরা মারেজ-এর ১৭-২৩ এবং ৩৪ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে : ডাকিবে (জাহান্নাম) যাহারা পিঠ দেখাইল এবং যাহারা মুখ ফিরাইয়া লইল। এবং যাহারা জম্মা করে (সম্পদ) এবং লুকাইয়া রাখে। নিশ্চয়ই ইনসান (মানুষ)-কে সৃষ্টি করা হইয়াছে চঞ্চল মন দিয়া (হালুআ : দুর্বল মন, অস্থির, চঞ্চল মন)। যখন স্পর্শ করে মঙ্গল সে হয় কুপণ (মানুআ)। কেবলমাত্র মুসল্লি ছাড়া। যাহারা সালাতের উপর দায়েম (সর্বক্ষণ, সর্বাবস্থায়, সর্বহালতে)। এবং যাহারা নিজেদের সালাতের উপর হেফাজতকারী। (তাদউ মান আদ্বারা ওয়া তাওয়ালা। ওয়া জামাআ ফাআওয়া। ইন্না ইনসানা খুলিকা হালুআ। ইজা মাস্‌সাহশ শাররু জাযুআ। ওয়া ইজা মাস্‌সাহল খাইরু

মানুআন্। ইল্লাল মুসাল্লিনাল লাজিনা হম আলা সালাতিহিম দায়িমুন। ওয়াল্ লাজিনা হম আলা সালাতিহিম ইউহাফিজুন)।

ব্যাখ্যা

কোরান-এর প্রতিটি সুরাই অপূর্বেরও অপূর্ব, কিন্তু এই মারেজ সুরাটি বৈষয়িক এবং আধ্যাত্মিক বিষয়ের উপর ছোট ছোট আয়াত দিয়ে এত সুন্দর করে বুঝিয়ে দিয়েছে যে, বিস্ময়ে হতবাক হতে হয়। এই একটিমাত্র কোরান-এর সুরা মারেজটি পৃথিবীর ৫৭টি মুসলিম দেশকে বুঝিয়ে দিচ্ছে যে তোমরা কোন পতনের বিন্দুতে দাঁড়িয়ে আছো। (মাজ্জুব, আবদাল, মাস্তান এবং আল্লাহর ওলিরা এই আশ্বানটির বাইরে, কারণ ঐদের ধ্যানসাধনা সম্পূর্ণরূপে ব্যক্তিকেন্দ্রিক এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে কিছুটা সমাজকেন্দ্রিক বলা যায়)। এই ৫৭টি মুসলিম দেশের মধ্যে মাত্র একটি মুসলিম দেশ ছাড়া বাকি ৫৬টি মুসলিম দেশ এতই নিম্নমানে অবস্থান করছে এবং কোরানুল করিম-এর কোনো আদেশ-উপদেশই যে মেনে চলছে না, তারই একটি জ্বলন্ত প্রমাণ।

বৈষয়িক উন্নয়নের প্রশ্নে (অধ্যাত্মবাদ বাদ দিলাম) একমাত্র মুসলিম দেশ মালয়শিয়া কিছুটা উন্নতির দিকে এগিয়ে চলছে। নেতৃত্ব যেখানে দুর্বল, রুগ্ন এবং লোভী সেখানে একটি দেশের বৈষয়িক উন্নতির দিকে এগিয়ে যাওয়াটা বেশ কঠিন একটি ব্যাপার। মাত্র একটি

নেতাও যে একটি দেশের চেহারা পার্লিটয়ে দিতে পারে তারই জ্বলন্ত প্রমাণ মালয়শিয়ার প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মহাথির মোহাম্মদ।

আমাদের বাংলাদেশও একটি সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম দেশ। সব নেতাদের পাঁইকারিভাবে বলছি না, বরং বেশ কিছু নেতা আছে যারা দুর্নীতির ময়লা পুকুরে হরদম ডুবেই থাকে। তাই একটি নূতন প্রবাদ বেরিয়েছে যে জানোয়ারকে জঙ্গলে মানায়, বাচ্চাকে মায়ের কোলে মানায়, আর বাংলাদেশের রাজনীতির কিছু নেতাদের জেলখানায় মানায়। বাংলাদেশের এক প্রধানমন্ত্রীর বড় পুত্রধন কর্মসিঙ্গেলনে বলেছিল: যদি আমরা আবার ক্ষমতায় আসি তা হলে দুর্নীতির সবগুলো শেকড় উপড়ে ফেলবো। শ্রোতারা এই কথাগুলো শুনে আনন্দে হাততালি দিয়েছিল। কিন্তু যখন জনতা দেখতে পেল যে সেই নেত্রীর পুত্র আকর্ষ দুর্নীতিতে ডুবে আছে এবং এই যে দুর্নীতিতে ডুবে আছে এই প্রমাণটি কাগজ-কলমে কেউ প্রমাণ করতে পারবে না, বরং সাক্ষীর মাধ্যমে প্রমাণ করা ছাড়া আর কোনো উপায় নাই। সেই পুত্রধন কত উচ্চস্তরের সেয়ানা যে দলিল প্রমাণে একটিও প্রমাণ রেখে যায় নি। এটা প্রায় সবারই জানা যে কোরান বলছে, যে জাতি তার নিজের ভাগ্য যতক্ষণ পর্যন্ত নিজে পরিবর্তন না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ সেই জাতির ভাগ্য পরিবর্তন করেন না (হবহ উদ্ধৃত নয়)।

যদিও ফকিরের জন্য রাজনীতি হারাম (?) তবু খুব দুঃখ নিয়ে এই কথাগুলো একদম সাদামাঠা ভাষায় বলে গেলাম। বাংলাদেশ কি একজন মহাখির মোহাম্মদের মতো নেতার আশা করতে পারে না?

এবার মূল বিষয়টিতে ফিরে আসছি। কোরানুল মাজিদ কী সুন্দর ভাষায় বলছে : ওই ব্যক্তিদেরকেই জাহান্নাম ডাকবে, যারা সত্যকে সত্য জেনেও মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, যারা সত্যকে জেনেও সত্যের জন্য সামান্য সাদা-শব্দটিও করে নি। সেই সত্যটির প্রথমার্শেই কোরান জানিয়ে দিলো : যারা দুনিয়ার ধনসম্পদ জমা করে রাখে এবং সুন্দর হিশাব-নিকাহের মাধ্যমে গুণে বেছে রাখে। সম্পদ জমা করাটাকেই কোরান মানা করছে। কতটুকু সম্পদ রাখা যাবে? অধম লিখকের রচিত মারেফতের গোপন কথা বইটি পড়লেই পরিষ্কার একটি ধারণা জন্মাবে।

সম্পদের পাহাড় জমিয়ে আরাম-আয়েশে দিন কাটাচ্ছে আর অপরপক্ষে বেশিরভাগ মানুষ অভাব-অনটনে দারিদ্রের শেষ প্রান্তে এসে অসহায়ের মতো দিনযাপন করছে। ইতিহাসের জনক যেমন হেরোডোটাস, তেমনি সমাজকল্যাণ নামক তথাকথিত বিজ্ঞানের জনক হলেন ম্যাকনামারা। অতিশয় চঞ্চুলজ্ঞায় এবং দাতা সাজার যাত্রাদলের সম্রাটের পোশাক পরে ভিডিও ক্যামেরা নিয়ে দেখিয়ে দেখিয়ে

ছিটাফোটা দান করার বিষয়টি দানবীরের ভারি ক্লি চালে দেখিয়ে চলছে। আফসোস এই জাতির জন্য, পোড়া কপাইলা এই নিঃস্ব, রিক্ত, নির্যাতিত, লাঞ্চিত, পদদলিত, অসহায় মানুষগুলোর দ্বান মুখগুলো দেখে দেখে। বিবেকের আবরণটি কি এতই কঠিন, এতই শক্ত যে ওয়েল্ডিং মেশিন ছাড়া এদের দিলের জানালা ফাঁক করা মুশকিল! সরল জনতাকে যে এই ধনসম্পদ পুঞ্জীভূত করার প্রয়াসে কত রকম চিকন ধোঁকাবাজির খেলা খেলছে, কত রকম প্যাঁচঘোচের মিষ্টি মিষ্টি কথা শুনিয়া আশার স্বপ্ন দিয়ে বিভোর করে রাখে। ‘গরিবি হঠিয়ে দেব’—কী সুন্দর বাক্যটি! কী সুন্দর বচন! অথচ যিনি গরিবি হঠাবার ভাষণটি দিচ্ছেন তিনিই পবর্তপ্রমাণ ধনসম্পদ পুঞ্জীভূত করে রেখেছেন তথা জমা করে রেখেছেন।

মানুষ কোনো কিছুই মালিক নয়, এমনকি মানুষ তার নিজের মালিক নিজেই নয়—এটা প্রতিটি মানুষ পরিষ্কার বোঝে, তবু এই সম্পদ জমাকারীরা ‘কোরান-এ ব্যক্তিমালিকানা আছে’—প্রমাণ করার হরেক রকম দলিল দিয়ে যায়। ব্যক্তির অধীনে সম্পদ থাকাটিকে কোরান মালিকানা বোঝায় নি, বরং আম্মানতদারি বুঝিয়েছে। তারই জ্বলন্ত প্রমাণ মহানবির জলিল কদরের সাহাবা ফারুক আজম হজরত ওমর ফারুক (রা.)—এর জীবনটি দেখলেই পরিষ্কার বোঝা যায়। আমি ভালো

করেই জানি যে আমার এই কথাগুলো, আমার এই বিলাপের কান্নাগুলো, আমার এই ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণগুলো কোনো কাজেই আসবে না। তবু সাক্ষীগোপাল করে রেখে দিলাম।

এই সম্পদ জমাকারীরাই ধর্মের লেবাস পরিধান করে খাসির মাথা সামনে রেখে ভেড়ার মাংস বিক্রি করে। এরা নিঃস্ব-রিষ্ঠ মানুষের বুকের উপর দাঁড়িয়ে ধর্মের ব্যাখ্যা দেয়। এরা ধর্ম নিয়ে ছিনিমিনি খেলা তো ভালো, বরং ধর্ম নিয়ে ডাকাতি করে।

ধনসম্পদ আর ক্ষমতার লোভ যে কত ভয়ঙ্কর তা মাদকদ্রব্য সেবনকারীরা বুঝতেও পারে না। কোরান কী সুন্দর করে বলছে : মুসল্লি হতে চাও? তবে শোনো, মুসল্লি হবার ছোট ছোট নীতিগুলো জানিয়ে দিলাম। প্রথমেই জানিয়ে দিলাম, ধনসম্পদ পুঞ্জীভূত এবং সংরক্ষিত করে যারা রাখে তাদেরকে জাহান্নাম বার বার ডাকছে : আয়, আমার কোলে আয়!

জাহান্নাম ডাকছে, তবু এরা জাহান্নামকে ভয় করে না। এরা ভালো করেই জানে যে খুব বেশি হলে শতবছর বেঁচে থাকবে। তারপর? তারপর মৃত্যুঘটনা দিয়ে জাহান্নামের কোলে বসানো হবে। তাই কোরান বলছে : মুসল্লি তারাই যারা ধনসম্পদ পুঞ্জীভূত ও সংরক্ষণ করে না।

এরাও কোরান পড়ে, এরাও মুসল্লির সংজ্ঞাটি ভালো করেই জানে। তাই এরা মুসল্লি সেজে এয়ারকন্ডিশন্ড মেজাজি মসজিদে মেজাজি নামাজ আদায় করে। মিনিট দশেক এদের সঙ্গে চললেই পরিষ্কার বোঝা যায় যে, এই মুসল্লি যারা সেজেছে তাদের ভেতরটা অহঙ্কারের আগ্নেয়গিরির লাল আভা উৎগরিণ করছে। এদের অহঙ্কার, এদের গর্ব, এদের ঠাটবাট, এদের টাইস অ্যান্ড টুইস (চলন-বলন : ঢাকাইয়ারা চলন-বলনকে টাইস অ্যান্ড টুইস বলে) এতই ভয়ঙ্কর যে আর কাছে থাকতে মন চায় না। সুতরাং নকল মুসল্লির ছড়াছড়িতে আসল মুসল্লিগুলোকে ধরতে কষ্ট হয়।

এই নকল মুসল্লিদের মনমেজাজ এতই অস্থির থাকে যে এই অস্থিরতাকে ফিতা দিয়েও মাপা যায় না, একটু বিপদের ছোঁয়া লাগলেই এরা ছিলবিলিয়ে ওঠে (হা-হতাস করে)। আবার বৈষয়িক মুনাফার ব্যাপারটি যখন ধরা দেয়, তখন কী যে আনন্দের হাসি হাসে! আনন্দে মুখের ৩২টি দাঁত দেখিয়ে হাসতে থাকে।

মুসল্লির আবরণে এদের কৃপণতা ধরাই পড়ে না। এরা কঙ্কুসের দাদা, কিব্বু দাতার অভিনয়ে অমিতাভ বচ্চনকেও হারিয়ে ছাড়বে। এদের টাইস অ্যান্ড টুইস বা রঙ-চঙ দেখে বোঝাই যাবে না যে এরা নকল মুসল্লি। এই নকল মুসল্লিরাই যুগে যুগে শোষণ, জুলুম আর অত্যাচারের এমন ভয়ঙ্কর স্টিমরোলার চালিয়েছিল যে

এরাই খাল কেটে মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন আর মাও সে তুণ্ডকে ডেকে এনেছিলো।

মার্কস আর লেনিনকে দোষারোপ করার আগে এই জাতীয় মানুষগুলোর ইতিহাস পড়ে দেখুন। আপনার বিবেক কেঁদে উঠবে। আপনার মনপ্রাণ খরখর করে কেঁপে উঠবে। এবং আমার কথাগুলো যে কতটুকু সত্যতা বহন করে তা কিছুটা হলেও বুঝতে পারবেন।

হায় রে খান্নাসরূপী শয়তান! ওই নকল মুসল্লিদের চোখগুলোকে অন্ধ করে দিয়েছিলি! বিবেকের দরজার কপাট ভারী স্টিল দিয়ে বন্ধ করে দিয়েছিস! সাবাস খান্নাসরূপী শয়তান, সাবাস! এই নকল মুসল্লিদেরকে চোখ মুখ আর পেট কোনোদিন ‘ভরে না’-র শয়তানি দর্শনটি অদৃশ্য নফসের কাছেই থেকে থেকে কুমন্ত্রণা দিয়ে চলেছিস যুগে যুগে এবং আজও এবং আগামী কালও।

আবার একটু লক্ষ করুন, একটু চোখ কান খুলেই লক্ষ করে দেখুন, যারা নামাজ পড়ছেন তথা যারা সালাত আদায় করছেন তারা এই সমস্ত কুৎসিত বিষয়ের ধারে কাছেও থাকেন না। ইহা অধম লিখকের কথা নয়, বরং সুরা মারেজের ২২ নম্বর আয়াতেই বলা হয়েছে।

এখন একটু অনুরোধ করতে চাইছি। কোরান-এ বর্ণিত এই রকম নামাজ পড়ুয়া মুসল্লি খুঁজে খুঁজে বের করতে চেষ্টা করে দেখুন। আশা করি কোরান-এ বর্ণিত এই

রকম মুসল্লি আপনি হাতে গুণতে পারবেন। যারা মুসল্লি নামাধারণ করেও মুসল্লি নয়, সেই জাতির ভাগ্যটির শোচনীয় অবস্থা দেখুন। দেখুন ৫৬টি মুসলিম দেশের গাল ইঁহদি, খ্রিস্টানরা কী সুন্দর করে চেটে চলছে। যারা গাল চাটছে তারা ভালো করেই জানে যে আমরা কোন পতনের শেষ বিন্দুতে দাঁড়িয়ে আছি।

এইসব নকল মুসল্লিরা ভালো করেই জানে যে, সুরা মারেজের ২৪ নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলছেন যে, তোমাদের ধনসম্পদের ভাগ বঞ্চিতদের এবং যাদের চাইবার উপযুক্ততা আছে তাদেরকেও দিতে হবে।

দশচক্রই যখন এ রকম তো যিনি প্রতিবাদ করছেন, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ দিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছেন, তাকেও ভূত সাজতে বাধ্য করা হচ্ছে। খান্নাসরূপী শয়তানটি, যাহা আপন নফসের ভেতরে তথা জীবাত্মার ভেতর লুকিয়ে আছে, তার কুমন্ত্রণা আর ওয়াসওয়াসা কত বড় ভয়ঙ্কর!

এইসব নকল মুসল্লিরা মেরাজি হজ্জটি পালন করতে গিয়ে মেরাজি তিনটি শয়তানকে মেরাজি কঙ্কর ছুঁড়ে মারতে ওস্তাদ, কিন্তু হাকিকি খান্নাসরূপী শয়তানটিকে যে প্রতিটি নফসের সঙ্গে দিয়ে দেওয়া হয়েছে ইঁহা মালুম করতে পারে না। তাই হাকিকি কাবার হাকিকি তওয়াফ করে হাকিকি হাজি হবার তো প্রশ্নই উঠে না। তাই একই সুরার ৩৪ নম্বর আয়াতে এক ধাপ এগিয়ে বলা হয়েছে : আম্মানত এবং প্রতিশ্রুতিটিও যারা রক্ষা

করে এবং সেই সঙ্গে নিজেদের সালাত তথা নামাজের প্রতি বিশেষভাবে খেয়াল রাখে তথা যত্নবান হয় তারাই জ্ঞান্নাতে প্রবেশ করবে। এখানে নিজেদের নামাজের উপর যত্নবান হওয়ার কথাটি বলতে কী বুঝায়? যারা অগ্র-পশ্চাৎ সব কিছু ভেবে এবং চিন্তা করে বিচার-বিশ্লেষণ করতে পারে তারাই তাদের সালাতের তথা নামাজের জন্য যত্নবান, কথাটি কোরান-এ বলা হয়েছে।

এই সকল নকল মুসল্লিদের নামাজ যেমন নামাজ নয়, বরং লোক দেখানো নামাজ এবং এই লোক দেখানো নামাজীদেরকে ওয়াইল নামক জাহান্নামে ফেলে দেওয়া হবে- এই কথাটিও কোরান-এর কথা। যঈমধু নামেই মধু, কিন্তু আসল মধু নয়, ঠিক তেমনই এদের নামাজ নামে যঈমধু, মোমাছির চাকভাঙা আসল মধু নয়।

কোরান-এ সালাতের উল্লেখ : ৭৭

কোরান-এর ৭৩ নম্বর সূরা মোজাস্সেলের ২০ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে : এবং সালাত কায়েম করো এবং জাকাত আদায় করো এবং আল্লাহকে সুন্দর ঋণ (কারদান হাসানা) দাও। এবং নিজেদের নফসের (জীবাত্মার) জন্য যাহা পাঠাইবে ভালো হইতে তাহা পাইবে আল্লাহর নিকটে উহা খুব ভালো (খাইরান) এবং আজমতওয়ালা পুরস্কার এবং আল্লাহর দিকে মাফ চাও। নিশ্চয়ই আল্লাহ রাহিম-রূপে (রাহমান-রূপে নয়) দয়ালু। [হবহ রার্থতে গিয়ে বাক্যের সৌন্দর্য কিছুটা হৌচট খায়]। (ওয়া আকিমুস সালাতা ওয়া আতুজ্জাকাতা ওয়া আকরিদুল্লাহী কারদান হাসানা; ওয়ম্মা তুকাদদিমু লি আনফসিকুম মিন খাইরিন তাজিদুহ ইনদাল্লাহি হওয়া খাইরাও ওয়া আজামা

আজরান; ওয়াসতাগফিরুল্লাহা; ইন্নাল্লাহা গাফুরুর রাহিম)।

ব্যাখ্যা

সূরা মোজাম্মেলের এই ২০ নম্বর আয়াতটি কোরান-এর বড় আয়াত কয়েকটির মধ্যে একটি। আমরা ইহার কিছু অংশ বাদ দিয়ে সেই বিষয়টুকুই তুলে ধরতে চেষ্টা করেছি যে বিষয়টি সালাতের সঙ্গে তথা নামাজের সঙ্গে সংযুক্ত। এখানে সালাত ও জাকাত আদায় করার উপদেশটি দিয়ে একটি ‘এবং’ শব্দ দিয়ে আল্লাহ বলছেন : আমাকে (আল্লাহ) কর্জ হাসানা দাও, তথা সুন্দর ঋণ দাও (কারদান হাসানা)।

প্রশ্ন আসতে পারে সর্বশক্তিমান আল্লাহ কি এতই অভাবী (?) যে আপন বান্দার কাছে কর্জ চাইবেন তথা ঋণ চাইবেন? এই সুন্দর ঋণটি যাহা আল্লাহ সালাত-ও জাকাতকারীর কাছে চাইছেন, সেই সুন্দর ঋণটি বলতে কী বুঝানো হয়েছে? প্রতিটি নফস তথা জীবাত্মা তথা প্রতিটি মানুষকে আল্লাহ পরীক্ষা করার জন্য এই দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন। পরীক্ষার মূল বিষয়টি তথা একমাত্র বিষয়টি হলো, প্রতিটি নফসের সঙ্গে খান্নাসরূপী শয়তানকে যুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। এই খান্নাসরূপী শয়তানটিকে আপন নফস হতে বাহির করে দিতে হলে আল্লাহর সঙ্গে সংযোগ প্রচেষ্টায় তথা যোগাযোগের জন্য তথা সালাত কায়েমের জন্য অবিরামভাবে ধ্যানসাধনাটি করার আহ্বান জানানো হচ্ছে। যে ধ্যানসাধনাটি মহানবি নিজেই আড়াই হাজার ফুট উঁচুতে অবস্থিত নির্জন অন্ধকার হেরাণ্ডহায় ১৫টি

বহুর করে মানবজাতিকে চোখে আঙুল দিয়ে বুঝিয়ে দিয়ে গেছেন যে, ধ্যানসাধনার মাধ্যম ছাড়া খাল্লাসরূপী শয়তানটিকে বাহির করে দেওয়া বড়ই কঠিন।

সাধক যখন ধ্যানসাধনা করতে করতে হাঁপিয়ে ওঠে তখন সাধকের মনটি উদাস হয়ে পড়ে। তাই আল্লাহ সাধকদের জন্য বিরাট একটি সুসংবাদ দিচ্ছেন এই বলে যে, তুমি আমাকে কর্জে হাসানা দাও তথা উত্তম খণটি দান করো। এই উত্তম খণটির হাকিকি অর্থটি হলো আপন নফসের মধ্যে খাল্লাসরূপে বাস করা শয়তানটিকে তাড়িয়ে দেওয়া। কোরান-এর বর্ণিত এই কর্জে হাসানা-র মেকাজি অর্থটি যে যেভাবে ইচ্ছা করুক, তাতে অধম লিখকের কোনো আপত্তি রইল না। কারণ যে কোনো একটি বিষয় নিয়ে একাগ্রমনে গবেষণা করতে গেলে ভুলত্রুটির উপর দিয়েই এগিয়ে যেতে হয়। প্রতি পদে পদে গবেষকদের গবেষণার পথে ভুলত্রুটিগুলোর সাক্ষাৎ পাওয়া আশ্চর্যের কোনো বিষয় নয়। সুতরাং এই গবেষণার পথটিকে যে জাতি বন্ধ করে দিতে চায় সেই জাতিকে জাগতিক সভ্য জাতিদের হাসপাতালে স্যালাইন নিতে হয়। আমরা কঠিন বাস্তবের মুখোমুখি হয়ে এই করুণ দৃশ্যগুলো অহরহ দেখতে পাই।

সভ্য জাতি নব নব জিনিস আবিষ্কার করে চলছে আর গবেষণা বর্জিত জাতি সেইসব আবিষ্কারের ফসল কিনে

এনে ভোগ করতে বাধ্য হচ্ছে। অবশ্য এই কথাগুলো মেজাজি ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে খাটে, কিন্তু হাকিকি বিষয়ের উপর বিন্দুমাত্র খাটে না। কারণ সাধকদের কোনো জ্ঞাত নাই, কোনো সংকীর্ণতা নাই, কোনো গণ্ডির বলয়ে সে আবদ্ধ থাকে না।

এই কর্জে হাসানাতি সালাত তথা যোগাযোগ এবং জাকাত তথা নিজের নফসের সাথে যুক্ত খান্নাসটিকে কোরবানি করে দেওয়ার জাকাত যাতে আদায় করতে পারে তারই জন্য সর্বশক্তিমান আল্লাহ ঋণ চাইছেন। যেহেতু আল্লাহ ঋণ চাইছেন সেইহেতু এই ঋণটি নিঃসন্দেহে একটি সুন্দর ঋণ, একটি উত্তম ঋণ। সাধকের মঙ্গলের জন্যই আল্লাহ এই ঋণটি চাইছেন, নিজের প্রয়োজনের জন্য নয়, কারণ আল্লাহ অভাবমুক্ত।

অভাবমুক্ত হয়েও সাধকের কাছে যে ঋণটি চাইছেন সেই ঋণটি আর কিছুই নয়, বরং নফসের সঙ্গে পরীক্ষা করার জন্য যুক্ত-করে-দেওয়া খান্নাসরূপী শয়তানটিকে তাড়িয়ে দেওয়া। এই খান্নাসের অনেক রকম নাম আছে। যেমন, হাস্টি, খুদি, অহম, ইগো, ইগোসেন্সিটিসিটি, আমিতু, ‘আমি-আমি’ বলা ইত্যাদি। তাই আমরা দেখতে পাই, বিশ্বের বিখ্যাত আল্লাহর ওলি হজরত বাবা মনসুর হাল্লাজও আনাল হক তথা ‘আমিই সত্য’ বলে ঘোষণা করছেন, আবার একই মানুষ (দেহের বিচারে বলা হচ্ছে) ফেরাউন-ও ‘আমিই সত্য’ বলে

ঘোষণা করছে। একজন খান্নাসরূপী শয়তানটিকে তাড়িয়ে দিয়ে, আমিত্বটিকে বিনাশ করে, হাশ্টিটিকে সম্পূর্ণরূপে মিটিয়ে দিয়ে, আল্লাহতে ফানা হয়ে তথা আপন নফসের অভ্যন্তরে অতি সূক্ষ্ম রুহের অবস্থানটিকে সম্পূর্ণরূপে জাগ্রত করে তুলতে পেরেছেন।

বটবৃক্ষের বীজটি খুবই ছোট, কিন্তু ওই বীজ ধাপে ধাপে যখন পরিপূর্ণ বটবৃক্ষে পরিণত হয় তখন বিশ্বাসই হতে চায় না যে, এই বিশাল বটবৃক্ষটি সমস্ত গুণাগুণ ও শক্তি নিয়ে এত ক্ষুদ্র বীজের মধ্যে অবস্থান করেছে। রুহ নামক বীজটি, যাহা নফসের কাছেই আছে (একমাত্র মানুষ ও জিনের নফস; অন্য কোনো জীবের নফসের সঙ্গে আল্লাহ জাতরূপে থাকেন না)। উহাকে সাধক যখন ধাপে ধাপে ধ্যানসাধনার মাধ্যমে তথা সালাত ও জাকাতের সাহায্যে পরিপূর্ণ বটবৃক্ষের মতো পূর্ণ বিকশিত করে তোলেন তখন নফসটি রুহের কাছে হারিয়ে যায়। এই হারিয়ে যাওয়াটিকেই ফানাফিল্লাহ বলা হয়। ইহা কাগজ কলমে পাওয়া যায় না, ইহা মোটা মোটা বইতে পাওয়া যায় না, ইহা কথার বস্ত্রাতে পাওয়া যায় না, ইহা তর্ক-বিতর্ক ও বাহাসে পাওয়া যায় না, ইহা মাথার জ্ঞান দিয়ে পাওয়া যায় না—বরং বিরাট ধৈর্যধারণ করে একাগ্রতার সহিত অবিরাম ধ্যানসাধনার মাধ্যমেই পাওয়া যায়। তাই ইহাকে সিনার এলেম বলা হয় তথা বৃক্ষের জ্ঞান বলা হয়। সুতরাং মাথার এলেম

এক বিষয় আর সিনার এলেন্ন হাঙ্গিল করা সম্পূর্ণ অন্য বিষয়। সিনার এলেন্ন হাঙ্গিল করতে গেলে ঝুল-কলেজ-ভার্সিটি এবং মাদ্রাসা পাস করে হাঙ্গিল করা যায় না। কারণ কোনো নবি-রসুলই মাদ্রাসা পাস করে নবি-রসুল হন নি।

মাথার এলেন্নওয়ালাদের পেটে বোমা মারলেও সিনার এলেন্নের একটি বাক্যও বুঝা কষ্টকর হয়ে যায়, অথবা বুঝতে পারলেও ধ্যানসাধনার কষ্টসাধ্য জীবনটিকে জ্বাকাতরূপে আল্লাহকে দান করার প্রশ্নটিই ওঠে না। সুতরাং কর্জে হাসানার কথাটিতে একমাত্র সালাতি ও জ্বাকাতীদের লক্ষ করে আল্লাহ উত্তম খণটি চাইছেন। মাথার এলেন্ন হাঙ্গিলকারীরা কাগজে কলম ঘষে ঘষে মেজাজি এলেন্ন হাঙ্গিল করেন। কিন্তু সাধকেরা সিনার এলেন্ন হাঙ্গিল করার জন্য অবিরাম সালাত ও জ্বাকাতের কলম নামক সংযোগের মাধ্যমে আপন নফসটির ভেতর খান্নাসের অবস্থানটিকে তাড়িয়ে দেয়। সুতরাং দুইটি এলেন্নের পথ ও মত, ধারা ও কৌশল এক নয়, বরং সম্পূর্ণ আলাদা তথা ভিন্ন। সিনার এলেন্ন হাঙ্গিলকারীদের কথাগুলো শুনে মাথার এলেন্ন হাঙ্গিলকারীরা উপেক্ষা করে, এড়িয়ে যায়, অবজ্ঞা প্রদর্শন করে। তাই আমরা দেখতে পাই, আল্লাহর অনেক ওলিদেরকে মাথার এলেন্ন হাঙ্গিল করা ব্যক্তিরা পাগল বলে থাকেন। আবার পরক্ষণে আল্লাহর ওলিরাও

মাথার এলেন্ন হাঙ্গিলকারীদেৱ পাগল বলে থাকেন। অনেক আল্লাহ্‌র ওলিরা এ রকম কথাটিও বলে থাকেন যে, যারা এখনও পাগল হয় নি তাৱাই আসল পাগল তথা ‘উস্ত দেওয়ানা, দেওয়ানা নাগুদ।’

কথার ছড়াছড়ি, বিদ্যার দাপট, ভাষা শিক্কাৱ অহঙ্কাৱ যে-ই কৰুক না কেন, কৰতে দিন। কাৱণ সে যদি আসল রহস্যটির সামান্য গন্ধটিও পেত তা হলে আৱ এ রকমটি কৰতো না। সুতৱাং কাকে দোষ দেব? সবাই তো আপন আপন তকদিৱেৱ খেলাটি খেলে চলছে। যে বলে : এই রকম তকদিৱটিকে লাখি মেৱে ফেলে দেই- এই লাখি মেৱে ফেলে দেওয়াটাও সেই মানুষটির তকদিৱ। গভীৱ জলে বিচরণকাৱী ইলিশ মাছের বাঁকের সঙ্গে পুঁটিমাছের বাঁকের চলাচল কৰবাৱ, বিচরণ কৰবাৱ, অবস্থান কৰবাৱ বিধানটি আল্লাহ্‌র কেতাবে আল্লাহ্‌ই রাখেন নি। সুতৱাং কাকে দোষ দিতে যাৱ? গভীৱ জলের ইলিশ মাছের সুখাদু কয়েকটি ভাজা টুকরা বেশি খেলেই

পেট খাৱাপ হয়ে যাৱাৱ সম্ভাবনা থাকে। আৱাৱ ষাট ফুট উঁচুতে অবস্থান কৰা নাৱিকেল গাছের ডাৱটি ৱোদ-বৃষ্টি-জলের দাপটে অবস্থান কৰেও সেই ডাৱেৱ জল খেলে খাৱাপ পেট ভালো হয়ে যাৱ। তাই কোৱান- এ আল্লাহ্‌ এই কৰ্জে হাসানাটিকে আজমতওয়ালা পুৱঙ্কাৱ বলে ঘোষণা কৰছেন এবং আল্লাহ্‌র দিকে

(কখনই ‘মধ্যে’ হতে পারে না) ক্রমা চাইতে বলা হয়েছে। এই ক্রমাটি তখনই করা হয় যখন সাধক খান্নাসরুপী শয়তানটিকে তাড়িয়ে দিতে পারে। ইহা মোটেই সাধারণ মানুষের সাধারণ ক্রমা নয়। ইহা মোটেই সাধারণ মানুষের কাছে কর্জে হাসানা চাওয়া নয়, বরং সালাত ও জাকাত আদায়কারীর কাছে চাওয়া হচ্ছে। সুতরাং এই চাওয়াটি বিশেষ চাওয়া এবং দেওয়াটিও বিশেষ দেওয়া। এই বিশেষ দেওয়াটি ক্রমার আগে দেওয়া হয় না, বরং ক্রমার আরবি শব্দটিই হলো গফুর। আর যেখানে আল্লাহ বিশেষ দানটি করছেন সেখানে তিনি রহিম (কখনই রহমান নয়, কারণ রহমানরুপী দান সাধারণ দান)। সুতরাং আমাদের মনে হয় কোরান-এর একটি স্থানেও গফুরর রহমান পাওয়া যায় না, পাওয়া যায় গফুরর রহিম। তথা ক্রমার পরেই আল্লাহ রহিমরুপটি ধারণ করেন।

কোরান-এ সালাতের উল্লেখ : ৭৮

কোরান-এর ৭৪ নম্বর সূরা মোদাস্সেরের ৪২-৪৫ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে : কীসে তোমাদিগকে জাহান্নামের আগুন (সাকার)-এর মধ্যে ফেলিল? বলিবে, ‘আমরা মুসল্লিদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম না।’ (মা সালাকাকুম ফী সাকার। কালুলাম নাকু মিনাল মুসাল্লিন)।

ব্যাখ্যা

প্রথমেই বলতে হয় জাহান্নামের আগুন তথা সাকার বলতে কী বুঝায়। এবং এই জাহান্নামের আগুনে কারা জ্বলছে তাদের কথাটিও বলা হয়েছে। তারাই জাহান্নামের আগুনে জ্বলছে যারা মুসল্লিদের দলভুক্ত হতে পারে নি। কোরান-এর বাক্যটি আসলে চলমান ঘটনা তথা প্রজেক্ট কনটিনিউয়াস টেসে অথবা প্রজেক্ট ইনডেফিনিট টেসে বলা হচ্ছে। আমরা বাক্যটিকে সুন্দর করার জন্য অতীত অথবা ভবিষ্যৎ কালটি ইচ্ছা করেই ব্যবহার করি। ইহারও একটি বিশেষ কারণ আছে। সেই বিশেষ কারণটি হলো : জাহান্নামের আগুন ঘরবাড়ি জ্বালায় না। বনে-জঙ্গলে যে আগুনের দাবদাহ উহাও জাহান্নামের আগুন জ্বালায় না। জাহান্নামের আগুন নিজের শরীরে থাকা কাপড়-চোপড়গুলোও জ্বালায় না। এক কথায় জাহান্নামের আগুন শুধুমাত্র একটি জিনিসই জ্বালায় এবং জ্বালাবার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে সেই জিনিসটি হলো, জাহান্নামের আগুন কেবলমাত্র জিন ও মানুষের অন্তরটিকে জ্বালায়। এই অন্তরের জ্বালা বনের আগুন লাগার চেয়েও ভয়ঙ্কর। জাহান্নামের এই আগুন কেবলমাত্র অন্তরটিকে জ্বালায় এবং এই জ্বালাবার ভয়াবহতা এতই শক্তিশালী যে একজন ভুক্তভোগী অনেক সময় সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়। আমরা যে দুনিয়াতে বাস করছি, প্রতিনিয়ত সবাই কমবেশি এই জাহান্নামের আগুনে জ্বলছি। তাই

জাহান্নামের আগুনটি চোখে দেখা যায় না, বরং অন্তরে অনুভব করা যায়। তবে যারা মুসল্লি তথা সালাতি তথা নামাজি কেবলমাত্র তারা জাহান্নামের আগুনে জ্বলে না এবং জ্বলবে না। এখন একটু নিরপেক্ষ মনে চিন্তা করে দেখুন তো, মুসল্লিদের মর্যাদা এবং সম্মান আল্লাহর নিকট কতো উর্ধ্বের বিষয়! কতো উর্ধ্বের বিষয়টি হলে একজন মুসল্লিরও জাহান্নামের আগুনে জ্বলবার প্রশ্নই ওঠে না এবং জ্বলবেও না। কোরান-এ বর্ণিত এই জাতীয় মুসল্লিদের সংখ্যাটি কী রকম হতে পারে তা পাঠকের হাতেই ছেড়ে দিলাম।

এখানে মুসল্লির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে সালাতের সঙ্গে আরেকটি কাজ যোগ করে দেওয়া হয়েছে আর সেই কাজটি হলো : যারা অভাবী, যারা গরিব তাদেরকে প্রয়োজনীয় সাহায্য সহযোগিতা করা।

কোরান-এ সালাতের উল্লেখ : ৭৯

কোরান-এর ৮৭ নম্বর সূরা আলার ১৪-১৫ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে : যে নিজেকে পবিত্র করিতে পারিয়াছে অবশ্যই সে কামিয়াব হইয়াছে।

এবং যে জিকির করে তাহার রবের দিকে সুতরাং সালাত করে যোগাযোগ করে, সংযোগ করে। (কাদ আফ্লাহা মান তাজাক্কা ওয়া জাকারাস্মা রাখিহী ফাসাল্লা)।

ব্যাখ্যা

এই আয়াতে সর্বপ্রথম যে শব্দটির ব্যাখ্যা দেওয়াটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সেই শব্দটি হলো ‘পবিত্র’। পবিত্রতা দুই প্রকার : একটি ম্বেজাজি পবিত্রতা, অপরটি হাকিকি পবিত্রতা, ম্বেজাজি পবিত্রতা হলো ওজু-গোসল করে পবিত্র হতে হয়, আর হাকিকি পবিত্রতা হলো আপন নফস তথা জীবাত্মার ভেতরে দুধের সঙ্গে মাখন মিশিয়ে দেওয়ার মতো মিশিয়ে দেওয়া খান্নাসরুপী শয়তানটিকে বাহির করে দেবার পবিত্রতা। একটি সাধারণ পবিত্রতা এবং অপরটি অসাধারণ পবিত্রতা। কোরান-এর অন্যত্র বলা হয়েছে যে পবিত্র না হয়ে কেহই কোরান স্পর্শ করতে পারে না। ইহারও দুই রকম অর্থ আছে! একটি ম্বেজাজি পবিত্রতা এবং অপরটি হাকিকি পবিত্রতা। ম্বেজাজি পবিত্রতা দিয়ে কাগজ-কালি-কলমের দ্বারা লিখিত ছাপার অক্ষরের অথবা হাতের লিখা কোরানুল করিম-কে স্পর্শ করা যায়, কিন্তু পক্ষান্তরে হাকিকি কোরান তথা নুরি কোরান-কে স্পর্শ করতে হলে আপন নফস তথা জীবাত্মা হতে আপন নফসের ভিতরে লুকিয়ে থাকা খান্নাসরুপী শয়তানটিকে সম্পূর্ণরূপে বিতাড়িত করার পরই নুরি কোরান-কে স্পর্শ করতে পারে, অন্যথায় অসম্ভব। আমরা কাগজ-কালি-কলমের লিখিত কোরান এবং নুরি কোরান দুটোকে একত্র করে ফেলি। তাই আমাদের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণগুলো জগাখিচুড়িতে পরিণত হয় এবং মানুষ সত্য পথের

আলো দেখতে গিয়ে প্রতি পদে পদে আছাড় খায়, ধাক্কা খায়, ঊষটা খায় এবং এর ফলে বিভ্রান্তির জটাজালে আবদ্ধ হয়ে নৈরাজ্যের দিকে ধাবিত হতে বাধ্য হয়।

জুনুন নুরাইন হজরত ওসমান গনি (রা.) যখন কোরান-কে একত্রিত করছিলেন তখন মাওলা আলি (আ.) একটি কথাই বলেছিলেন আর সেই কথাটি হলো : আপনি যে কোরান সংগ্রহ করছেন উহা বোবা কোরান আর আমিই (মাওলা আলি) জীবন্ত কোরান। জুনুন নুরাইন হজরত ওসমান গনির সংগ্রহ করা কোরান-টির মূল্য অপরিসীম, কারণ দুনিয়ার সাধারণ মানুষেরা এই সংগৃহীত কোরান পড়েই শিক্ষালাভ করবে। আবার মাওলা আলির বর্ণিত কোরান-টিও মহাসত্য, কিন্তু এই মহাসত্য কোরান-টি সবার পক্ষে আলিঙ্গন করা তো বহু দূরের কথা এমনকি মোকাম্মে জাবরুতের শেষ প্রান্তে গিয়েও নুরি কোরান-কে বুঝতে পারা যায় না, বরং যদি কোনো সাধক আল্লাহর বিশেষ রহমতের দ্বারা লাহত মোকাম্মে প্রবেশ করতে পারে, তখনই নুরি কোরান-এর রহস্যটি পরিপূর্ণরূপে বুঝতে পারে, অন্যথায় অসম্ভব। অন্যথায় কতগুলো ব্যাকরণের মারপ্যাচ দেওয়া কথা শিখে নিজেও বুঝতে পারে না এবং অপরকে বুঝবার পথে ছোট ছোট দেয়াল দাঁড় করিয়ে রাখে। তাই এই সুরার ১৪ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে যে, যে নিজেকে পবিত্র করতে পেরেছে তথা

জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সার্বজনীনতার মহান ডাকে ডাক দিয়ে বলছেন : অবশ্যই সেই ব্যক্তি সাফল্যলাভ করতে পেরেছে তথা কামিয়াব হতে পেরেছে যে নিজেকে পবিত্র করতে পেরেছে।

অধম লিখকের মনে হয় কোরান-এর এই আয়াত দ্বারা মেজাজি পবিত্রতার কথাটি মোটেই বলা হয় নি। কোরান এখানে সর্বোচ্চ দর্শনটি বলে দিয়েছে। ওজু-গোসলের পবিত্রতা তো একটি অতি সহজসাধ্য ব্যাপার। ওজু-গোসলের পবিত্রতা তো চোর-চোঁটা, বাটপার, অজ্ঞানপাটি, মলমপাটি, গাটুপাটি, পগারপারপাটি, ছিনতাই পাটি, মীরজাফর, ইসলামের হিটলার হাজ্জাজ, মোয়াবিয়ার ছেলে এজিদ এবং আরও অনেককে ওজু-গোসলের মেজাজি পবিত্র হয়ে মেজাজি কোরান পাঠ করতে দেখেছি এবং অনেকেই দেখেছে। সুতরাং কোরান-এর এই আয়াতটিতে বলা হয়েছে যে, যে নিজেকে পবিত্র করতে পেরেছে সে অবশ্যই কামিয়াব হয়েছে। আরবি ভাষায় ‘লাকাদ’ শব্দটির অর্থটি ‘অবশ্যই অবশ্যই’ যাকে ইংরেজি ভাষায় ‘এসেনশিয়াল’ বলা হয়। সুতরাং এই আয়াত দ্বারা হাকিকি পবিত্রতার কথাটি তথা আপন নফসের অভ্যন্তরে লুকিয়ে থাকা খান্নাসরুপী শয়তানটিকে যে তাড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়েছে সেই তো কামিয়াব হয়েছে, সেই তো হাকিকি কোরান-এর হাকিকি অর্থগুলো পরিষ্কার বুঝতে পারে।

এই হাকিকি কোরান-এর রহস্যটি যদি কেউ জ্ঞানতে চায় তার জন্য পরের আয়াতে তথা ১৫ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে যে, এবং যে জিকির করে তথা আল্লাহকে পাবার আশায় যে ধ্যানসাধনায় মগ্ন থাকে রবরূপী আল্লাহকে হাসিল করার দিকে, সুতরাং সালাত করে তথা রবের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য অবিরাম চেষ্টা চালিয়ে যায়। রবের সঙ্গে সংযোগ প্রচেষ্টায় নিজেকে তিলে তিলে, ধাপে ধাপে এই সজ্জাতময় জীবন ও সংসারকে উপেক্ষা করে একাগ্রমনে যে এগিয়ে যেতে থাকে, সে-ই একদিন আল্লাহর বিশেষ রহমতে সালাতকে কায়েম করতে পারে তথা যোগাযোগটি চিরস্থায়ী করতে

পারে। যোগাযোগটি কখনও ছিন্ন হয়ে যায় না, যোগাযোগটিকে কোনো বৈষয়িক ঝড়-ঝঞ্ঝা ছিন্ন করতে পারে না, যোগাযোগটিকে কখনও

লোভ-মোহ সংসারের মায়ার বন্ধনগুলোর কোনো নেটওয়ার্কই আর ছিন্ন করে দিতে পারে না।

আমরা জিকির শব্দটিকে ‘স্মরণ করো’ লিখে সমস্ত দায়দায়িত্ব হতে মুক্ত হতে চাই। অথচ ‘স্মরণ করো’ তথা জিকির করো শব্দটির সত্যিকার অর্থটি কী হবে তা লিখক নিজেই বুঝতে পারেন না, অথচ ফস্ করে ‘স্মরণ করো’ কথাটি লিখে ফেলেন। যেন ভাবখানা এই রকম, অনেক কিছু বুঝে গেছি, কিন্তু প্রশ্ন করলে দেখা যায় কিছুই বোঝেন নি। এটা অনেকটা আন্ধাজে গুল মারার বিদ্যা। যে বিষয়টি, যে ঘটনাটি কোনোদিন কোনো কালেই দেখতে পারি নি সেই রকম ঘটনা ও

বিষয়গুলোর উপর ‘স্মরণ করো’ কথাটি একটি বিরাট আত্মবিরোধী কথা। যেখানে দেখিই নাই, সেখানে স্মরণ করার কথাটি আসতেই পারে না। আদমের তওবা ১০ই মোহরমের দিন কবুল হয়েছিল তাহা পৃথিবীতে বাস করা একমাত্র মা হাওয়া ছাড়া আর কেউই জানতেন না, তা হলে আদমের তওবা করার কথায় যদি ‘স্মরণ করো’ বলা হয় তা হলে কেমন শোনায়? মানবজাতিই জন্মায় নাই অথচ যদি বলা হয়, ‘স্মরণ করো’ তা হলে কেমন করে স্মরণ করবো? দুনিয়াতেই তো ছিলাম না। তা হলে স্মরণ করার প্রশ্নটিও হাস্যকর। সুতরাং জিকির শব্দের অর্থটি খুবই রহস্যপূর্ণ। কারণ জিকির অর্থ অনেকটা সালাতের মতো যোগাযোগ ও সংযোগ-এর কথাটি মনে করিয়ে দেয়। যেমন কোরান বলছে, ‘ইন্নাস সালাত লে জিকরি’ ইহার হুবহু বাংলাটি হলো, ‘নিশ্চয়ই সালাত তথা যোগাযোগটি যোগাযোগের জন্যই।’ কারণ সালাতও যোগাযোগ, জিকিরও যোগাযোগ। অনুবাদক মহাফাপড়ে পড়ে যায়। বাক্যের সৌন্দর্য আনতে গিয়ে অনুবাদক আসল দর্শনটি হারিয়ে ফেলে আর অনুবাদকের অকপট স্বীকার করে নেওয়াটি তথা ‘এই আয়াতটি বুঝতে পারলাম না’ বলাটি যেন একটি মহাপাপ বলে মনে করে, অনেকটা ‘বিসমিল্লাহির রাহমানুর রাহিম’- বাক্যটির অনুবাদ করার মতো। এখানেও অনুবাদক অনেকটা বাধ্য হয়ে গুলামারা বিদ্যাটি লিখে ফেলে। ‘বাধ্য হয়ে’ বললাম এ জন্য যে অনুবাদক এই আয়াতটির রহস্য না বোঝার দরুন- কারণ রহমান-ও দয়ালু রহিম-ও দয়ালু, কিন্তু অনুবাদক বুঝতে পারে না রহমান নামক দয়ালু শব্দটি কোথায় বসবে এবং রহিম নামক দয়ালু শব্দটি কোথায় বসানো হবে। অনুবাদক জানে না, রহমান অর্থ সাধারণ দান, যাহা মানবজাতির সকল ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবাইকে করা হয়। সুতরাং ইহা নিছক সাধারণ দান। কিন্তু পরক্লে রহিম শব্দটিও দয়ালু। রহিম-এর দানটি সবার জন্য নয়, বরং যারী ধ্যানসাধনার অবিরাম জিকির ও সালাতে ধ্যানমগ্ন হয়ে আছেন তাঁদেরকে তাঁদের নিজ নিজ খান্নাস হতে মুক্ত

করে দেবার বিশেষ দানটি করা হয় এবং এই বিশেষ দানটি ঋম্মার পরেই তথা আমিতু, হাম্ভি, খুদি, ইগো, অহমকে তাড়িয়ে দেবার রহমতটি যখন দান করা হয় তখনই সেই দানটিকে বলা হয় বিশেষ দান তথা খাসসুল খাস দান। এই দানে সাধকদের অবিরাম সালাতি ও জিকিরের মাধ্যমে মোকামে জাবরুতের শেষ প্রান্তে আসার পর আল্লাহ রহিমরূপে না-মোকামে সাধককে নিয়ে যান। ইহাই আল্লাহর ঋম্মার পরে দান করাটিকে বুঝায়। এই দানটির নাম গফুরর রহিম তথা ঋম্মার পরে যে দানটি করা হয় উহা রহিমরূপেই করা হয়। সুতরাং কোরান-এর একটি স্থানেও গফুরর রহমান শব্দটি নাই, বরং আছে গফুরর রহিম। সুতরাং আমিতু হতে উদ্ধারপ্রাপ্ত সাধকদেরকে যে দানটি করা হয় ওই দানের কথাটি যখন কোরান-এ উল্লেখ করা হয় তখনই আমরা আল্লাহকে ‘গফুরর রহিম’ রূপে দেখতে পাই কিন্তু ‘গফুরর রহমান’-রূপে একটিবারের তরেও দেখতে পাই না। অতএব রহমানরূপে সাধারণ দান, রহিমরূপে বিশেষ দান। তা না হলে কোরান-এর আয়াতটির অনুবাদ করতে হয় : তিনি দাতা এবং তিনি দাতা। অনুবাদক আয়াতের সৌন্দর্যবর্ধন করার জন্য শব্দটির হেরফের করে ফেলেন।

এমন কিছু ঘটনা আছে যা অতি প্রাচীন এবং কেহই স্বরণ করতে পারছে না। সেইখানে যদি ‘স্মরণ করো’ কথাটি বলা হয় তা হলে সেই ‘স্মরণ করো’ কথাটির আরবি শব্দ ‘জিকির’-এর আরও অনেক রকম রহস্যপূর্ণ অর্থ থাকতে পারে, যাহা অনুবাদক বুঝেও অনেকটা না বুঝার ভান করে। আসলে ‘সালাত’-ও যোগাযোগ, আবার ‘জিকির’-ও যোগাযোগ। সালাতটিকে যোগাযোগ অনুবাদ করা হয় আর জিকিরটিকে স্মরণ করো নামক ধান্দাবাজির অর্থটি করে আপন দায়িত্ব

হতে মূক্তি পেতে চায়। যাহা জীবনে কেউ দেখেই নি সেই বিষয়ের উপর ‘স্মরণ করো’ কথাটি কি একটি বিরাট আজগুবি বিষয় নয়?

চলমান ঘটনার বর্তমান কালটি এক সেকেন্ডেরও কম, তারপর সেই চলমান ঘটনাটি অতীতকালের দিকে ধাবিত হয়। ভবিষ্যৎকালের ঘটনাগুলো বর্তমানকালের আলো দেখার সঙ্গে সঙ্গে অতীতের দিকে চলে যায়। সুতরাং টাইম অ্যান্ড স্পেস সম্বন্ধে অতি হালকা একটি মোটামুটি ধারণা না থাকলে জটিলতার সম্মুখীন হতে হয়।

এই আয়াতটির এক স্থানে বলা হয়েছে, ‘এবং যে জিকির করে তার রবের দিকে’, কিন্তু এই কথাটি বলা হয় নি যে, ‘রবের মধ্যে’ কারণ রবের মধ্যে ডুব দিতে পারলে জিকিরও থাকে না সালাতও থাকে না, তথা নাম জপ আর থাকে না, বরং দর্শন হয়ে যায়। তাই বাগদাদের জগৎ বিখ্যাত ওলি হজরত বাবা আলি আহাম্মদ রুদবারি বলেন : যদি আমরা হতে আল্লাহর দর্শন বিলুপ্ত হয় তবে আমরা হতে দাসত্ববাদ ভেঙে যায়। মোহশূন্য জিকির ও সালাত রহস্যলোকের জ্ঞান উদয় হবার সবচেয়ে বড় সহায়ক এবং উহা যদি নির্জন বাসের মাধ্যমে করা যায় তো আরও বিরাট সহায়ক হয়ে দাঁড়ায়। আপন প্রবৃত্তি হতে যাহা চাওয়া হয় উহাকেই দুনিয়া চাওয়া হয় বলা হয়। সেই রকম দুনিয়া যে চায়

আবার সেই সঙ্গে আল্লাহকেও চায় ইহাকে বিশ্ববিখ্যাত
মাওলানা জালাল উদ্দিন রুমি পাগলামি বলেছেন। উনি
বলেছেন, ‘হাম খোদা খাহি ও হাম দুনিয়ায়ে দৈয়ি
খেয়ালান্ত তো মাহালাস্ত ওজু।’ অর্থাৎ ‘আমি আল্লাহও
চাই এবং দুনিয়াও চাই এই খেয়াল অসম্ভব তথা
পাগলামি।’

বিশ্ববিখ্যাত ওলি হজরত আহমদ হওয়ারি তাঁর নিজের
কাছে সংরক্ষিত হস্তলিখিত বইগুলো নদীতে ফেলে দিয়ে
বললেন, ‘এই সকল বই আমাকে সত্যপথের সন্ধান
দিয়েছে এবং আসল লক্ষ্যস্থলে যাওয়ার পথে মুরশিদ
পেয়েছি। যাত্রী যে পর্যন্ত পথে থাকে সে পর্যন্ত
পথপ্রদর্শকের প্রয়োজন হয়, যখন সত্যসাগরে ডুবে যায়
তখন পথের আর কী মূল্য থাকে?’

এই পথের নামই হলো জিকির ও সালাত। এবং এই
জিকির ও সালাতের হাকিকি তথা আসল তথা গোপন
অর্থগুলো বুঝিয়ে দেওয়া হয় এবং সেই বুঝানো পথে
অগ্রসর হয়ে আল্লাহর রহস্যসাগরে ডুবে যাবার পর আর
জিকির, সালাত ও মুরশিদের প্রয়োজন হয় না।
যাত্রাপথে এগিয়ে যাবার জন্য এই তিনটির প্রয়োজন
হয়। তাই কোরান অন্যত্র বলছে, এবাদত করো ততক্ষণ
পর্যন্ত, যতক্ষণ পর্যন্ত আইনুল একিন তথা প্রত্যক্ষদর্শন না
হয়। অনেকেই এই রকম কথার রহস্যগুলো না বোঝার
দরুন আইনুল একিন শব্দটির অর্থ করে ফেলেন মৃত্যুর
আগে পর্যন্ত এবাদত করে যাও। হায়রে খোদা, কোথায়
আইনুল একিন আর কোথায় মরণ পর্যন্ত! গৌজামিলের
তেলেসমাতি খেলা না বুঝে অনুবাদক খেলে যান আর
সরল বিশ্বাসে পাঠকেরা সেই কথার উপর ভিত্তি করে
লাফালাফি শুরু করে দেয়। ইহাতে উপকার তো হয়ই
না, বরং ঝগড়াঝাটি, বাহারি বাহাস, এবং পরিশেষে
লাঠালাঠির পর্যায়ে নেমে আসে। বিশ্ববিখ্যাত ওলি
হজরত বাবা আবু আলি আহমদ রুদবারি বলেছেন :

যাঁরা আল্লাহর প্রেমিক তাঁরা জীবিত। মরণ তাঁদের কাছে একটি ঘটনা মাত্র। ঘটনাটি পোশাক বদলাবার, এর বেশি কিছু নয়। বিশ্ববিখ্যাত ওলি হজরত আওয়াল হোসেন খেরকানি চমৎকার একটি উপদেশ আল্লাহর পথের যাত্রিকদের বলে গেছেন আর সেই কথাটি হলো : আল্লাহর প্রেমিকের কাছে সকল স্থানই মসজিদ, সকল দিনই শুক্লবার, সকল মাসই রমজান, তিনি যেখানেই থাকেন আল্লাহর সঙ্গে থাকেন। দুনিয়ার সব রকম জ্বালা-যন্ত্রণা ধৈর্য সহকারে সহ্য করে অবশেষে ইফতার করতে পেরেছেন। তিনি আরও বলেছেন, মানুষ জিকির ও সালাতের মাধ্যমে অধ্যাত্মবাদের উন্নত স্থানে অধিষ্ঠিত হতে পারে, কিন্তু বহু ধর্মানুষ্ঠানের মাধ্যমে নয়। বহু ধর্মানুষ্ঠানে নানান রকম কথার চালাচালি হয় আর জিকির ও সালাতের মাধ্যমে নিজের ভেতরে রুহরূপী রব যখন প্রকাশিত হয়ে পড়ে তখন আর কথা থাকে না, বরং নির্বাক হয়ে যান।

সূতরাং সূরা আলা-র ১৫ নম্বর আয়াতে যে বলা হয়েছে, ‘এবং যে জিকির করে তার রবের দিকে সূতরাং সালাত করে’ কথাটির মোটামুটি একটি হালকা ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করা হলো।

কোরান-এ সালাতের উল্লেখ : ৮০

কোরান-এর ৯৬ নম্বর সূরা আলাকের ৯-১০ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে: আপনি কি দেখিয়াছেন যে বাধা দেয় বান্ধা যখন সালাতের উপরে? (আরাই তাল্লাজি ইয়ান্‌হা আবদান ইজা সাল্লা)।

ব্যাখ্যা

এই দুটি আয়াতের মেজাজি অর্থটিকে ধরে নিতে হলে মহানবির সালাতের উপর বাধা প্রদানকারী আবু

জাহেলের নামটি এসে পড়ে। যদিও মহানবি সালাতের স্তম্ভ এবং আবু জাহেল বাধা প্রদানকারীদের স্তম্ভ। সম্পূর্ণ দুইটি মেরুতে অবস্থানকারী দুইজনের পরিচয়টির মাধ্যমে সমগ্র মানবজাতিকে বিষয়টি বুঝিয়ে দেবার জন্য কোরান-এর এ আয়াতে তুলে ধরা হয়েছে। আবু জাহেল মরে না, মারা যাবার প্রশ্নই ওঠে না, কেবলমাত্র আবু জাহেলের দেহটির মৃত্যু ঘটে। জঘন্যরূপী নরপিশাচ আবু জাহেল-মার্কানফসটির মৃত্যু তথা চির অবসান এই ঘটনার আগেও হয় নাই, পরেও হয় না এবং ভবিষ্যতেও কোনো দিন হবে না। এখানে আবু জাহেলকে জালেম শক্তির প্রতিমূর্তিরূপে দাঁড় করানো হয়েছে। তাই যুগে যুগে, কালে কালে মহানবির সাক্ষা অনুসারীদেরকে এই জালেম আবু জাহেল-মার্কানফসগুলো বাধা দিয়েই যাবে। এই দ্বান্দ্বিক দর্শনের সার্বজনীনতাটি এই কোরান-এর আয়াতে তুলে ধরা হয়েছে। তাই প্রথমেই বলা হলো আবু জাহেলের ঘটনাটি একটি মেজাজি ঘটনা। এই মেজাজি ঘটনার মাধ্যমেই সার্বজনীন চলমান ঘটনাগুলো যে ঘটে চলছে, চলে এবং চলবে সেই অতি অপ্রিয় সত্য কথাটি তুলে ধরা হয়েছে।

এই সুরার শেষ আয়াতে যে মহানবিকে সাবধান করে দেওয়া হয়েছে উহাও মেজাজি সাবধান তথা মহানবির জন্য মোটেই নয়। শেষ আয়াতে আরও বলা হয়েছে যে

এদেরকে অনুসরণ করবেন না। এই অনুসরণ করার কথাটি মহানবির উপর কোনো অবস্থাতেই খাটানো যায় না। যদি কেহ জোর করে খাটাতে চায় তা হলে সে একশত পার্সেন্ট কাফের। মহানবির মাধ্যমে যুগে যুগে মহানবির অনুসারীদেরকে এই জাতীয় পাপিষ্ঠদের অনুসরণ করতে মানা করে দেওয়া হয়েছে। মানা করার কোরান-এর ভাষাটিতে প্রচণ্ড শক্তিপ্রয়োগ করা হয়েছে। আরবি ভাষায় ‘কাল্লা’ শব্দটি দিয়ে বোঝানো হয়: কখনই নয় অথবা কোনো অবস্থাতেই নয়। তারপর বলা হয়েছে, সেজদা করুন এবং সেজদা করুন শব্দটি বলতেও দুই প্রকার অর্থ বোঝানো হয়েছে : একটি মেজাজি, অপরটি হাকিকি। মেজাজি সেজদা বলতে মাটিতে মাথা নত করাকে বুঝায় আর হাকিকি সেজদাতে বোঝানো হয়ে থাকে মনপ্রাণ এবং সব কিছু জীবনের সব চাওয়া-পাওয়াটুকু, আল্লাহর পাক দরবারে উৎসর্গ করে দেবার সেজদাটি। ইহাই হাকিকি সেজদা। ইহাই আপন নফস হতে খাল্লাস-বর্জিত সেজদা। এই হাকিকি সেজদা দিতে পারলে সেজদাকারী নিজেই বুঝতে পারে যে সে আল্লাহর অতি নিকটবর্তী হয়ে আছেন।

‘আম্মার নিকটবর্তী হও’, কোরান-এর এই কথাটির মূল্য অপরিসীম, কিন্তু সাধক যখন হাকিকি সেজদায় জীবনটিকে উৎসর্গ করে দেন তখন নিজেই বুঝতে পারেন যে তার আপন রব জাতরূপে তারই মাঝে বিকশিত ও প্রকাশিত হয়ে আছেন। দূরে অবস্থানকারী

প্রিয় বন্ধুটিকে বার বার ডাকা যায়, কিন্তু সেই প্রিয় বন্ধুটি যখন মুখোমুখি হয়ে দাঁড়ায় তখন আর ডাকার প্রয়োজনটি থাকে না। যদি তখনও কেহ ঘাউরাগ্নি করে ডাকতে থাকে তা হলে সেই প্রিয় বন্ধুটি তাকে পাগল মনে করবে। সুতরাং দূরে থাকলে ডাক আছে, অতি নিকটে আসলে আর ডাক থাকে না। সুতরাং দর্শনের বাহিরে ডাকাডাকি, চিল্লাচিল্লি, বাহারি আশ্ফালন এবং ঠাটবাটের উপাসনাপুলো থাকে, কিন্তু যখন যাকে এত ডাকাডাকি করা হচ্ছে সেই ডাকের প্রাণপ্রিয়টি আপন নফসের ভিতর হতে স্বরূপে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠেন, প্রকাশিত হয়ে পড়েন এবং বিকাশমান রূপধারণ করেন তখন ডাকের বদলে নির্বাক হয়ে যান। তাই চরম মুহূর্তে প্রভুকে আর ডাকা যায় না। কারণ প্রভু তো নিজের মাঝেই সমাসীন।

কোরানুল হাকিম-এর প্রায় অধিকাংশ আয়াতে আমরা মেজাজি এবং হাকিকি দুটো রূপই দেখতে পাই। এ যেন বৈষয়িক এবং অধ্যাত্মবাদের দ্বান্দ্বিক দর্শনের ফলশ্রুতি। এই উপসংহারটুকু যারা বুঝতে পারে না, বা যারা বোঝার শক্তি অর্জন করে নি, বা বুঝবার মতো জ্ঞানদান করা হয় নি তাদেরকেই বা কী দোষ দিতে যাব?

পরিশেষে একটি কথা বলতে বাধ্য হচ্ছি যে আবু জাহেলের হাত-পা, মাথা-মুণ্ডু, চোখ-কান-নাক তথা সমগ্র দেহটি তওহিদে বাস করে এবং যাহা তওহিদে বাস করে উহাই মুসলমান। সুতরাং আবু জাহেলের দেহটি মুসলমান হলেও আবু জাহেল নামক নফসটি হলো প্রচণ্ড কাফের এবং ভীতিপ্রদ কাফের। আবু জাহেল মোটেই সাধারণ কাফের নয় এবং আবু জাহেলের

নফস্টি মোটেই সাধারণ কাফের নয়, বরং শয়তানের চারটি রূপ দিয়ে টাইট করে বাঁধানো একটি বিভীষিকাময় কাফের। শয়তানের যে চারটি রূপ তথা ইবলিস, শয়তান, মরদুদ এবং খান্নাস— এই চারটি পরিপূর্ণ রূপে আবু জাহেলের নফসটিকে চন্দ্রগ্রহণ-সূর্যগ্রহণের মতো সম্পূর্ণ গিলে ফেলেছে। তাই আবু জাহেল এবং তার মতো অনুসারীরা যেদিকেই তাকায় সেই তাকানোর মাঝে ধ্বংস আর বিভীষিকা লেলিহান জিহ্বার মতো লক লক করছে। আবু জাহেলের দেহটি একটি পোশাক। ছিন্ন পোশাক ফেলে দিয়ে মানুষ যেমন নূতন পোশাক ধারণ করে সেই রকম আবু জাহেলেরা যুগে যুগে পুরাতন পোশাকগুলো ফেলে দিয়ে নূতন শয়তানি পোশাক ধারণ করে মানব সমাজ জীবনটিকে অস্থির করে তোলে। আবু জাহেলের নফসটি যখন দেহ হতে বিদায় গ্রহণ করলো তখন দেহটির নাম হয়ে যায় লাশ। আবু জাহেলের লাশের আকার, ধরে নিলাম, সাড়ে তিন হাত, কিছু মহাপাপিষ্ঠ আবু জাহেল নামক নফসটি, যাহা চর্মচক্রে দেখা যায় না, উহা মাপা যায় না। তখন উহাকে আমরা অপশক্তিরূপে আখ্যায়িত করি। সুতরাং ব্যক্তি আবু জাহেল একটি ম্লেজাজি উদাহরণ। আর হাকিকি আবু জাহেল যুগে যুগে, কালে কালে চলমান একটি অভিশপ্ত দানবীয় শক্তি। এই শক্তি হতে কেমন করে মুক্তি পাওয়া যায় তারই ব্যবস্থাপত্রটির

নাম কোরানুল মবিন এবং এই কোরানুল মবিন-এর যিনি স্রষ্টা তিনি হলেন আল্লাহ জ্বাল্ল শানাহ জ্বুলজ্বালালুহল ইকরাম।

আরেকটি প্রশ্ন হয়তো উঠে আসবে, প্রশ্নটির উত্তরও হয়তো সামান্য কিছু জ্ঞান থাকারই কথা, কিন্তু রহস্যলোকের সব কথা আমভাবে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে তুলে ধরাটিকে অধম লিখক ব্যক্তিগতভাবে মোটেই সমীচীন মনে করি না। তবে বিশেষ বিশেষ খাস মুরিদ ও খলিফাদেরকে বলা যায়। তাই পাঠক বাবা-মায়েদের কাছে আমি করজোরে ক্রমা চেয়ে নিলাম। তবে মহানবির বিষয়টির সামান্য ইঙ্গিত দিয়ে গেলাম। মহানবি জ্ঞাত নুরের তৈরি। সেফাতি নুরে ফেরেশতারা তৈরি। আর মানুষেরা মাটির তৈরি। তাই কোরান-এর কোথাও ‘আনা ইনসানুল মিসলেকুম’ তথা আমি তোমাদেরই মতো মানুষ, এই ইনসান শব্দটি একটি আয়াতেও পাওয়া যায় না।

অধম লিখক ফতোয়াবাজ নয়, তবু একটি প্রশ্নে অধম লিখক একটি মাত্র ফতোয়া দিচ্ছে, আর সেই ফতোয়াটি হলো, যারা মহানবিকে মাটির তৈরি বলে মনে করে তারা ১০০% কাফের। তারপরে আরেকটি প্রশ্ন থাকে আর সেই প্রশ্নটি হলো, মহানবিও কি তাঁর জ্ঞাতনুরের তৈরি সাড়ে তিন হাত দেহটিতেই সীমাবদ্ধ নাকি

সর্বভূতে বিরাজিত? মহানবির দেহটি কি মদিনার রওজাতেই সীমাবদ্ধ নাকি সর্বস্থানে সর্বাবস্থায় বিরাজিত? মদিনার রওজায় মহানবির অবস্থানটি হলো ম্বেজাজি অবস্থান। আর মহানবির হাকিকি অবস্থানটি তিনি নিজেই বলে গেছেন, ‘আউয়ালুনা মোহাম্মদ, আওসাতুনা মোহাম্মদ, আখেরুনা মোহাম্মদ, কুল্লানা মোহাম্মদ’ অর্থাৎ ‘আদিতে আমরা মোহাম্মদ, মাঝখানে আমরা মোহাম্মদ, শেষেও আমরা মোহাম্মদ এবং সর্বস্থানে আমরা মোহাম্মদ।’

এই কথাগুলো বলতে গিয়ে একটি সামান্য অপ্রাসঙ্গিক কথা বলতে বাধ্য হলাম আর সেটা হলো, বিশ্ববিখ্যাত আল্লাহর ওলিরা ‘আনাল হক’ বলেছেন, ‘আনা সুবহানি’ বলেছেন, ‘লাইসা ফি জুব্বাতি সেওয়া আল্লাহ তায়ালা’ বলেছেন, ‘জাতে সুবহানি’ বলেছেন, ‘খাহেকে, হআল্লাহ’ বলেছেন, ‘বালকে খোদারা’ বলেছেন, কিন্তু একটিবারও ভুলেও এই কথাটি বলেন নি যে ‘আনা মুহাম্মদ’ তথা ‘আম্মিই মোহাম্মদ।’ সুতরাং জ্ঞানীদের জন্য ইশারাই যথেষ্ট, যাকে উর্দু ভাষায় বলা হয় ‘আকেল মন্দকে লিয়ে ইশারাই কাফি হ্যায়।’

ম্বেজাজি শেরেক এবং হাকিকি শেরেকের মাঝে আকাশ-পাতাল পার্থক্য। ম্বেজাজি শেরেকে আপন নফসের ভেতর খান্নাসরুপি শয়তানটিকে নিয়ে উপাসনা-আচার-অনুষ্ঠান পালন করাটিকে শেরেক বলা হয় না তথা শেরেক ধরা হয় না, কিন্তু পরক্ৰমে হাকিকি অর্থে

আপন নফসের
সঙ্গে খাল্লাসরূপী শয়তানটি যতদিন অবস্থান করবে
ততদিনই শেরেকে ডুবে আছে বলা হয়।

ম্লেজাজি অর্থে হাজার হাজার বার ‘আউজুবিল্লাহি
মিনাশ শায়তোয়ানুর রাজ্জিম’ তথা ‘প্রশ্রবের আঘাত
খাওয়া আপন নফসের ভেতরে অবস্থান করা শয়তানটি
হতে আশ্রয় চাই’ পড়লেও শয়তান মোটেই ছেড়ে দেবে
না। তাই কেমন করে, কী উপায় অবলম্বন করলে,
কীসের মাধ্যমে এবং কীসের সাহায্য নিয়ে আপন নফসে
অবস্থান করা শয়তানটিকে তাড়ানো যায় সেই
ব্যবস্থাপত্রটি যাঁরা দান করবার উপযুক্ত সেই পীরের
কাছে গিয়ে শিক্ষাটি গ্রহণ করতে হয়। মহান আল্লাহ তো
তাঁর কালাম তথা কোরানুল করিম, ইঞ্জিল শরিফ,
জবুর শরিফ, তাওরাত শরিফ সর্বশক্তিমান হয়েও
সরাসরি পাঠিয়ে দিলেন না, বরং মহানবি, হজরত ইসা
রুহল্লাহ (আ.), হজরত দাউদ (আ.)-র ঠোট
মোবারক হতে পেলাম! আল্লাহ সর্বশক্তিমান হয়েও
নবিদের উসিলায় কালাম পাঠিয়ে দিলেন, আর আমরা
অসহায়রা কি গুরু ধরে তথা পীর ধরে আল্লাহর দিকে
অগ্রসর হবো না? যার যার তকদির তার তার কাছেই
পীর ধরা আর না-ধরার যুক্তিগুলো তুলে ধরবে। ইহাই
তকদিরের দুঃখজনক অথবা আনন্দদায়ক নিয়তির
লিখন, খণ্ডাবার বিধানটি আছে কিনা জানা থাকলেও
বলবো না।

তওহিদে একেরই অবস্থান, একেতেই স্থিতি। তওহিদে দু'য়ের স্থান নাই, বহু স্থান থাকার তো প্রশ্নই আসে না। সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত সাধক এবং তার পীর উভয়ে একত্রে অবস্থান করেন, ততক্ষণ পর্যন্ত হাকিকি সূক্ষ্ম শেরেকে অবস্থান করছেন। সুতরাং পীর ধরাও একটি অর্থাৎ সূক্ষ্ম শেরেক। এই পীরের মাধ্যমে দিয়ে যখন আপন নফস হতে খান্নাসরূপী শয়তানটিকে সম্পূর্ণরূপে বাহির করে দিতে পারবে তখনই সাধক তওহিদে অবস্থান করে।

ইমামুল আউলিয়া হজরত বাবা বায়েজিদ বোস্তামি আওলাদে রসুল হজরত ইমাম জাফর সাদেক (আ.)-এর কাছে মুরিদ হয়ে তাঁর নির্দেশিত পথে ধ্যানসাধনা করে যখন মোকামে জাবরুতের শেষ সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে আছেন তখন তিনি বললেন, 'হে আমার রব, আমি আপনার উপর সন্তুষ্ট।' প্রতি-উত্তরে রব বললেন, 'বায়েজিদ, যদি তুমি সত্যিই আমার উপর সন্তুষ্ট থাকতে তা হলে তোমার মুখে এই রকম কথা না শুনে অন্যরকম কথা শুনতে পেতাম।' বায়েজিদ লজ্জিত হয়ে আবার কঠোর ধ্যানসাধনার রেয়াজতে মশগুল হয়ে গেলেন। এবং কিছুদিন পরে বলে ফেললেন, 'আনা সুবহানি, মা আজামুশশানি' অর্থাৎ 'আমিই সুবহানি, সব শান আমারই।' ইহাই তওহিদে অবস্থান করার হাকিকি দর্শন।

বিশ্ববিখ্যাত ওলি হজরত জুন্নুন মিসরি পীরের দেওয়া ধ্যানসাধনার পথে এতই কঠিন সাধনা করেছিলেন যে এক্কেকালের পর তাঁর কপালে নুরানি অন্ধরে যে বাণীটি লিখা ছিল তা হলো ‘হাজা হাবিবুল্লাহে মা তা ফি হব্বুল্লাহে কাতিবুল্লাহে মা তা বে সাইফুল্লাহে’ অর্থাৎ ‘ইনি আল্লাহর বন্ধু আল্লাহর এশকের মধ্যে জীবন দান করেছেন (এবং) আল্লাহর পথে শহিদ হয়েছেন (এবং) আল্লাহর তরবারিতে শহিদ হয়েছেন।’ এই সেই বিখ্যাত ওলি, যাকে হজ্জাতুল ইসলাম বাহালুল উলুম ইমাম গাজ্জালি তাঁর অমর গ্রন্থটিতে পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ করে গেছেন। সাধারণ মানুষ অথবা ওহাবি ফেরকার অনুসারীরা বলতে পারে যে, কেমন করে হজরত জুন্নুন মিসরি আল্লাহর তরবারিতে শহিদ হয়েছেন? জুন্নুন মিসরির এই শহিদ হওয়াটা মেজাজি তরবারি হাতে নিয়ে মেজাজি শত্রুদের বিরুদ্ধে মেজাজি জেহাদটি করেন নি এবং করার প্রশ্নটি ওঠে না। তিনি আপন নফসের ভেতর খান্নাসের লক্লকে শত জিস্মাকে রেয়াজতের তরবারি দ্বারা হত্যা করতে পেরেছেন, মেজাজি জেহাদের মেজাজি তরবারি নিয়ে দৌড়াদৌড়ি করেন নি। হায় রে খোদা! এত বড় ওলির বিরুদ্ধেও যখন নানা রকম মন্তব্য ছুঁড়ে দেওয়া হয় তখনই মনে হয় এই দুনিয়াতে আল্লাহ অনেক অনেক মানুষের সুরতে পশুর চেয়েও অধম তৈরি করে রেখেছেন। তাই বলতে ইচ্ছা

করে, আল্লাহর খেলা আল্লাহই খেলে চলছেন; আবার আল্লাহই বলছেন, আমার (আল্লাহর) কোনো খেলার মধ্যেই বিন্দুমাত্র ভুলত্রুটি পাবে না। যদি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে চাও তো ভুল তো দেখতেই পাবে না, বরং আপন চোখের দৃষ্টি বিস্ফারিত হয়ে আপনার কাছেই ফেরত আসবে।

সুতরাং নাসুত, মালাকুত, এবং জাবরুত— এই তিনটি মোকাম পর্যন্ত ‘আমি’ নামক নফসটি আছে, সঙ্গে খাল্লাস আছে, সঙ্গে রহরুপী আল্লাহ আছেন এবং পীরের ধ্যানটি আছে। যেইমাত্র সাধককে আল্লাহ বিশেষ রহমতে রহিম-রূপধারণ করে ক্রমা করে দেন তখনই লাহত মোকামে প্রবেশ করতে পারেন। লাহত মোকামে প্রবেশ করামাত্র সাধক দেখতে পান, আপন পীরও নাই, নফসের সঙ্গে সঙ্গীরূপে থাকা খাল্লাসটিও নাই। এবং তখনই চিৎকার দিয়ে ঘোষণা করেন, ‘আনাল হক’, ‘লাইসা ফি জুব্বাতি সেওয়া আল্লাহ তায়ালা’, ‘আনা সুবহানি মা আজ্জামুশ শানি’, ‘মাতলে আনোয়ারে জাতে সুবহানি সুদাম’, ‘না দিদাম মোস্তফারা বালকে খোদারা,’ ‘জাম্মালে খুদ জাম্মালে ইয়ারে দিদাম’, ‘খাহে কে আনাল্লাহে বণ্ড খাহে কে হ আল্লাহ’, ‘মান না আম মাসুদ বিল্লাহ মান না আম’, ‘হাজারগুথানে মা বারকান্দা বাশি’, ‘না ম্যায় ম্যায় না তু তু ফাকাদ একি

হ হ্যায়’, ‘লেচাল উজ্জ দেশ মে জিদার আলিফ মে লাম নাহি’, ‘সোহহম সোহমি’, ‘তুই মুই, মুই তুই।’

আফসোস! এই লক্ষ লক্ষ ওলি-গাউস-কুতুব-আবদাল-আরিফরা যেখানে এক রকম কথাটি বিভিন্ন ভাষায় বলছেন, সেখানে ওহাবি আলেম-উলামারা প্রচার করে বেড়ায় যে পীর না ধরে আল্লাহকে সোজা ডাকতে হবে। ওহাবি আলেম-উলামাদের কথাটি যদি সত্য বলে ধরে নেই তা হলে এই লক্ষ লক্ষ বিশ্ববিখ্যাত ওলিরা সবাই ফোর টুয়েন্টি হয়ে যায়, আর যদি এই ওলিদের কথাগুলো নিরেট সত্য কথাটি বলে মনে হয় তা হলে ওহাবি আলেম-উলামারা ফোর টুয়েন্টি হয়ে যায়। এখন পাঠক বাবা মাসেদের কাছেই বিচারের ভারটি তুলে দিলাম, কারটা গ্রহণ করে নেবে। তবে আপনার বাবারও সাধ্য নাই যে আপনি কোনোটি গ্রহণ করে নেবেন। কেন? জন্মের আগেই আপনার তকদিরে নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে যে আপনি কোনটি গ্রহণ করবেন। কথাগুলো শুনলে অবাক হতে হয়, মনে মনে দুঃখ পাওয়া যায়, কিন্তু তকদির বিষয়টির উপর কিছুই করার থাকে না। যেমন এইডস-এ আক্রান্ত মুম্বু রোগীটির মৃত্যুর দৃশ্যটিতে বিশ্বের সব জাঁদবেল ডাক্তাররা অসহায় দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে।

কোরান-এ সালাতের উল্লেখ : ৮৬

কোরান-এর ৯৮ নম্বর সূরা বাইয়্যিনাহ-এর ৫ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে: এবং আদেশ দেওয়া হয় না একমাত্র আল্লাহর এবাদত করার জন্য মাত্র একটি বিষয়ে নিষ্ঠাবান (মুখলিসিন একাগ্র, একনিষ্ঠ, বিশুদ্ধ চিত্তে, পবিত্র মনে, পরিশুদ্ধভাবে) দীনের জন্য সত্যে অবস্থান করিয়া (হনাকা)

এবং সালাত কায়েম করো এবং জাকাত আদায় করো এবং ওইটাই প্রতিষ্ঠিত ধর্ম। (ওয়া মা উমিরু ইল্লা লিইয়া বুদুল্লাহা মুখলিসিনা লাহদীন, হনাফা আ ওয়া ইউকিমুস সালাতা ওয়া ইউতুজ্ জাকাতা ওয়া জালিকা দীনুল কাইয়্যিমাহ)।

ব্যাখ্যা

কোরান-এর এই আয়াতটির হুবহু অনুবাদ করতে গিয়ে বাক্যের সৌন্দর্যটি হারিয়ে ফেলতে বাধ্য হই। যা-তা লিখে গড়পরতা অনুবাদ করার পক্ষপাতী আমরা নই। আমরা আন্তরিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাই এবং এই আন্তরিক প্রচেষ্টার মধ্যেও যদি সামান্য ভুলত্রুটি থেকে যায় উহার জন্য ক্ষমাপ্রার্থী। এই আয়াতটির ব্যাখ্যা লিখতে গেলে প্রথমেই লিখতে হয় যে দীন দুই প্রকার : একটি আল্লাহর দীন এবং অপরটি মানুষের দীন। আল্লাহর দীন এক, অখণ্ড, অদ্বিতীয় এবং উহার কোনো পরিবর্তন নাই (সুল্লাতাল্লাহে লা তাবদীলা)।

কেন আল্লাহর দীন এক ও অখণ্ড এবং অদ্বিতীয়? কারণ সমগ্র কোরান-এর সমগ্র ভাষণে সমগ্র আদেশ-উপদেশে মাত্র একটি কথাই আল্লাহ বার বার বিভিন্ন ভাষার স্টাইলে বলেছেন আর সেই একমাত্র উপদেশটি হলো : মানুষের নফসের সঙ্গে তথা জীবাত্মার সঙ্গে তথা প্রাণের সঙ্গে যে খান্নাসরূপী শয়তানটিকে পরীক্ষা করার জন্য দিয়ে দেওয়া হয়েছে উহাকে তাড়িয়ে দেওয়া, উহা হতে তথা খান্নাস হতে সম্পূর্ণ মুক্ত হওয়া। মূল উপদেশের প্রশ্নে সমগ্র কোরান মাত্র একটি উপদেশই দিয়েছে। তাই আল্লাহর দীন এক, অখণ্ড এবং অদ্বিতীয়।

কর্মের বিভিন্নতা থাকতে পারে, কর্মের প্রকারভেদ থাকতে পারে, কিন্তু সব কর্মের মূল বিষয়টি হলো আল্লাহর দীনকে কায়েম করা। খান্নাস আপন নফসের সঙ্গে যত ক্ষুদ্র আকারেই থাক না কেন, সেই থাকাটি মোটেই আল্লাহর দীনের প্রশ্নে বাঞ্ছনীয় নয়। অপরপক্ষে মানুষের দীন তথা ধর্ম অসংখ্য, অগণিত এবং ঋণস্থায়ী। যদি আল্লাহর একমাত্র দীনের রঙে রাঙিয়ে না নেওয়া হয় তা হলে এই অগণিত কর্মগুলো সম্পূর্ণ বৃথা। আল্লাহর দীন এবং মানুষের দীন বিষয়টির বিস্তারিত ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ যিনি কোরান-হাদিস দিয়ে সুন্দরভাবে লিখে গেছেন তাঁর নাম শাহ সুফি সদর উদ্দিন আহমদ চিশতী- তাঁর বিখ্যাত বই মসজিদ দর্শন-এ। তাই এই বিষয়টির বিস্তারিত ব্যাখ্যায় আর অগ্রসর হলাম না।

এখানে প্রথমেই বলা হয়েছে, একমাত্র আল্লাহর এবাদত করার জন্য আদেশ দেওয়া হচ্ছে— এবং সেই আদেশের প্রতি নিষ্ঠাবান হতে বলা হয়েছে। ‘মুখলেসিন’ আরবি শব্দটির অনেক রকম অর্থ হতে পারে, কিন্তু এখানে বিশুদ্ধ চিত্তে তথা পবিত্র মন নিয়ে একমাত্র আল্লাহর এবাদত করতে বলা হয়েছে।

চিত্তের বিশুদ্ধতা বলতে কী বুঝায়? আর মনের পবিত্রতা বলতেই বা কী বুঝায়? চিত্ত তথা নফস কখন বিশুদ্ধ হয়? মন তথা নফস কখন পবিত্র হয়? একই কথা বার বার কতবার বলবো? অথচ বলতেই হবে। কারণ মূল কথার প্রশ্নে কোরানুল করিম বার বার একই কথা অনেক রকম ভাষায় আমাদেরকে বুঝিয়ে দিচ্ছে। আমরা বুঝেও বুঝি না। আমরা জেগে থেকে ঘুমাই। তাই শত চেষ্টা করেও আসল কথাটি উদ্ধার করতে বড়ই কষ্ট হয়। বিশাল কালো কয়লার বিশাল আবর্জনার অভ্যন্তরেই হাতে গোনা কয়টি উজ্জ্বল বর্ণের হীরা পাওয়া যায়। এই আয়াত যারা আল্লাহর মূল রহস্যটি বুঝতে পারে, জানতে পারে সেইসব সাধকদেরকে লক্ষ করে বলা হয়েছে, তাই সাধকদের বলা হচ্ছে : তোমরা একান্ত মনে, বিশুদ্ধ চিত্তে, পবিত্র মনে আল্লাহর দীনকে কায়েম করার জন্য অবিরাম সালাত ও জাকাত আদায় করে যাও। এই সালাতটি দায়েমি সালাত, তথা অবিরাম আল্লাহর সঙ্গে সংযোগ

প্রতিষ্ঠা করার তরে এগিয়ে যাও। অবশ্য ওয়াক্‌ফিয়া সালাতের মাধ্যমেই ধীরে ধীরে দায়েমি সালাতের দিকে এগিয়ে যাওয়া যায়। মহানবি বলেছেন, ‘আস্‌সালাতুদ দাওয়ামি আফজালুম্‌ মিনাল সালাতিল ওয়াক্‌ফি’ অর্থাৎ ‘ওয়াক্‌ফিয়া সালাত হতে দায়েমি সালাত অনেক বেশি মর্যাদাপূর্ণ।’ সূরা মারেরজের ২৩ নম্বর আয়াতেও বলা হয়েছে : যাহারা সালাতের উপর দায়েম তথা সর্ব অবস্থায় যোগাযোগের সালাতটিতে মশগুল হয়ে আছে এরাই প্রকৃত

সালাতি। এই রকম সালাতিদের প্রতিটি কাজ-কর্ম, চলাফেরা, আচার-অনুষ্ঠান এবং নিদ্রা যাওয়া সবই দায়েমি সালাতের অন্তর্ভুক্ত। যে সকল সাধকেরা অবিরাম ধ্যানসাধনায় দায়েমি সালাতকে প্রতিষ্ঠা করার তরে উঠে-পড়ে লেগে আছে তাদেরকেই এই আয়াতে উপদেশ দেওয়া হয়েছে। এই আদেশ-উপদেশটি মোটেও অতিসাধারণ মানুষের জন্য নয়, বরং যারা চিন্তাশীল, যারা সত্যের জন্য জ্ঞান অন্বেষণ করে, যারা সত্যের পূজারি, যারা সত্যকে বুকে ধারণ করার জন্য জীবন বাজি রেখে জ্ঞান গবেষণায় মেতে থাকে, যারা আল্লাহর রহস্যলোকের পর্দা তথা পিন্‌হানি উন্মোচন করার জন্য উঠে পড়ে লেগে আছে, তাদের জন্যই কোরান-এর এই পবিত্র উপদেশটি দেওয়া হয়েছে। তারপর বলা হয়েছে জাকাতের কথাটি। এই জাকাত সম্পত্তির আড়াই ভাগ দান করার জাকাত নয়, যদিও সম্পত্তির আড়াই ভাগ দেওয়াটাও জাকাত, তবে ইহা মেজাজি জাকাত। এমন

কোনো নবি-রসুলের আগমন এই ধরাধামে হয় নি, যারা জাকাত আদায় না করেছেন। নবি হজরত আদম (আ.) সম্পত্তির আড়াই ভাগ কাকে জাকাত দিয়েছিলেন? সম্পত্তির আড়াই শতাংশ দেবার মতো মানুষ কোথায়? তা-ও আবার অভাবী মানুষ হতে হবে, কারণ মেজাজি জাকাত অভাবীদেরকে দান করার বিধানটি দেওয়া হয়েছে। যেখানে মানুষই নাই সেখানে অভাবী শব্দটি একটি অবাস্তব শব্দ।

আপন নফসের অভ্যন্তরের খান্নাসকে বিতাড়ন করার ধ্যানসাধনাটি হলো হাকিকি জাকাত। এই হাকিকি জাকাতটি দান করতে পারলেই ইনসানে কাম্মেল হয়ে যায়। এদেরকেই সম্যক গুরু, চেতন গুরু, পীরে কাম্মেল ইত্যাদি নামে আখ্যায়িত করা হয়। আমাদের সীমিত বুদ্ধিতে এবং সীমিত অভিজ্ঞতায় এইটুকু অল্পত বুঝতে পারি যে আলোর সঙ্গে অন্ধকার থাকিটি অবধারিত। ভালোর সঙ্গে মন্দ, খাঁটির সঙ্গে ভেজাল, তওহিদের সঙ্গে মূর্তিপূজা (আপন প্রবৃত্তির চাহিদাগুলোই মূর্তি) এবং নিজের মধ্যে দুইয়ের অবস্থানের শেরেক হতে মুক্তি পাবার ধ্যানসাধনার জন্য অবিরাম সালাত ও জাকাত করে যাবার উপদেশটি এই আয়াতে দেওয়া হয়েছে এবং আরও বলা হয়েছে যে, জেনে রাখো, এটাই আল্লাহর প্রতিষ্ঠিত দীন তথা ধর্ম। এই কায়েমি দীনের মধ্যে অবস্থান করার জন্য সাধকদেরকে কোরান-এর এই আয়াতে আশ্বান জানানো হয়েছে।

কর্ম বন্ধন নয়, বরং কর্ম এবাদত। কর্মের অভ্যন্তরে খান্নাসের দেওয়া কামনাগুলো যখন আপনার ভিতর হতে প্রকাশিত হয়ে পড়ে তখনই কর্মটি বন্ধনে পরিণত হয়ে যায়। খান্নাসের চাওয়া-পাওয়াগুলো মানব দেহের বাহিরে থাকে না, বরং নফসের অভ্যন্তরেই লুকিয়ে থাকে। সেই কামনাগুলো যখন কর্মগুলোর উপর হস্তক্ষেপ করে বসে তখনই কর্ম বন্ধন হয়। সুতরাং কামনার

জন্মদাতা পবিত্র নফস নহে, বরং অপবিত্র খান্নাস। সুতরাং যেইমাত্র কামনা কর্ণের উপর প্রভাব বিস্তার করে তখনই কর্ম বন্ধন হয়ে পড়ে। কামনার বন্ধন মানুষকে প্রতিনিয়ত প্রভাবিত করে। মৃত্যু নামক ঘটনাটি যখন জীবন সায়াহ্নে এসে দাঁড়ায় তখনই মৃত্যুপথযাত্রী মানুষটি হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারে, সব কর্মগুলোই আমার বৃথা, নিষ্ফল, অসাড়। কিন্তু তখন করার আর কিছুই থাকে না। ঢাকাইয়া ভাষায় বলে : অপারেশন সাকসেসফুল, কিন্তু রোগী মারা গেছে।

মহানবি ব্যবসা-বাণিজ্য করেছেন, সংসারধর্ম পালন করেছেন, অনেক ঘাত-প্রতিঘাতের মুখোমুখি হয়েছেন : কিন্তু কামনার বন্ধন এক মুহূর্তের তরেও স্পর্শ করতে পারে নি।

জানোয়ার পেট ভরে খেতে জানে, কিন্তু গাটি ভরে নিয়ে আসতে জানে না। হাঁস জলেই অবস্থান করে, কিন্তু সাঁঝের বেলা যখন উঠে আসে তখন জল নিয়ে আসে না। যে সব দেশ ও জাতি অসহায়, গরিব, এতিম, মিসকিনদের ভরণ-পোষণের যাবতীয় ব্যবস্থাটি করে রাখে সেই দেশের, সেই জাতির অভ্যন্তরে নাস্তিক্যবাদ-কমিউনিজম কমই ঠিকিঝুঁকি মারতে পারে। তাই মহানবি ক্ষুধার্ত মানুষটিকে উপদেশ দিচ্ছেন এই বলে যে, আগে খেয়ে নাও, তারপর নামাজ পড়ো। যে দেশে ধনসম্পদের বিরাট বৈষম্যটি থেকে যায় সেখানে অনেক

রকম অপরাধের জন্ম হওয়াটা একান্ত স্বাভাবিক। মহান আল্লাহর কী বিচিত্র খেলা! এই খেলায় একজন ত্যাগী, অপরজন ভোগী। ত্যাগী ত্যাগ করেই ত্যাগের কোলে একদিন ঘুমিয়ে পড়ে, আবার ভোগীও ভোগ করতে করতে রক্ত আমাশায় ভুগতে থাকে। ফুল চিরদিন মধু দিয়েই যায়, আর ভ্রমর চিরদিন ফুলের মধু পান করেই যায়। যেন প্রতিটি জীব একটি নির্দিষ্ট তকদিরের বলয়ে লীলাখেলা করে চলছে। কেউ বোঝে, কেউ বোঝে না।

পরিশেষে একটি কথাই বলতে চাই, আর সেই কথাটি হলো : আমি কাকে দোষ দেব?

কোরান-এ সালাতের উল্লেখ : ৮২

কোরান-এর ১০৭ নম্বর সূরা মাউনের ৪-৬ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে : সুতরাং ওই সকল মুসল্লিদের জন্য ওয়াইল (যদিও ওয়াইল একটি দোজখের নাম এবং সেই দোজখটিকে মেকাজ্জি ভাষায় আফসোসের দোজখ বলা হয়, সুতরাং ওয়াইল শব্দটির অর্থ অনেকে দুঃখ, দুর্ভোগ, দুর্গতি, লাক্ষ্যনা, কষ্ট ইত্যাদি করেছেন। যেমন হাবিয়া দোজখটিকে বলা হয়, যে দোজখের তলা নাই তথা কেবল পড়তেই থাকবে। যারা দুনিয়ার ধনসম্পদকেই একমাত্র মাবুদ বলে মনে করে এবং এই ধনসম্পদের লোভীদের যেমন লোভের শেষ নাই তথা তলা নাই সেই রকম হাবিয়া দোজখের তলা নাই।) যাহারা তাহাদের সালাতে অমনোযোগী, যাহারা লোক

দেখানোর জন্য (সালাত) করে। (ফাওয়াইলুল্লিল মুসল্লিনা-ল্লাজিনা হম আলা সালাতিহিম সাহনা-ল্লাজিনা হম ইউরাউনা।)

ব্যাখ্যা

এই আয়াত কয়টির ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করতে গিয়ে প্রধানত মনের অবস্থানটির উপর সমস্ত বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে। মনের অবস্থানটিকে নিয়ত বলা হয়। এই নিয়তের দাঁড়িপাল্লাটি আল্লাহর হাতে। কার নিয়ত আল্লাহর দিকে আর কার নিয়ত দুনিয়ার দিকে ইহা আল্লাহই বিচার করবেন। যদিও জ্ঞানী লোকেরা অনেক সময় এই নিয়তের পরিষ্কার ভাষাটি ধরতে পারেন, আবার অনেক সময় মোটেই পারেন না। তাই এই বিষয়টি অত্যন্ত নাজুক একটা বিষয়। কেন একটি অত্যন্ত নাজুক বিষয় বললাম? বললাম এই জন্য যে, যে সালাত তথা নামাজ চর্মচর্মে দেখা যায় উহাকেই লোক-দেখানো সালাত নামটি দেওয়া যায়। তবে একটি কথা থাকে যে, আনুষ্ঠানিক সালাতে যে সকল অঙ্গভঙ্গি তথা রুকু-সেজদা করতে হয় উহা সবাই দেখতে পায়। যাহা সবাই দেখতে পায় উহাকেই লোক-দেখানো বলা যায়। কিন্তু যে বা যিনি এই আনুষ্ঠানিক সালাতের অঙ্গভঙ্গি তথা রুকু-সেজদাপুলো একমাত্র আল্লাহর জন্য খাস নিয়তে আদায় করছেন তার সালাতটি লোক-দেখানো সালাত হলেও আসলে উহা মোটেও লোক-দেখানো সালাত নয়। তাই আল্লাহ বলছেন, যারা লোক-দেখানো সালাত আদায় করবে তাদের জন্য ওয়াইল নামক দুঃখভোগের দোজখটি রেখে দেওয়া হয়েছে।

সালাত তথা যোগাযোগটি যদি আল্লাহর সঙ্গে যুক্ত না হয়ে দুনিয়া পাবার আশায় করার নিয়তটি থাকে তা হলে ওই সকল নামাজীদের জন্য ওয়াইল নামক আফসোসের দোজখের কথা বলা হয়েছে। এই রকম নামাজীদের মনের মধ্যে আল্লাহর সঙ্গে যোগাযোগের কথাটি থাকে না। তাই এই সালাত তথা নামাজকে

অমনোযোগী, উদাসীন, ইত্যাদি নামে আখ্যায়িত করা হয়। আবার পরস্পরে যারা প্রকাশ্যে সালাত আদায় করার তরে আনুষ্ঠানিক কুকু-সেজ্জা করছে, অথচ লোক দেখানোর তরে মোটেই করছে না, এটা বুঝতে কঠিন হলেও মোটেও অমনোযোগী এবং লোক-দেখানো সালাত নয়। সুতরাং এক কথায়, কোনটা আসল সালাত আর কোনটা নকল সালাত এই পার্থক্যটি করা বড়ই কঠিন কাজ। তবে দায়েমি ব্যাপারে আনুষ্ঠানিকতার বালাই থাকার কথা নয়। যদি কেউ বুঝতে পারে যে লোকটি দায়েমি সালাতের মাঝে ডুবে আছে, কিছু চর্মচর্মে দেখবার এবং বিচার করার কোনো উপায় আছে কি না আমাদের জ্ঞানা নাই। আফসোস নামক ওয়াইল দোজখের তলা আছে কি না জ্ঞানা নাই, কিন্তু হাবিয়া নামক দোজখের যে কোনো তলাই নাই এবং কেবল পড়তেই থাকবে এবং তলার সন্ধান কোনোদিন পাওয়া যাবে না, সেই কথাটি আমরা কমবেশি সবাই জানতে পারি। যে-সব মানুষের নফসের সঙ্গে খান্নাসরূপী লোভনীয় প্রবৃত্তিগুলো যখন ধনসম্পদ অর্জন করাটিকেই একমাত্র মাবুদ বলে ধরে নেয় কেবল তাদেরকেই এই তলাহীন হাবিয়া দোজখে ফেলে দেওয়া হবে। কী অপূর্ব ভাষার সমন্বয়! চাহিদার যেমন সীমা থাকে না, চাহিদার যেমন কোনো স্টেশন থাকে না, চাহিদার যেমন কোনো তলা বা শেষ থাকে না, সেই সব মানুষদেরকেই তলাবিহীন হাবিয়া দোজখে ফেলে দেওয়ার কথাটি বলা হয়েছে, যারা শত বছরের বেঁচে থাকার জীবনটি দেহের পোশাক নিয়ে বেঁচে থাকে এবং ভাবতেই চায় না যে এই দেহ-পোশাকটি হতে একদিন

আমাকে মৃত্যু নামক ঘটনাটি দ্বারা বের করে দেবে। যেইমাত্র নফস তথা প্রাণ তথা জীবাত্মাটি এতদিনের লালিত যত্ন করা দেহটি হতে বিদায় গ্রহণ করে তখন সেই দেহটি একটি সুন্দর নামধারণ করে, সেই সুন্দর নামটি হলো লাশ।

লাশ কখনই জীবাত্মা নয়, আবার জীবাত্মাটিও লাশ নয়। জল ধরে রাখার পাত্র হতে যখন জল ঢেলে ফেলা হয় তখন পাত্রটি খালি হয়ে যায়। এই সূক্ষ্ম এবং জটিল বিষয়টি বুঝে আসাটা খুবই কষ্টকর ব্যাপার। ঘৃণ্য পুঁজিবাদের জঘন্য ধনসম্পদের উপর দাঁড়িয়ে যারা পরহেজগারির রঙ-তামাশা দেখায় তাদের রঙতামাশাগুলো দেখে দেখেই কার্ল মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন, এবং মাও সে তুঙ-এরা জীবাত্মাটিকে তথা নফসটিকে অস্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন।

রাশিয়ার সম্রাট জারের আমলে ধনী-গরিবের নির্মম-নিষ্ঠুর বৈষম্য দেখে দেখে যখন বিদ্রোহের দানা বাঁধতে থাকে, এবং সেই বিদ্রোহই একদিন গণবিপ্লবের রূপধারণ করে, গণবিপ্লবের অনুসারীরা যখন জার সম্রাটের রাজপ্রাসাদ ক্রেমলিন আক্রমণ করে তখন ক্রেমলিনের অভ্যন্তরে পবিত্র গির্জাটির ভেতর খ্রিস্ট এবং মা মরিয়মের বানানো পাথরের মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে জার সম্রাট, যাকে আইভান দ্য টেরিবল বলা হতো, সেই জার সম্রাট চিৎকার দিয়ে জনতাকে ধর্ম

উপদেশ দিয়ে বললো, ‘এই পবিত্র গির্জায় প্রবেশ করো না। তোমরা কি দেখতে পাও না যিশু আর মা মরিয়মের পবিত্র প্রতিচ্ছবি?’ তখন জনতা গির্জার দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে চিৎকার দিয়ে বলে ফেললো, ‘তোমার মতো পাপিষ্ঠ শয়তান যে ঘরে অবস্থান করে সেই ঘর কখনই আল্লাহর ঘর হতে পারে না।’ পরক্ষণে ইতিহাস সাক্ষ্য দিচ্ছে, অর্ধেক দুনিয়ার খলিফা আমিরুল মোমিনিন ফারুকে আজম হজরত উমর ফারুক (রা.) জেরুজালেমে পোপের আগমন উপলক্ষে গিয়েছিলেন। পোপ সফ্রোনিয়াস উটের পৃষ্ঠ হতে খলিফা আমিরুল মোমিনিন উমর ফারুককে নামিয়ে যখন লাল গালিচায় সংবর্ধনা দিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন তখন মুসলিম জাহানের জেনারেল আবু উবায়দা চিৎকার দিয়ে বললেন, ‘ওগো সফ্রোনিয়াস, আপনি যাকে উটের পিঠ হতে নামিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন তিনি আমাদের খলিফা নন, তিনি খলিফার চাকর, আর যিনি আমারই সামনে উটের রশি ধরে দণ্ডায়মান তিনিই আমাদের খলিফা আমিরুল মোমিনিন ওমর ফারুক।’

এই কথা শুনে পোপ সফ্রোনিয়াস নির্বাক দৃষ্টিতে খলিফার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকার পর এক দৌড়ে উমর ফারুকের পদতলে লুটিয়ে পড়ে ইসলাম ধর্ম কবুল করে নিলেন এবং সঙ্গে তাঁর সহচররাও। কথিত আছে যে রোমক সম্রাট বলেছিলেন, যদি সেই মুহূর্তে সমগ্র খ্রিস্টান

জাতি উপস্থিত থাকতো তা হলে সবাই ইসলাম গ্রহণ করে নিত। এই বিশ্বয়কর আদর্শ আজ কেবল ইতিহাসের পাতায় বিলাপের কান্নারূপেই দেখতে পাই। বাস্তবে এর সামান্য প্রতিফলনটিও পৃথিবীর সাতাল্লটি মুসলিম দেশের একটিতেও নাই। তাই আজ আমরা ইহুদি-খ্রিস্টানদের হাতে মার খেয়ে চলেছি। অশ্বের মার, বোমাবাজির মার, কুটনীতির চালের মার, পঁচাচষোচ মারা মুচকি হাসির মার এবং কত রঙচঙের মার যে মুসলমানেরা খেয়ে চলছে তার হিসাবটি কে রাখে? আর সেই সঙ্গে কোরান-এর ঘোষণাটি বার বার আমাদেরকে মনে করিয়ে দেয়, আর সেই ঘোষণাটি হলো : যে জাতি তার নিজের ভাগ্য নিজে পরিবর্তন না করে, সেই জাতির ভাগ্য আল্লাহ কখনও পরিবর্তন করেন না (হবহ উদ্ধৃত নয়)। তাই আল্লামা ইকবাল দুঃখ করে বলেছিলেন, ‘তুর পাহাড়টি আজও দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু মুসা নাই।’

এই সূরাটির প্রথম আয়াতেই একটি প্রচণ্ড চপেটাঘাত করেছেন আল্লাহ। আল্লাহ বলছেন : তুমি কি দেখেছ সেই মানুষটিকে, যে ধর্মকে তথা দীনকে অস্বীকার করে তথা ধর্ম বলে কিছু একটা আছে বলে মানে না? তারা কারা তোমরা কি জানো? তারাই ধর্মকে তথা দীনকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করে যারা এতিম, নিঃস্ব, রিক্ত, লাঞ্চিত, পদদলিত, সর্বহারা (পচা নামের সর্বহারা নয়,

পচা নামের আলবদর নয়, পচা নামের রাজাকার নয়) হতে মুখটি ফিরিয়ে নেয়।

কত বড় মারাত্মক কোরান-এর ঘোষণা। অনুবাদকারী কিছুক্ষণের জন্য চমকে ওঠেন। জঘন্য পুঁজিবাদের ধাবমান কুকুর আরবি ভাষা জানা পণ্ডিতেরা এই আয়াতটির অনুবাদ ও ব্যাখ্যা লিখতে গিয়ে কত রকম যে ধানাইপানাই শুরু করে দেয় তার ইয়াত্তা নাই। ভূতের মুখে রামনাম নেওয়াটি যেমন কষ্টকর ব্যাপার, সেই রকম জঘন্য পুঁজিপতিদের ধাবমান আরবি ভাষা জানা মানুষরূপী কুকুরগুলোর অনুবাদ ও ব্যাখ্যার চেহারাগুলো আমরা প্রতিনিয়ত দেখতে পাই।

আজ যেন আসল বিষয়গুলোই বলতে গেলে নূতন শোনায এবং এই রকম অপ্রিয় সত্যকথাগুলো লিখতে যারা শক্ত হাতে নিরপেক্ষ মন নিয়ে কলম ধরে তাদের জীবনে অনেক রকম হুমকির সম্মুখীন হতে হয়। এ যেন দশটি শয়তানের পাল্লায় পড়ে ভগবানকেও ভূত সাজতে হয়।

দ্বারে দ্বারে ঘুরেও যখন এক মুঠো ভাত একটি যুবতী মেয়ে সংগ্রহ করতে পারে না, তখন পেটের ক্ষুধা নিবারণ করার তরে যদি দেহটি বিক্রি করে দেয়, তা হলে সেই ফতোয়ার ভাষাটি অধম লিখকের জানা নাই।

ইসলাম যেমন একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন-দর্শন, ঠিক তেমনই ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন-বিধান। কেউ কেউ

বলে থাকে : ‘যদি বার বছর বয়সে নামাজ না পড়তে চায় তা হলে সমস্ত রকম আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করে মুখ ফিরিয়ে নাও।’ আর যারা ধনসম্পদের পাহাড় বানিয়ে এতিমদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, এতিমের সম্পত্তি আত্মসাৎ করে, জাল দলিল করে এতিমের শেষ সম্বল থাকার ঘরটি হতে উচ্ছেদ করে দেয়, তাদের সাথে সকল প্রকার সম্পর্ক ছিন্ন করার কথাটি টেলিভিশন চ্যানেলগুলোতে একবারও শুনতে পাই না। কী চমৎকার আলেম-উলামা! কী বাহারি ফতোয়ার বাহারি দলিলগুলো

দিতে দেখি!

এতিমের হক মেরে দিয়ে ‘হালাল সাবান’ দিয়ে গোসল করে বেহেশতে যাবার দিবাস্বপ্ন দেখায় এই জঘন্য পুঁজিপতিরা। ‘হালাল সাবান’ দিয়ে এতিমের হক মারা মানুষটির চামড়াটি পরিষ্কার করা যায়, কিন্তু কোন ‘হালাল সাবান’টি দিয়ে মনের অভ্যন্তরের শয়তানি ময়লাগুলো পরিষ্কার করা যায় সেই কথাটি ভুলেও একবার প্রচার করতে দেখি না। বড়ই দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে এই কথাগুলো লিখে গেলাম। জানি, কারো কাছে ভালো লাগবে, কারও কাছে বিষের মতো মনে হবে। এবং দু-একজন ভণ্ডামি করছে বলে অপবাদ দিতেও কুণ্ঠা বোধ করবে না। হায় রে মানুষের খুব বেশি হলে একশত বছরের জীবন! জানে, মৃত্যু অবধারিত, তবু শয়তানি খেলাটি খেলেই চলছে।

একদম নিরপেক্ষ মন নিয়ে একটি বিশেষ ঘটনার অভিজ্ঞতাটি এখন বলছি। এক মুক্তিযোদ্ধা এক

রাজাকারকে গুলি করে হত্যা করবে। রাজাকার অনুরোধ করছে: আমাকে বুকে গুলি করুন। কিন্তু মুক্তিযোদ্ধা পায়খানার রাস্তায় রিভলবারের নলটি ঢুকিয়ে গুলি করে।

অধম লিখক তখন সদরঘাটের শরিফ মার্কেটের দ্বিতীয় তলায় ডাক্তারি করি। একটি রোগীকে স্ট্রেচারে করে নিয়ে আসা হলো। রোগীর আত্মীয়দেরকে প্রশ্ন করলাম : কী রোগ হয়েছে? বলা হলো : ক্যান্সার। জিঞ্জেস করলাম : কোথায়? উত্তর: পায়খানার রাস্তায়। আমি অধম লিখক পায়খানার রাস্তাটি দেখার জন্য কাপড়টি খুলে ফেলি। দেখতে পেলাম, ছোট্ট একটি ফুলকপির মতো সাদা। পায়খানা করার রাস্তাটি দেখা যায় না। টিউবের সাহায্যে অন্য পথে পায়খানা করানো হয়। প্রশ্ন করলাম রোগীকে : তুমি এমন কী পাপ করেছ, বাবা? রোগী অকপটে বললো, যা প্রথমেই বর্ণনা করেছি। বুঝতে পারলাম, যত বড় পাপীই হোক না কেন এইভাবে হত্যা করাটি মোটেই ঠিক হয় নি। এ রকমভাবে ৪২টি বছর হোমিও ডাক্তারি করেছি। অহংকার করে বলছি না, হোমিও ডাক্তার হিসাবে অধম লিখকের মোটামুটি একটা সুনামই ছিলো। বহু অভিজ্ঞতার মধ্য হতে মাত্র একটি অভিজ্ঞতার কথাটি তুলে ধরলাম।

হজরত জাবির (রা.)-এর বর্ণিত বিখ্যাত হাদিসটির অর্ধেক আমাদের দেশে প্রচার করা হয়। সেই অর্ধেক হাদিসটি হলো, ‘নামাজ বেহেশতের চাবি।’ কিন্তু পরের অর্ধেক হাদিসটি বলা হয় না। সেই অর্ধেক হাদিসটি হলো, ‘নামাজের চাবি তাহারত তথা পবিত্রতা।’ বেহেশতের চাবি যে রকম নামাজ ঠিক সে রকম নামাজের চাবিটিও হলো তাহারত তথা পবিত্রতা। এই তাহারত তথা পবিত্রতা কি ‘হালাল সাবান’ দিয়ে সমগ্র শরীরটাকে ধোঁত করে পবিত্র হবার কথাটি বলা হয়েছে? যদি বলেন ‘হ্যাঁ’ তা হলে এই হ্যাঁ বলাটাই আপানার তকদির, আর যদি বলেন, ‘না’ তা হলে এই না বলাটাই আপনার তকদির। (একটি কথা অবশ্য ভুলে গেলে চলবে না যে যারা মাজ্জুব, মাস্তান, আবদাল, আরিফ, আল্লাহর আশেক তাদের বেলায় এই কথাগুলো মোটেই প্রযোজ্য নয়। কারণ ‘লা ইউফতা আলাল আশেকিন’ তথা ‘আল্লাহর আশেকদের উপর কোনো ফতোয়া নাই।’) জান্নাতের চাবিটি যে নামাজ এবং নামাজের চাবিটি যে তাহারত তথা পবিত্রতা এই কথাটির আরেকটু ব্যাখ্যার প্রয়োজন, তবে পাঠকদের সুবিধার্থে বাংলা ভাষায় হাদিসটি হুবহু তুলে দিলাম : ‘আন জাবেরিন কালা কালা রসুলুল্লাহে (আ) ক্ষেফতাহল জান্নাতে আস-সালাতু ওয়া ক্ষেফতাহ সালাতিত তহর।’ অর্থাৎ ‘হজরত জাবের (রা.) বলেছেন, জান্নাতের

চাবিটি হলো নামাজ্জ এবং নামাজ্জের চাবিটি হলো পবিত্রতা।’ এখানে পবিত্রতার প্রশ্নেও মেক্জাজ্জি পবিত্রতা এবং হকিকি পবিত্রতার কথাটি এসে পড়ে। মেক্জাজ্জি পবিত্রতা বলতে আমরা মোটামুটি বুঝে থাকি ওজু-গোসল আর অপর পক্ষে হাকিকি পবিত্রতাটিকেও ইচ্ছা করেই দুই ভাগ করে নিলাম। প্রথম ভাগটিতে সত্য পথে চলা, অন্যায় না করা, জুলুম হতে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া, মানবতার সেবায় আত্মনিয়োগ করা, গরিব-দুঃখীকে দান-খয়রাত করা, মাপে কম না দেওয়া, খাদ্যে ভেজাল না মেশানো, ব্যবসা করতে গিয়ে মানুষের মাথায়-বাড়ি-দেওয়া লাভ করা হতে বিরত থাকা, জাল দলিল করে অন্যের সম্পদ আত্মসাৎ না করা ইত্যাদি বিষয়গুলো হাকিকি পবিত্রতার প্রথম ধাপ। কিন্তু দ্বিতীয় ধাপটি তথা সর্বোচ্চ পবিত্রতাটি হলো আপন নফ্স তথা প্রাণ তথা জীবাত্মা হতে খান্নাসরূপী শয়তানটিকে বাহির করে দেওয়া— মানুষ মনে করে

যে সে একা, কিন্তু এই মানুষের সঙ্গেই যে খান্নাসরূপী শয়তানটিকে পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে দেওয়া হয়েছে উহাকে ধ্যানসাধনা মোরাকাবা-মোশাহেদার মাধ্যমে সরিয়ে দেওয়া। যিনি আপন নফ্স হতে খান্নাসটিকে তাড়িয়ে দিতে

পেরেছেন তিনিই পীর, তিনিই মুরশিদ, তিনিই পথপ্রদর্শক, তিনিই গুরু। ‘গু’ মানে অন্ধকার এবং ‘রু’ মানে আলো। সুতরাং যিনি অন্ধকার হতে আলোর পথে

নিষে যাবার ফর্সুলাগুলো দিতে পারেন তিনিই গুরু। মহানবি বলেছেন, মানব দেহের অভ্যন্তরে এক টুকরো গোশত আছে। সেই গোশতটি যদি পবিত্র হয় তবে সমস্ত দেহটাই পবিত্র, আর যদি সেই গোশতের টুকরোটি অপবিত্র থেকে যায় তা হলে সমস্ত দেহটাই অপবিত্র। (হবহ উদ্ধৃত নয়)। মহানবির এই হাদিসটিতে একটি মারাত্মক বিষয়ের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সেই গোশতের টুকরোটির নাম হলো কল্বে। সেই কল্বেই আপন নফস এবং খান্নাসরূপী শয়তান উভয়ে অবস্থান করে। উভয়ের অবস্থানে একটি মানুষ যত বড় দাতাই হোক, যত বড় মহানই হোক, যত বড় ত্যাগীই হোক, কিন্তু খান্নাসরূপী শয়তানটি যদি আপন কল্বে অবস্থান করে তা হলে সুফিবাদের দৃষ্টিতে সেই মানুষটিকে পবিত্রতার বলয়ে রাখা যায় না। আমরা এই কথাগুলোতে মন ও বিবেক হয়তো বিদ্রোহ করতে পারে, প্রতিবাদ করতে পারে, কিন্তু যত বিদ্রোহ আর যত প্রতিবাদই করা হোক না কেন, কল্বে খান্নাসের অবস্থানটি থাকা পর্যন্ত মানুষটি কমবেশি কলুষিত। এই বিষয়গুলো এতই সূক্ষ্ম যে অণুবীক্ষণ যন্ত্রে অণু-পরমাণু ধরা পড়ে, কিন্তু এই বিষয়টি ধরা পড়ার যন্ত্রটি অধর্ম লিখকের জ্ঞান নাই।

কল্বে খান্নাস থাকলে কামনা থাকবেই, আর কামনা থাকলেই কর্ম কলুষিত হয়। সুতরাং কামনাই বন্ধন। কোথাও স্থূল বন্ধন, কোথাও সূক্ষ্ম বন্ধন, কোথাও অণু-পরমাণুর চেয়েও সূক্ষ্ম বন্ধন। এই বন্ধনই দুনিয়ার দাসত্ব করায়। এই বন্ধনই তাগুতের কমবেশি পূজা করায়। এই বন্ধনই জীবনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। এই কামনার বন্ধনই মুক্তির পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। এই কামনার আবেষ্টনই জ্ঞানাত হতে দূরে সরিয়ে রাখে। এই

কামনার বন্ধনই বার বার কেয়ামতের দৃশ্যটি দেখিয়ে যায়।

মৃত্যুই কেয়ামত এবং এতে বিন্দু পরিমাণ সন্দেহের অবকাশ নাই। সুতরাং মৃত্যু নামক কেয়ামতটি ঘটে যাবার সঙ্গে সঙ্গে আবার উঠানো হয়, হিন্দু ধর্মে যাকে পুনর্জন্মবাদ বলা হয়। আমরা ইচ্ছা করেই পুনর্জন্মবাদ না বলে বার বার কেয়ামত হবার কথাটি বলবো। অনেকটা লাউ মানে কদু আর কদু মানে লাউ। ভাষার প্রকারভেদে মানুষের মাঝে বিভ্রান্তির গোলক-ধাঁধায় পড়াটা অস্বাভাবিক নয়।

ছোটবেলায় দেখেছি বাপ-দাদারা সবাই ধুতি পরিধান করতো। আর এখন ড. গোয়েবল্‌সের মতো প্রচারণায় ধুতিটি হয়ে গেছে হিন্দুদের পোশাক। গোয়েবল্‌সের প্রচারণায় ‘খোদা হাফেজ’ হয়ে গেছে ‘আল্লাহ হাফেজ।’ অথচ ধুতি বাঙালির জাতীয় পোশাক। অবশ্যই বাঙালি জাতির জন্য আল্লাহ অনেক নবি-রসূল পাঠিয়েছেন, বাঙালির জাতীয় ভাষায় আল্লাহর নিদর্শনসমূহ প্রচার করার জন্য। আবু লাহাব, আবু জেহেল, ওক্বা, সায়েবা এবং আবদুল্লাহর মতো কার্টা কাফেরেরা যে পোশাক পরিধান করতো সেই একই পোশাক মহান সাহাবারাও পরিধান করতেন (ইমাম গাজ্জালি)।

প্রায় ধর্মেরই এইসব ছোট ছোট বিষয়ে নোংরা কথা প্রচার করে সার্বজনীনতার রূপটিকে গণ্ডিতে আবদ্ধ করে ফেলে। মনে করে ধর্মের জন্য অনেক কিছু করলাম, আসলে কী ভয়ংকর ক্ষতিগুলো যে করা হচ্ছে তা বুঝতে পারে না। এই পঁচাত্তর বছরের দুনিয়াতেই আপনাকে পীর খুঁজতে হবে, গুরুর কাছে মুরিদ হতে হবে, কারণ হাকিকি জ্ঞানটি লাভ না করা পর্যন্ত বার বার দেহ নামক পোশাকগুলো বদল করে আপনাকে আসতেই হবে। আপনি মানলেও আসবেন, না মানলেও আসবেন। যে পর্যন্ত আপনি পীর তথা গুরু না পাবেন এবং সেই গুরুর কথা মতো ধ্যানসাধনাটি না করবেন ততবার আপনাকে দেহ নামক পোশাকটি ফেলে ফেলে আসতেই হবে। দেহের পোশাক কাপড় যখন পরার অযোগ্য হয়ে যায় তখন ফেলে দেয়। ঠিক সেই রকম যতদিন এই অযোগ্য দেহ নামক পোশাকটি থেকে যাবে ততদিন আপনার জন্য পীর নাই, গুরু নাই! কেবল এক বোবা উদ্দেশ্যবিহীন উপাসনার আশ্ফালন করে যেতে হবে। আসলে অতি অপ্রিয় সত্য কথাটি হলো, আগের জন্মের কর্মফলটি ভোগ করতেই হবে। ইহাই তকদিরের লিখন, ইহাই নিয়তির বিলাপ। সুতরাং ‘তুমি যেমনে নাচাও তেমনি নাচি, পুতুলের কী দোষ?’ কথাটির মর্মবাণী কেউ বোঝে, কেউ বোঝে না; কেউ ঠাট্টা করে, কেউ

বিদ্রূপের হাসি হেসে ছেঁড়া কাগজের মতো ছুঁড়ে
ফেলে দেয়।

এই খান্নাস নিয়ে মানুষ যদি অন্য কোনো গ্রহে যেতে
পারে এবং বাসযোগ্য করে তুলতে পারে, সেখানেও এই
খান্নাসটি থাকার দরুন ঝগড়া ঝাঁটি, মারামারি,
লার্টালাঠি, নেতৃত্বের রক্ত আমাশা, দারোগা-পুলিশ,
সিআইডি-ডিবি, আধুনিক র‍্যাব, কোর্ট-কাচারি,
বিচারক, বিচার, জেলখানা, ফাঁসি দেবার জল্লাদ
ইত্যাদি বিষয়গুলো অবশ্য অবশ্যই থাকবে। কেন
থাকবে? ওই একটিমাত্র কারণ হলো, প্রতিটি মানুষের
নফসের সঙ্গে তথা প্রাণের সঙ্গে তথা জীবাত্মার সঙ্গে
খান্নাসরূপী শয়তানকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। কারণ,
কোরান-এর মূল দর্শনটিই হলো, যত প্রকার অপকর্মের
একমাত্র নেতাটিই হলো খান্নাসরূপী শয়তান। এই
খান্নাসরূপী শয়তানটিকে কেমন করে তাড়াতে হবে
বিষয়টি অনেক জ্ঞানীপুণির কাছেই একটি ফালতু
বিষয়। হি হি করে হাসবার বিষয়। শান্তির জন্য কত
রকম যে গবেষণা চলছে আর টন কে টন কাগজ নষ্ট
করা হচ্ছে এটা বলতে গেলে মহান তথাকথিত
গবেষকেরা বিষয়টি চিন্তা করা তো দূরের কথা, বরং
গাঁজাখুরি গল্প মনে করে কী অপূর্ব জ্ঞানের হাসি হেসে
যায়!

মহাপবিত্র মহামহান নোবেল প্রাইজটির সামান্য বয়ান দিতে চাই। বয়ানটি তথা ব্যাখ্যাটি অধম লিখকের নয়, আমেরিকার একজন নাম করা বিখ্যাত রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর। অনেক সময় গোপনে লুকিয়ে রাখা থলি হতে ছোঁচা বিড়ালের ছোঁচামির ইতিহাসগুলো তুলে ধরে দুনিয়াতে হইচই ফেলে দেয়। অধম লিখকের পরম শ্রদ্ধেয় সেই বিখ্যাত মার্কিন রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর নামটি হলো নোয়াম চমস্কি। একবার মহান নোবেল প্রাইজের মাথায় মৃগুর দিয়ে বাড়ি দিয়ে বলে ফেললেন যে আমেরিকার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট জিম্মি কার্টারকে কেমন করে শান্তির জন্য নোবেল পুরস্কারটি দেওয়া হলো? নোবেল অর্থটি যদি স্ফ্রান্ত আর ভদ্রই হয়ে থাকে তা হলে এই ভদ্র কমিটিতে অবশ্যই কিছু অভদ্র জ্ঞানী ঢুকে পড়েছে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী নোয়াম চমস্কি বলে ফেললেন যে প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট জিম্মি কার্টারকে শান্তির জন্য নোবেল পুরস্কার দেওয়াটি বিশ্ব বিবেকের গালে একটি প্রচণ্ড চপেটাঘাত। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী নোয়াম চমস্কি এমন অবাক করা কথাটি বলে ফেলেছিলেন যা শুনে তাবৎ পৃথিবীর জ্ঞানীপুণিদের মাঝে হইচই পড়ে গিয়েছিল। তিনি বলেছিলেন, হিটলারের বড় বড় চেলা-চামুণ্ডাদের নুরেমবার্গ নামক ট্রাইব্যুনালে বিচার করে ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল। এই অশান্তির ধারক-বাহক প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট জিম্মি কার্টারকে যদি নুরেমবার্গ ট্রাইব্যুনালের মতো বিশেষ আদালতে বিচার

করা হতো তা হলে নোবেল প্রাইজের বদলে ফাঁসি দিলে ঠিক হতো। বিবিসির সাংবাদিক জেরেম প্যাক্সম্যানের প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে আমেরিকার পরম শ্রদ্ধেয় রাষ্ট্রবিজ্ঞানী নোয়াম চমস্কি এই রকম কথাগুলো বলেছিলেন। উনি আরও অনেক বেশি বলেছিলেন, কিন্তু অধম লিখক সংক্ষেপে বিষয়টি পাঠকদের কাছে তুলে ধরলাম।

আরেকটি নোবেল প্রাইজের সামান্য বয়ান দিতে বাধ্য হলাম। আর সেটা হলো, কোনো এক বিজ্ঞানী নিকোটিনমুক্ত সিগারেট আবিষ্কার করে ফেললেন। আর যায় কোথায়! নিকোটিনমুক্ত সিগারেট! এই আবিষ্কারটি কি কম বড়ো আবিষ্কার? আবিষ্কারের বছরই সেই বিজ্ঞানীকে নোবেল প্রাইজ দিয়ে দেওয়া হলো। অবশেষে দেখা গেল, কোটি কোটি ডলার ব্যয় করে যে নিকোটিনমুক্ত সিগারেটগুলো বানানো হয়েছিল সেটা কেউ পান করেন না। আমেরিকা সরকার এই নিকোটিনমুক্ত সিগারেটের জন্য সিগারেট কোম্পানিগুলোকে ক্ষতিপূরণ দিয়েছে কি না জানি না তবে এইটুকু জানি যে সেইসব নিকোটিনমুক্ত সিগারেটের প্যাকেটগুলো আটলান্টিক মহাসাগরে ফেলে দেওয়া হয়েছিল।

আরেকটি অর্থনীতির উপরে নোবেল পুরস্কারের উপরে বয়ানটি শুনতে ইচ্ছা পোষণ করি। যদিও অর্থনীতির

উপর নোবেল পুরস্কারটি নোবেল কমিটি দিয়ে যান নি, বরং আমেরিকার পবিত্র জ্ঞানীপুথিরা অর্থনীতির উপর নোবেল পুরস্কারের বিভাগটি খুলেছিলেন। আমেরিকার এক অর্থনীতিবিদ অর্থনীতির উপরে একটি সুত্র আবিষ্কার করলেন। আর সেই সুত্রটি হলো কোটি কোটি ডলারের শেয়ার কেনার পর মার খেলে যে হতাশার চিত্রটি মনের মাঝে ফুটে উঠে সেই হতাশার থেরাপি দেবার অর্থনৈতিক সুত্রটি। বাহ, বাহ! কী অপূর্ব! কী সুন্দর নোবেল প্রাইজ!

পবিত্র নোবেল পুরস্কারটিকে আমরা পবিত্রই জেনে আসছি। কিন্তু কী এমন অজ্ঞাত কারণে ফরাশি অস্তি তুবাদী দার্শনিক জঁ পল সার্ত্রে নোবেল প্রাইজটি গ্রহণ করেন নি? রাশিয়ার নাগরিক বরিস পাস্টারনাক রাশিয়ার বিরুদ্ধে একটি আখ্যায়িকা বই ডা. জিভাগো লিখেছিলেন, কিন্তু নোবেল প্রাইজটি নেবার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও রাশিয়া নিতে দেয় নি। শুনেছি ব্রিটিশ দার্শনিক বার্ট্রান্ড রাসেল এবং বিশ্ববিখ্যাত সাহিত্যিক জর্জ বার্নার্ড শ-ও নোবেল প্রাইজটি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন (?)।

এই সুরার প্রথম দুটো আয়াত বিশ্ববিবেককে চমকিয়ে দেয়। চমকিয়ে দেয় মুসলমান নামের সাইনবোর্ডটি যাদের কাঁধে বুলে আছে। মুসলমানের ঘরে জন্মগ্রহণ করলেই যে উত্তরাধিকার সূত্রে মুসলমান হয় না, এই দুটো আয়াতের কণ্ঠিপাথরে যাচাই করলেই পরিষ্কার

বোঝা যায়। এই কথাগুলো বুখারি এবং মুসলিম শরিফ-এর বর্ণিত হাদিস নয়, এই কথাগুলো মুত্তাফেকুন অথবা হাসান শরিফ-ও নয়, ইহা স্বয়ং আল্লাহর কোরান-এর কথা। কী সুন্দর ভাষায় কী অপূর্ব ছন্দ দিয়ে কোরান বলছে : তুমি কি দেখেছ সেই মানুষটিকে যে প্রথমেই তথা বিসমিল্লাতেই ধর্ম হতে বাদ? দীন হতে বাদ? এই দীন বলতে ইসলাম ধর্মকেই বোঝানো হয়েছে। বড় সাম্রাজ্যিক কথা যে বিসমিল্লাতেই ইসলাম ধর্ম হতে সম্পূর্ণরূপে বাদ এবং এই বাতিল হবার প্রশ্নে কোনো শর্তই রাখা হয় নি। এখন একটু ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে দেখি, দেখি ইসলাম কয়টি খুঁটির উপর দাঁড়িয়ে আছে। ইমান, নামাজ, রোজা, হজ্জ এবং জাকাত—এই পাঁচটি খুঁটির উপর ইসলাম ধর্মটি দাঁড়িয়ে আছে। আল্লাহ বলছেন : তুমি কি সেই মানুষটিকে দেখেছ যে ইসলাম ধর্ম হতে প্রথমেই বাদ? অর্থাৎ ইমান, নামাজ, রোজা, হজ্জ ও জাকাত এই পাঁচটি খুঁটিকে অস্বীকার করে। সে সেই মানুষটি যে বা যারা এতিমদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় তথা এতিমদের সব রকম দায়-দায়িত্ব নিতে অস্বীকার করে। এতিমদের প্রতি লক্ষ না রাখলে অথবা মুখ ফিরিয়ে নিলে অথবা তাড়িয়ে দিলে অথবা অবজ্ঞা প্রদর্শন করলে সেই মানুষটি সর্বপ্রথম ইসলাম ধর্ম হতেই সম্পূর্ণ বাদ।

জঘন্য পুঁজিবাদের পুজারি পুঁজিপতিদের দ্বারা পরিচালিত বিকাহুয়া আলেম-উলামারা এই দু'টো আয়াতের ব্যাখ্যা লিখতে গিয়ে কত রকম যে ভড়ং চড়ং ও তামাশার খেল দেখায় এবং জনতাকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা চালায়, তাদেরই বা কী বলবো? জঘন্য পুঁজিবাদের পুজারিরা জনতার চোখে ভেলকিবাজির ভুগভুগি বাজিয়ে কোরানুল করিম-কে আদরের চুমো দেবার দৃশ্যটি দেখায়। কী বাহারি মহব্বত কোরান-এর উপর!

মীরজাফর, মীরসাদেক আর হাজ্জাজ বিন ইউসুফের মতো খচ্চর নামের নরপশুরাও বার বার কোরান-এ চুমো খেয়েছে। চুমো খেয়েছে এজিদ্ আওলাদে রসুল শহিদে আজম ইমাম হোসাইনের কাটা মাথা মোবারক সামনে রেখে সুরা আল ইমরান হতে একটি আয়াত পড়তে গিয়ে। যেন কোরান-এর প্রতি এজিদের বড় দরদ! এজিদের টাকা-পয়সায় পালিত তিনশত জাঁদরেল আলেম-উলামারা আওলাদে রসুল শহিদে আজম ইমাম হোসাইনকে 'বাঘি' উপাধি দিয়ে কতল করার ফতোয়াটি সিরিয়ার রাজধানী দামেস্কের জনসাধারণকে দেখিয়েছিল। এই জন্যই মহানবি বলেছেন , এমন জামানা আসবে যখন এই আরবি ভাষা জানা আলেম-উলামারা দুনিয়ার নিকৃষ্টতম জীবের পরিণত হবে। (হবহ উদ্ধৃত নয়)।

দেশের লক্ষ লক্ষ বুড়ুস্কু মানুষের হাড়-ওঠা বুকের পাজরের উপর দিয়ে হেঁটে এহরামের পোশাক পরিধান করে উড়োজাহাজে চড়ে মেজাজি হজব্রতটি পালন করে। তা পালন করুক, কিন্তু দেশের সরকার যদি এই রকম এতিমদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবার মানবিকতাকে উপেক্ষা করে তো প্রতিনিয়ত একেক রকম গজব নাজেল হতে থাকে। ভাবতে অবাক লাগে, যেখানে কোরান বলছে : তুমি কি সেই মানুষটিকে দেখেছ, যে ইসলাম ধর্মটিকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে তথা মানে না? কতবার কত রকমে একই কথা বার বার বলতে হচ্ছে। মনে হয় সবচেয়ে কঠিন পাথর নামক হীরাটি হতেও এদের বিবেক আরও শক্ত, আরও কঠিন।

মহানবি বলেছেন, সূঁচের ছিদ্র দিয়ে একটি উট ঢোকাটা তোমার কাছে যে রকম অসম্ভব মনে হয় তারচেয়েও অনেক অনেক বেশি অসম্ভব একজন ধনবান ব্যক্তির বেহেশতে প্রবেশ করা। (হবহ উদ্ধৃত নয়)। আস্‌সারে মোবাম্বারার যে দশজন মহান সাহাবা দুনিয়াতে থেকেই বেহেশতের সুসংবাদ পেয়েছেন তাদেরই একজন ধনবান সাহাবা আবদুর রহমান ইবনে আউফ। এই আবদুর রহমান ইবনে আউফেরও বেহেশতে প্রবেশ করতে ৫০০ বছর লাগবে। এই ৫০০ বছরটি কি পৃথিবী গ্রহের হিসাব নাকি অন্য কোনো অজ্ঞাত স্থানের হিসাব, অধম লিখকের তা জানা নাই।

অধম লিখক দশ বছর একাত্তর গবেষণা করে যে মারফতের গোপন কথা বইটি লিখেছিলেন সেই বইটির জন্য জঘন্য পুঁজিপতিদের ধাবমান তথাকথিত আলেম-উলামারা লেখকের ফাঁসি চেয়েছিল। বইটি বাজেয়াপ্ত করতে চেয়েছিল। বাজেয়াপ্ত হয়েছিল মারফতের গোপন কথা নামক বইটি। স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল জুজ কোর্টে অধম লিখকের বিচার হবার পর কেবল বেকসুর খালাসই পাই নি, বরং বিচারক নিজে একটি গবেষণামূলক গ্রন্থ বলে রায় দিয়েছেন। পাঠকদেরকে অবশ্যই অনুরোধ করতে চাই যে মারফতের গোপন কথা বইটি সংগ্রহ করুন এবং পড়ে দেখুন। তবেই এইসব হালচালের ব্যাপারগুলো পরিষ্কার হয়ে উঠবে। কোরান এবং হাদিস হতে এত দলিল-দস্তাবেজ আর কোনো বইতে দেওয়া হয় নি।

এতিমদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেই যদি ইসলাম ধর্ম হতে প্রথমেই বাদ হতে হয় এবং ‘তুমি কি দেখেছ, ইসলাম ধর্ম হতে বাদপড়া মানুষটিকে’ কথাটির ভাষাটি কী অপূর্ব, কী অতুলনীয়! জগতের কোনো ধর্মগ্রন্থে এই রকমভাবে এতিমদের বিষয়ে বলা হয়েছে কি না অধম লিখকের জ্ঞানা নাই। এখানে মুখ ফিরিয়ে নেবার কথাটি বলা হয়েছে, কিন্তু এতিমের সম্পদ মেরে দেবার কথাটি বলা হয় নি। এতিমদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেই যদি ইসলাম হতে বাদ পড়া হয় তবে

এতিমদের সম্পদ মেরে দিলে কী হতে হবে? অনেকটা কুচ পরোয়া নাহি, কিন্তু যখন লিভার ক্যাসারের মতো দুরারোগ্য ব্যাধিগুলো আক্রমণ করে তখন হয়তো কিছুটা বুঝতে পারে যে ঠেলার নাম বাবাজী। এই রকম ঠেলার নাম বাবাজী, এই রকম উষ্টা-টঙ্কর খেয়ে খেয়ে হয়তো সামান্য হাঁশ আসতে পারে, কিন্তু তখন জাহান্নামের অধিবাসী হওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় থাকে না। যেমন কর্ম তেমন ফল।

বিরাট দিঘিতে পালিত বড় বড় কুই-কাতলা মাছ ধরার সোখিন মৎস্য শিকারীদের বড়শিতে যখন দশ-পনের কেজি ওজনের মাছটি আটকে যায় তখন ছুটে পালাবার জন্য দ্রুত বেগে পালিয়ে যেতে থাকে। মৎস্য-শিকারি ততুই সুতা ছাড়তে থাকে। এভাবে ঘণ্টাখানেক দোঁড়াদোঁড়ি করার পর দশ পনের কেজির মৎস্য বাবাজী একদম ক্লান্ত হয়ে পড়ে। মৎস্য-শিকারি আশ্বে আশ্বে সুতা গুটিয়ে কাছে এনে বড় একটি জালের খলিতে ভরে আনে। আল্লাহ পাকও এই জাতীয় মানুষ নামের মাছগুলোকে দুনিয়ার দিঘিতে ছুটাছুটি করার দৃশ্যটি দেখতে থাকেন আর মনে মনে হাঁসেন যে আসল সুতা টানার গেরাপিটি তো আল্লাহরই হাতে। ঢাকাইয়া ভাষায় বলে : হাড়িডতে যতদিন গুদা থাকে ততদিনই তড়ৎ বড়ৎ।

এতিম হতে মুখ ফিরিয়ে নেবার এত বড় সতর্কবাণী কোরান দিয়েছে, কিন্তু যারা এতিমদের ধনসম্পদ মেরে দেয় তথা হজম করে ফেলে তথা আত্মসাৎ করে, তাদের শাস্তিটি কী রকম হতে পারে তা পাঠক বাবা-মায়াদের হাতেই তুলে দিলাম।

মহানবি অন্য একটি হাদিসে বলেছেন : যার অন্তরে এক সরিষা পরিমাণ অহংকার থাকে, সেই অন্তরে ইম্মান থাকে না এবং যার অন্তরে এক সরিষা পরিমাণ ইম্মান আছে, তার আর অহংকার থাকে না। (হবহ উদ্ধৃত নয়)। এই অহংকারটি বলতে কী বুঝানো হয়েছে এবং কোন ধরনের অহংকার করলে এক সরিষা পরিমাণ ইম্মান থাকে না ইহাও পাঠকের হাতে বিচারের ভার তুলে দিলাম এবং আবার বললাম, অধম লিখকের রচিত মারেফতের গোপন কথা নামক বইটি পড়ুন।

অধম লিখক আল্লাহর ওলি হতে পেরেছি কি না জানি না, তবে একটি ভবিষ্যৎবাণী করতে চাই, আর সেই ভবিষ্যৎবাণীটি হলো : হারিকেন-টর্নেডোতে গরিব আর সাধারণ মানুষ মারা যায়, কিন্তু ধনীদের গায়ে একটি আঁচড়ও লাগে না, ভবিষ্যৎবাণীটি হলো : অচিরেই বাংলাদেশে একটি মহাপ্রলয়ঙ্করী ভূমিকম্প হবে এবং এই ভূমিকম্পে আশা করি ধনী লোকদের কান্নাকাটির দৃশ্যটি দেখে যেতে পারবো। যদি এই প্রলয়ঙ্করী ভূমিকম্পটি না হয় তা হলে মনে করবো, অধম লিখকের বাক্য শুদ্ধ নয়।

‘সবার উপরে মানুষ সত্য’

কোরানুল করিম-এ যে ৮২ বার সালাত কায়েম করার কথাটি বলা হয়েছে এবং কোন সুরার কত নম্বর আয়াতে

আছে উহা নিরপেক্ষ মনে, আন্তরিকভাবে, একদম হবহ রাখতে চেষ্টা করেছে। একটি কথা বার বার বলতে গেলে শুনতে ভালো লাগে না, কিন্তু আল্লাহ জালা শানাহর কোরানুল হাকিম-এ একটি কথা শতবার উল্লেখ করলেও মধুর মতো শোনায়। কোরান-এর বিশেষ মর্যাদাটি আছে বলেই কাগজ আর কালির অঙ্করে ছাপানো নুরি কোরান-এর ছবিটির দামও কোনো অংশেই কম নহে। একটি জীবন্ত মানুষের ছবিটি যখন দামি কাগজের উপর ফুটিয়ে তোলা হয় তখন মনে হয় সেই আসল মানুষটি, সেই হাকিকি মানুষটি দাঁড়িয়ে আছে : আসলে উহা মেজাজি তথা রূপক।

নুরি কোরান ছাপার অঙ্করে কাগজের পাতায় থাকাটি অসম্ভব তথা প্রশ্নই আসে না। তবু কাগজ কালিতে ছাপানো কোরান-টির মূল্য নুরি কোরান হতে কোনো অংশেই কম নহে। মেজাজি কোরান মূর্ত তথা দেখা যায়, পক্ষান্তরে নুরি কোরান বিমূর্ত তথা দেখা যায় না, তাই ইহা হাকিকি কোরান। একটি ছবি, অপরটি জীবন্ত। এই জীবন্ত কোরান তথা নুরি কোরান-এ ডুব দেবার আস্থানটি জানানো হচ্ছে বার বার। নফস হতে খান্নাসটিকে মুক্ত করে দিতে পারলেই নুরি কোরান ধাপে ধাপে উচ্চাসিত হয়ে ওঠে। এই উচ্চাসিত নুরি কোরান-কে একমাত্র পবিত্র হয়ে তথা খান্নাসমুক্ত হয়ে স্পর্শ করা যায়, তথা ধরা যায়, ছোঁয়া যায়, আলিঙ্গন

করা যায়। তাই কোরান নুরি কোরান বিষয়টিতে তথা হাকিকি কোরান-এর প্রশ্নে সাফ বলে দিয়েছেন : ‘লা ইয়াম্মাস্সাহ ইল্লাল মুত্তাহারুন’ তথা কেহই কোরান-কে স্পর্শ করতে পারে না, একমাত্র যারা পবিত্র তাঁরা ছাড়া।

এই নুরি কোরান-কে যারা স্পর্শ করতে চায় তারা যেন ধ্যানসাধনা, মোরাকাবা- মোশাহেদার মাধ্যমে, গুরুর বিশেষ নির্দেশে সাধনা করে যায় । শুধুমাত্র এই একটি কথা বোঝাবার জন্য এত কথার অবতারণা করা হয়েছে। কারণ নুরি কোরান পড়া যায় না তথা পাঠ করা যায় না। যাহা পাঠ করা যায় উহা মেক্জাজি কোরান। নুরি কোরান-এর মধ্যে কোনো অক্ষর নাই, অ্যালফাবেট নাই, শব্দ নাই, বাক্য নাই। আছে কেবল নুর আর নুর : নুরের উপরে নুর। তাই এক কথায় বলতে চাই যে, মানুষই হলো আল্লাহর নুরের একমাত্র প্রদীপ।

খান্নাস মোহ-মাযার শেরেকে ডুবিয়ে রাখে। এই শেরেকযুক্ত মনটিতে আল্লাহর নুর প্রকাশিত হবার পথে বিরাট একটি দেয়াল, কঠিন একটি প্রাচীর। তাই এক কথায় খান্নাসযুক্ত দেহ-মনের মধ্যেই আল্লাহর নুর বিকশিত হয়। এই আল্লাহর নুর যখন খান্নাসযুক্ত হয় তখনই প্রভাতের আলোর মতো ধরা দিতে থাকে। ইহাকেই আবার ইফতার বলা হয়েছে। এই ইফতার

যার জীবনে তাড়াতাড়ি ঘটেছে তিনি আল্লাহর প্রিয় বান্দা। আবার এই খান্নাসমুক্ত মানুষকেই মোমিন বলা হয়েছে। সুতরাং একজন মোমিন-গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করে তথা মুরিদ হয়ে কেমন করে ধ্যানসাধনা করতে হবে, কেমন করে মোরাকাবা-মোশাহেদাটি করতে হবে তা প্রথমেই জেনে নিতে হয়। আল্লাহর নুর প্রকাশিত হবার একমাত্র স্থানটি হলো মানুষ। এই মানুষ-প্রদীপের মাঝেই তৈল-সলিতা-আয়না ইত্যাদি সকলই রাখা হয়েছে,

যাহা অন্য কোনো জীব-জানোয়ারের মধ্যে রাখা হয় নি। তাই বলা হয়েছে মানুষ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব, তথা আশরাফুল মাখলুকাত। তাই বলা হয়ে থাকে, ‘সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।’

যাহাকে সর্বোচ্চ ক্ষমতা দেওয়া হয়ে থাকে তাহার সর্বনিম্নে পতন হবার ভয়টিও থেকে যায়। ইহাই আধ্যাত্মিক দ্বন্দ্বিক দর্শন। ইহা মোটেও বস্তুর দ্বন্দ্বিক দর্শন নয়। তাই সব শেষে বলতে চাই যে মাওলাউল আলা বাবা সাইয়েদ আকা জ্ঞান শরীফ, মুরশিদ জ্ঞান শরীফ, পীর জ্ঞান শরীফ, রাহনুমা জ্ঞান শরীফ, কেবলা জ্ঞান শরীফ, কাবা জ্ঞান শরীফ, মাওলা জ্ঞান শরীফ বলে গেছেন : রহস্যের নুর তোমারই ভেতর, যদি তুমি তা জাগিয়ে তুলতে পারো। আর যখন জাগিয়ে তুলতে পারবে তখন সেই দর্শনীয় ইমান আর ছোট্টাছুটি করে

না, দৌড়াদৌড়ি করে না, একবার যায় একবার আসে
না, সন্দেহ— দ্বিধা-দ্বন্দ্বের হালকা ইম্মান মেঘের
ঘনঘটার মতো আর মনের আকাশে দেখা যাবে না।

.....

শাহ সুফি লকবপ্রাপ্তদের নামের তালিকা

সর্বনিম্ন একটানা চারমাস যারা মোরাকাবার ধ্যানসাধনা করেছেন তাদের প্রত্যেকের নামের আগে শাহ সুফি পীর বাবা কেবলায়ে কাবা এবং নামের শেষে আল-সুরেশ্বরী লকব দেওয়া হয়েছে।

১. শাহ সুফি পীর বাবা কেবলায়ে কাবা আজম শাহ আল-সুরেশ্বরী,
পিতা-ইউসুফ আলী, গোয়াল চামট বাসস্ট্যান্ড,
ফরিদপুর। ২. সৈয়দ তারিক আল-সুরেশ্বরী, পিতা-
সৈয়দ ওয়ারিস হোসেন, ১৭১, উত্তর বাড়ডা, ঢাকা।
৩. ময়েজ উদ্দিন মো. আবদুর রশিদ আল-সুরেশ্বরী,
পিতা-আবদুল হাই, পশ্চিম ঘাটলা, বড়বাড়ি,
বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী। ৪. ডা. মোহাম্মদ আলী আল-
সুরেশ্বরী, পিতা-ফজর আলী মোল্লা, নিজুরী, রডাইত
বাজার, ভালুকা, ময়মনসিংহ। ৫. আনোয়ার মুন্সি
আল-সুরেশ্বরী, ভোলারহাট, চাপাই নবাবগঞ্জ। ৬.
শাহ আলম মোল্লা রিপন আল-সুরেশ্বরী, পিতা-আবু
হোসেন মোল্লা, সদর রোড, জয়পুরহাট। ৭. খোরশেদ
আলম আল-সুরেশ্বরী, পিতা-ইয়াকুব আলী খান,

রাজামেহার, দেবিদ্বার, কুমিল্লা। ৮. কারী মো. সুলতান ওয়াদুদ আল-সুরেশ্বরী, পিতা-শেরের উদ্দিন চিশতী, মেজভালাম, পবা, রাজশাহী। ৯. আলী হোসেন আল-সুরেশ্বরী, পিতা-হাফেজ আলী বেপারী, পূর্ব লালপুর, কালীপুর বাজার, মতলব, টাঙ্গুর। ১০. আবদুল গণি মাতব্বর আল-সুরেশ্বরী, পিতা-গগন মাতব্বর, খামারপাড়া, বান্দবদৌলতপুর, মাদারীপুর। ১১. আবদুল কুদ্দুস কারী আল-সুরেশ্বরী, পিতা-আজমত আলী, মোয়াইল, বোনকুয়া, ভালুকা, ময়মনসিংহ। ১২. ইয়াকুব আলী শেখ আল-সুরেশ্বরী, পিতা-ইউনুস আলী শেখ, বগাজান, বড়াইত, ভালুকা, ময়মনসিংহ। ১৩. জাহিদুল ইসলাম আল-সুরেশ্বরী, পিতা-নুরুল ইসলাম, মেজভালাম, পবা, রাজশাহী। ১৪. মাওলানা কাজি আফহার উদ্দিন আল-সুরেশ্বরী, পিতা-কাজি বদরউদ্দিন, চাকুলিয়া, নগরকুণ্ডা, সাভার, ঢাকা। ১৫. ইসহাক মিয়া আল-সুরেশ্বরী, পিতা-আবদুর রাজ্জাক মিয়া, বাউশিয়া, বাউশিয়া বাজার, গজারিয়া, মুসিগঞ্জ। ১৬. মাওলানা আবুল বাশার আল-সুরেশ্বরী, পিতা-আবদুল কুদ্দুস, কালিয়ার ভাস্কা, নবীগঞ্জ, হবিগঞ্জ। ১৭. মমতাজ মাস্টার আল-সুরেশ্বরী, পিতা-হাজি মিয়াজান আলী, দুগাচী, দরগাতলা হাট, জয়পুরহাট। ১৮. আবুল হোসেন আল-সুরেশ্বরী, পিতা-নিজাম উদ্দিন মোল্লা,

বিদুপাড়া, রামেশ্বরপুর, বগুড়া। ১৯. নজরুল ইসলাম
 আল-সুরেশ্বরী, ডোলারহাট, চাপাই নবাবগঞ্জ। ২০.
 আতাউর রহমান আল-সুরেশ্বরী, পিতা-সেফাতুল্লাহ
 প্রামাণিক, বালুবাজার, মান্দা, নওগাঁ। ২১. মোমেনজা
 খাতুন আল-সুরেশ্বরী, পিতা-ওয়াহিদ উদ্দিন মণ্ডল,
 দুগাচী, দরগাতলা, জয়পুরহাট। ২২. জুলহক আলী
 আল-সুরেশ্বরী, পিতা-হাজি আবদুস সাত্তার মণ্ডল,
 আঁচলগাতি, পূর্ব বংকিরাট, লাহিড়ী মোহনপুর,
 উল্লাপাড়া, সিরাজগঞ্জ। ২৩. নজিবুর রহমান আল-
 সুরেশ্বরী, পিতা-ইসা মাস্টার, কাহালুবাজার, কাহালু,
 বগুড়া। ২৪. মাওলানা আনোয়ার হোসেন আল-
 সুরেশ্বরী, পিতা-মাফেল হাওলাদার, চরপুরসন্ধি,
 বাগদি, মোকসেদপুর, গোপালগঞ্জ। ২৫. আবদুল
 খালেক আল-সুরেশ্বরী, পিতা-মো. ইসহাক সর্দার,
 চরপুকুরিয়া, উদয়কাঠী, পিরোজপুর। ২৬. মো.
 শাহীনুর আহমদ চৌধুরী আল-সুরেশ্বরী, পিতা-সারাজ
 চৌধুরী, শ্মশানঘাট রোড, হবিগঞ্জ। ২৭. মো.
 মঈনউদ্দিন খান আল-সুরেশ্বরী, পিতা-মো. সিরাজ
 খান, কালিয়ারভাঙ্গা, নবীগঞ্জ, হবিগঞ্জ। ২৮. শ্রী
 প্রকাশ চন্দ্র রায় আল-সুরেশ্বরী, পিতা-জয়েন্দ্র নাথ
 রায়, গোহারা, ছাতনী, হাকিমপুর, দিনাজপুর। ২৯.
 মোহাম্মদ আলী আল-সুরেশ্বরী, পিতা-মো. আইউব
 আলী, হাকিমপুর, হাজিপুর, বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী।

৩০. বসিরউদ্দিন আল-সুরেশ্বরী, পিতা- আবদুল লতিফ মিয়া, বারঘরটোলা, জিনজিরা, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা। ৩১. শাহজাহান আল-সুরেশ্বরী, পিতা-গোলাম মোস্তফা, মধ্য আংগার পাড়া, রামগঞ্জ, লক্ষ্মীপুর। ৩২. মো. কবির হোসেন আল-সুরেশ্বরী, পিতা-আবদুল লতিফ, শারাপিয়া, কচুয়া, সফিপুর, টাঙ্গাইল। ৩৩. আশরাফুল হক আল-সুরেশ্বরী, পিতা- আবদুল ছেয়াদ, বাগপুর, বড় বিল, গঙ্গাচড়া, রংপুর। ৩৪. এনামুল হক আল-সুরেশ্বরী, পিতা-হাবিবুর রহমান, বীরপাল্লা, মুরাইল, কাহালু, বগুড়া। ৩৫. কামাল উদ্দিন আপেল আল-সুরেশ্বরী, পিতা-কলিম উদ্দিন সরকার, মাচাবান্দা, চিলমারী, কুড়িগ্রাম। ৩৬. ডা. ইব্রাহিম ইবনে নুর আল-সুরেশ্বরী, পিতা-আলী নুরে হসাইন, বলিয়া, হাজিগঞ্জ, টাঙ্গপুর। ৩৭. আবুল কালাম আজাদ আল-সুরেশ্বরী, পিতা-আলিম উদ্দিন মণ্ডল, সুলতানপুর, পীরগঞ্জ, নাটোর। ৩৮. মমতাজ উদ্দিন সরদার, পিতা- আছের আলী, বালুবাজার, মাদা, নগুগাঁ।